শরৎচন্দ্র

শ্রীকানাইলাল ঘোষ

দি প্রকাশনী
৮২, গোপীমোহন দত্ত লেন, কলিকাতা—৩

প্রকাশক—
শ্রীনিরঞ্জন কাঞ্জিলাল, এম. এ.
৮২, গোপীমোহন দত্ত লেন.
কলিকাতা—৩।

তৃতীয় পরিমার্জ্জিত সংস্করণ
১৬ই পৌষ ১৩৬১।

প্রাপ্তিস্থান:
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর:
শ্রীঅনাদিনাথ কুমার
উমাশঙ্কর প্রেস
১২, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬।

তৃতীয় সংস্করণ

বইখানি কয়েক মাসের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দিল। এ সংস্করণে নূতন কিছু তথ্য সংযোজিত হল এবং পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণের কিছু কিছু অংশ পরিমার্জ্জিত করা হ'ল। বাংলা সাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠক পাঠিকার নিকট নিবেদন যে, আমার পুস্তকের সমস্ত তথ্যই শরৎচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের নিকট থেকেই সংগৃহীত। আমি কেবল সেই সমস্ত বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিকে একত্রিত করে অতুল প্রতিভাধর শরৎচন্দ্র কি ভাবে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে বাংলার সাহিত্যাকাশ আলোকিত ক'রেছিলেন, তারই একটী চিত্র এর মধ্যে আঁকতে চেষ্টা করেছি। তবুও যদি কিছু ত্রুটী বিচ্যুতি দেখা দেয়, তাহলে মানুষ শরৎচন্দ্রকে সত্যভাবে প্রকাশ করবার জন্য, সহৃদয় দেশবাসী যদি পত্র দ্বারা আমার ভুল সংশোধনে সাহায্য করেন, তাহ'লে আন্তরিক ভাবে তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

খেপুত—পোঃ + গ্রাম,
১৫ই পৌষ, ১৩৬১।

বিনীত—
গ্রন্থকার

নিবেদন

অমর বা অপরাজেয় কথাশিল্পী স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিপূর্ণ জীবনী সংগ্রহ করা সত্যই দুরূহ ব্যাপার। যতটুকু সংগ্রহ ক'র্‌তে পেরেছি, ততটুকুই এই ক্ষুদ্র রচনায় প্রকাশ করার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেছি। সেটুকু যে সকলকে সন্তুষ্ট ক'র্‌তে সমর্থ হ'বে সে কথা জোর দিয়ে বলার সামর্থ্য সত্যই আমার নেই। তবে এই প্রচেষ্টা যে সামান্যতম, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই আমার রইলো না।

শরৎচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য ও সঙ্গী সুসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভক্তবিপ্লবী শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়, বন্ধু ও একান্ত অনুগত শ্রীঅনুরূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহায়তায় ও আন্তরিকতায় তাঁর জীবনের বহু গোপন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হ'য়েছে।

শুধু এইটুকু ব'ল্‌লে—তাঁদের ব্যক্তিগত সাহায্যদানকে ক্ষুণ্ণ করা হ'বে। তাঁরা কাহিনী দিয়েছেন এবং পাণ্ডুলিপিখানি আন্তরিকতার সঙ্গে প'ড়েও দেখেছেন।

অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ম'শায়ও স্বয়ং শরৎচন্দ্র কথিত বহু কাহিনী দিয়ে এই রচনার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে সহায়তা ক'রেছেন। (ইনি ছিলেন তাঁর একান্ত অনুগত ও উৎসাহী একজন বিশিষ্ট বন্ধু।)

শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অনুরূপা দেবীও সেদিনের সেই অজ্ঞাত শরৎচন্দ্রের মজঃফরপুর বসবাসের কাহিনী দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন। ওঁর দেওয়া দু'খানি গানও এই রচনায় সংযোগ করা হ'য়েছে।

শ্রীযুত নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায় ছিলেন রেঙ্গুন সহরের একজন খ্যাতনামা উকিল। প্রথম জীবনে ইনি একই মেসে (বা হোষ্টেলে) শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বসবাস ক'র্‌তেন। পর-জীবনেও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ছিল এঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। জাপানী আক্রমণের পর ইনি রেঙ্গুন ছেড়ে

ক'ল্‌কাতায় চ'লে আস্‌তে বাধ্য হ'য়েছেন। স্বর্গীয় মণি মিত্র ম'শায়ও গত যুদ্ধের সময় ক'লকাতায় ফিরে আসেন। এঁরই সহায়তায় ও আন্তরিক স্নেহে, তিনি একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসে চাক্‌রী পেয়েছিলেন। এঁরা উভয়েই ব্রহ্মদেশে অবস্থানকালে শরৎচন্দ্রের জীবনের বহু তথ্য-সংগ্রহে সাহায্য ক'রেছেন।

ব্রহ্মদেশে অবস্থানকালে, শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছিলেন,—তাঁর রচিত প্রতিটি ঘটনার মধ্যে সেই চিত্রই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে, আমরা দেখ্‌তে পেয়েছি।

স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় গিরীন সরকার ম'শায় রচিত "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" নামক গ্রন্থে, তিনি যে সব কাহিনী বর্ণনা ক'রে গেছেন,—তার সকল বিষয়বস্তুর সঙ্গে অনেকেই একমত হ'তে পারেননি। তাই যে কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখা গিয়েছে, সেগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে এই রচনায় সংগৃহীত হ'য়েছে, বিশেষ ক'রে তাঁর (গিরীনবাবুর) রচনায় প্রকাশিত কয়েকটি গান। সেগুলি যে সত্য—তা প্রমাণ করা শুধু দুঃসাধ্য নয়, আমার শক্তির অতীত বস্তুও বটে।

ব্যক্তিগত আপত্তি থাকায়, শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের প্রণয়িনীর নাম ও তাঁর পরিচয়, আমরা তাঁরই রচিত উপন্যাসের নায়িকার নাম গ্রহণে বাধ্য হ'য়েছি। জানি না এ-প্রচেষ্টা আমার সহৃদয় দেশবাসীকে কতটুকু আনন্দ-দানে সমর্থ হবে।—যদি সত্যই তাঁরা তৃপ্তি পান, আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও শ্রম সার্থক ব'লে মনে ক'রবো।

এই রচনায় ত্রুটি থাকা কিন্তু অস্বাভাবিক বস্তু নয়! যদি সমুদয় পাঠক-পাঠিকা ও আমার স্বদেশবাসী এই শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষের অজ্ঞাত জীবনের কোন অজানা তথ্য বা বিচিত্র কাহিনী সংগ্রহে সাহায্য ক'রেন এবং পরিপূর্ণ-জীবনী রচনায় সহায়তা করেন,—তাঁদের সেই দান সাদরে সংগৃহীত হ'বে। আশা করি, দেশবাসীর সে সহানুভূতি থেকে বিচ্যুত হ'বো না।

শ্রদ্ধেয় সুপ্রসিদ্ধ নেতা স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু ম'শায়, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনী রচনায় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু সে-আশা আমার ব্যর্থ হ'য়েছে। পরম-পুরুষ বিধাতার নির্দ্দেশে, সে কাজ অপূর্ণ রেখেই তিনি অমরধামে যাত্রা ক'রেছেন। সেই অসমাপ্ত কাজ একা আমাকেই সম্পন্ন ক'র্‌তে হ'য়েছে। অবশ্য এই কাজে আন্তরিক সাহায্য ক'রেছেন, সেদিনের বিপ্লব-পন্থী দলের নির্ভীক সৈনিক শ্রীযুত নীলরতন মুখোপাধ্যায় ম'শায়।

যোগাযোগ রক্ষায় আমায় আন্তরিক সাহায্য ক'রেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ম'শায়ের সুযোগ্যা কন্যা, শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী তিলোত্তমা দেবী, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু ও সুর-শিল্পী শ্রীমনোজ মুখোপাধ্যায়।

অসাবধানতাবশতঃ ছাপায় দু' একটি ভুল ও ত্রুটি র'য়ে গেছে। শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকা আমার সেগুলি নিম্নলিখিত সংশোধিত-রূপ পাঠে বাধিত ক'র্‌বেন।

(১) সৌরীন্দ্রনাথ—"সৌরীন্দ্রমোহন"

(২) কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ—"আর. জি. কর মেডিকেল স্কুল"

(৩) অপারেশন ক'রেছিলেন—"ললিতবাবু (ব্যানার্জ্জী)"

খেপুত—পোঃ ও গ্রাম
জেলা—মেদিনীপুর
নেতাজী জন্মদিবস
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫১

বিনীত—
গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণ

আমি খুবই দরিদ্র। বইখানির উপযুক্ত প্রচার আমার দ্বারা সম্ভবপর হয়নি। তবুও সবিনয়ে এটুকু প্রকাশ আজ না ক'রে পারি না যে, দেশবাসীর কতদূর শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন "অপরাজেয় কথাশিল্পী" তার প্রমাণ পাওয়া গেল প্রথম সংস্করণটি নিঃশেষিত হওয়ায়। প্রথম সংস্করণে অনেকের মনে অনেক সন্দেহের দানা বেঁধেছিল—এ ঘটনাগুলো কি সত্য? তাই, আজ পর্য্যন্ত যে যে প্রকাশিত পুস্তকের সঙ্গে ঘটনা ও বর্ণনার মিল আছে, সেগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম প্রতিটি পাতায়। পাঠক সত্যাসত্য বিচার ক'রে নেবেন—এর বেশী বলার আমার কিছু নেই।

বর্ম্মা জীবন সম্বন্ধে কুতূহল বিদূরণের উদ্দেশ্যে, "বাতায়ন"-এ (২রা মাঘ সংখ্যা), ১৩৪৮, Justice Mr. A. N. Sen-এর বক্তৃতার সারাংশ (বঙ্গানুবাদ) উদ্ধৃত ক'রে দিলাম :

"শরৎচন্দ্র বর্ম্মায় আসেন ১৯০৩ সালে। অঘোরবাবুর মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁর কাছেই বসবাস করেন।...বর্ম্মা রেলের হিসাব পরীক্ষক মিঃ কে. বসুকে ধ'রে অঘোরবাবু ঐ অফিসেই শরৎচন্দ্রের একটি অস্থায়ী চাকরী জুটিয়ে দিয়েছিলেন। রেঙ্গুন গভর্ণমেন্ট হাউসের ওভারসিয়ার শ্রীআনন্দ প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের গৃহেও কিছুদিন বসবাস করেন। রেল-অডিট্ অফিসে দেড় বৎসর কাজ করার পর কোন কারণে তিনি ইস্তফা দিতে বাধ্য হ'ন। এরপর আইনজ্ঞ হ'বার চেষ্টা ক'রেছিলেন কিন্তু বর্ম্মি ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে না পারায় উকীল হওয়ার সাধ অপূর্ণই থেকে যায়। রেল অফিস ছাড়ার পর নায়ায়ুনগ্রেবিনের চালের ব্যবসাদার মিঃ পি. কে. মিত্রের অধানে একটা কাজ জোগাড় ক'রে নেন এবং ঐ স্থানেই রেল. ষ্টেশনের ধারে শ্রীকৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পে-

সময়ে বাস ক'রতে থাকেন।...অল্পদিন পরে তিনি পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে সে-স্থান ত্যাগ করেন। তারপর বছর দেড়েক অধুনা পেগুর এড্‌ভোকেট মিঃ এন. কে. মিত্রের বাড়ীতে থাকেন। এইখানে তিনি তাঁর মজ্‌লিশী খোসগল্পে লোককে অভিভূত ক'রে তোলার ক্ষমতার পরিচয় দেন।... বর্ম্মার পাব্‌লিক ওয়ার্কস্‌ একাউণ্ট অফিসের সহকারী পরীক্ষক মিঃ এন্‌. কে. মিত্রের সম্পর্কীয় ভাই ছিলেন মিঃ এম্‌. কে. মিত্র।...টম্‌শন ষ্ট্রীটে মিঃ মিত্রের বাড়ীতে এসে ওঠেন এবং মিঃ এন্‌. মিত্রের অনুরোধে, তিরিশ টাকা মাসিক বেতনে তাঁরই অফিসে ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে একটি অস্থায়ী চাকরীর বন্দোবস্ত ক'রে দেন।...অতঃপর পাব্‌লিক একাউণ্টস্‌ অফিসের পরীক্ষকের সহায়তায় পেগুর এক্সিকিউটিভ্‌ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে আগষ্ট মাসে একটি কাজ যোগাড় ক'র্‌তে সমর্থ হন। আড়াই মাস কাজ করার পর এ-চাকরী তাঁর টিক্‌লো না। ১৯০৬ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত তাঁকে সম্পূর্ণ বেকার হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে হ'য়েছিল। এপ্রিল মাসে পুনরায় তিনি ৫০৲ টাকা মাহিনায় পাব্লিক্‌ ওয়ার্কস্‌ একাউণ্টস্‌ অফিসে নিযুক্ত হন। কাজে সন্তুষ্ট হ'য়ে কর্ত্তৃপক্ষ জুলাই মাসে মাইনে বাড়িয়ে দিলেন ৬৫৲ টাকায়। এক বছর পরে মাইনে পুনরায় বেড়ে দাঁড়ালো ৮০৲ টাকায়। ১৯০৯ সালের জুলাই মাস থেকে বেতন ৯০৲ টাকায় স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত হ'য়ে যায়। এই বেতন ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত পেয়ে এসেছিলেন।...১৯১০ সালে স্থায়ীভাবে কাজে গৃহীত হওয়ার জন্য আবেদন ক'রেছিলেন কিন্তু বয়স তিরিশের কোঠা পেরিয়ে যাওয়ায় সে আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। আর তাঁর নিজেরও এ-বিষয়ে কোন বিশেষ ঝোঁক ছিল না। ১৯১১-১২ সালের বর্ম্মা পাব্‌লিক ওয়ার্কস্‌ একাউণ্টসের অফিস একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যাওয়ায় ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রেঙ্গুনের একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসে চলে আসেন।...নায়াযুগ্যেবিনে থাকা-

কালে তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। ১৯০৭ সালের নভেম্বরে অস্ত্রোপচারের জন্য তিন মাসের ছুটিতে ক'ল্‌কাতায় এসেছিলেন এবং ফেব্রুয়ারীতে ফিরে গিয়েছিলেন। ১৯১২ সালের অক্টোবরে ডাক্তারী সার্টিফিকেট্‌ নিয়ে ক'ল্‌কাতা এসেছিলেন—ফিরেছিলেন নভেম্বরে।...১৯১৪ সালের জুন মাসে পুনরায় ছুটি নিয়ে ক'ল্‌কাতায় এসেছিলেন এবং ঐ সালেই কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালের এপ্রিলে কাজে ইস্তফা দিয়ে ক'ল্‌কাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন।"

হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহ সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকম সন্দেহ প্রকাশ করেন। শুধু এটুকু ব'লেই আমি আমার নিবেদন শেষ ক'র্‌তে চাই যে, হিরণ্ময়ী দেবীকে তিনি আনুষ্ঠানিক বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ ক'র্‌তে পারেননি—তার প্রধান কারণ, তিনি (হিরণ্ময়ী দেবী) প্রথম জীবনে ছিলেন বালবিধবা। তাঁর সংস্কার ছিল, পুনঃ আনুষ্ঠানিক বিবাহে হয়ত তাঁর (শরৎচন্দ্রের) কোন জীবন-সংশয়ের কারণ হ'তে পারে। তিনি ব'ল্‌তেন—অমুক জজের মেয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে ক'রে পুনরায় বিধবা হ'য়েছেন সুতরাং আমি প্রথমে কালিঘাটে মায়ের পূজো না দিয়ে কিছুতেই সিঁদুর প'র্‌বো না! বর্ম্মা থেকে ফিরে সে কাজ তিনি প্রথমে ক'রেছিলেন, এবং শিবপুরে একটা আনুষ্ঠানিক বিবাহের আয়োজন করা হ'য়েছিল। সে অনুষ্ঠানের পুরোহিত ছিলেন হাওড়া-নিবাসী শ্রীঅনুরূপ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এখনও জীবিত। ইচ্ছা ক'র্‌লে এবিষয়ে দেশবাসী তাঁদের কুতূহল বিদূরিত ক'র্‌তে পারেন। এ-ছাড়া শরৎচন্দ্র তাঁর উইলে, নিজেই হিরণ্ময়ী দেবীকে "স্ত্রী" ব'লে স্বীকার ক'রে গেছেন, সুতরাং এ-প্রশ্নের যবনিকা পতন এখানে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এই সংস্করণে যাঁরা আমায় সাহায্য ক'রেছেন ও যে পুস্তকগুলি থেকে সাহায্য গ্রহণ ক'রেছি, সেই সব পুস্তকের গ্রন্থকর্তাদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ ক'রে দিলাম।

অধ্যাপক শ্রীযুত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, অধ্যাপক শ্রীযুত মুকুন্দবিহারী মিত্র, অধ্যাপক শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ রায়, কথাশিল্পী ও অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুসাহিত্যিক শ্রীরণজিৎ কুমার সেন, ব্রহ্ম-প্রবাসী ইঞ্জিনীয়াব শ্রীযুত সি. কে. সরকার, কলিকাতা করপোরেশনের কলেক্টর শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (অধুনা অবসর-প্রাপ্ত ও কিরণশঙ্কর রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু) ও ব্রহ্ম-প্রবাসী শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (১৯১১-১৪) ও সিটি কলেজ লাইব্রেরীর সমুদয় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীবৃন্দ। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রইলাম। এখানে প্রকাশ থাকা উচিত, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনী সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা প্রথম সংস্করণে ক'রেছিলাম, তার মধ্যে যেটুকু ফাঁক থেকে গিয়েছিল, শচীনন্দনবাবুর বইখানি সেই ফাঁক বিদূরণে সাহায্য ক'রেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি শচীনন্দনবাবুর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও ইতিহাসকার ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন, এম. এ., পি. আর. এস., পি. এইচ্. ডি. মহাশয়ের এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে অভিমত, বহুমান্য শিরোভূষণরূপে প্রথমেই মুদ্রিত ক'রলাম। তাঁর মত গুণী ব্যক্তির কাছ থেকে যে অভিমত পেলাম, সেটা আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছেও আমি চিরঋণী রইলাম।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত চিঠিখানি দ্বারা বিশেষ উপকৃত হ'য়েছি ও যথাসাধ্য তাঁর নির্দ্দেশ মেনে চ'লতে চেষ্টা ক'রেছি। তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ রইলাম।

পোঃ ও গ্রাম—খেপুত
৩১ শে ভাদ্র, ১৩৬১

বিনীত—
গ্রন্থকার

Council of Post-Graduate
Teaching in Arts.
Asutosh Building
Calcutta.

২১. ৯. ৫৪.

"কাব্য পড়ে যেমন ভাব, কবি তেমন নয় গো"—একথা লেখক-বিশেষে যেমন ভাবেই খাটুক শরৎচন্দ্রের বিষয়ে তেমন খাটে না। শরৎচন্দ্র নিজে তাঁর গল্প-উপন্যাসের চেয়ে কম ইণ্টারেস্‌টিং ছিলেন না। কিন্তু শেষের কয় বছর ছাড়া তাঁর জীবন সম্বন্ধে খাঁটি খবর তাঁর অনুরাগী পাঠকেরা সাধারণত বিশেষ কিছুই জানেন না। ছেলেবেলা থেকে শরৎচন্দ্র আত্মগোপনকারী ছিলেন, তার কারণ মনে হয় নিজেদের সংসারের অস্বচ্ছলতা ও অভিভাবক-শাসনের কঠোরতা। লেখক-রূপে শরৎচন্দ্র যখন সদ্য-আবির্ভূত তখন তাঁর সম্বন্ধে কারো কিছুই জানা ছিল না। এর একটা ফল ভাল হ'য়েছিল বলে মনে করি। একেবারে অজানা লেখক ব'লে তাঁর রচনার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতামত প্রথম থেকেই ঘোঁট পাকাবার সুযোগ পায়নি। অনেককাল ধ'রে শরৎচন্দ্র স্বচ্ছন্দে লেখবার অবকাশ পেয়েছিলেন।

নিজের প্রথমজীবন সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র এধারে ওধারে একটু আধটু কথা ব'লেছেন। তাঁর আত্মীয়ও কেউ কেউ তাঁর প্রথমজীবন সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল মেটাতে চেষ্টা ক'রেছেন। বর্মায় তাঁর জীবন ও আচরণ সম্বন্ধেও অল্পস্বল্প তথ্য জানা গেছে তাঁর পত্রাবলী ও অন্যান্য উপাদান থেকে। অনেকে তাঁর প্রথমদিককার গল্প-উপন্যাস থেকেও তাঁর জীবনকাহিনী নিষ্কষিত ক'রে থাকেন। এই সব নিয়ে এবং আরো বেশ কিছু মাল-মশলা জোগাড় ক'রে শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষ এই "শরৎচন্দ্র"

বইখানি লিখেছেন। কানাইবাবুর ব্যাবহৃত উপাদান সম্বন্ধে সংশয় যদি কেউ না তোলেন, তবে বইখানিকে বাংলায় একটি উৎকৃষ্ট জীবনী ব'লতেই হবে।

কানাইবাবু যথেষ্ট খেটেছেন বইখানির জন্যে। কিন্তু সেইটাই একমাত্র কথা বা বড় কথা নয়। ইনি যা বলতে চেয়েছেন তা বলেছেন সোজাসুজি, স্পষ্ট করে। এঁর ভাষা সরল, বর্ণনা উপন্যাসের ধাঁচে—প্রায় সিনেমার মিতভাষী টেকনিকে। সবশুদ্ধ বইখানি বেশ সুখপাঠ্য হয়েছে। অতএব এই পরিবর্ধিত ও পুনর্লিখিত দ্বিতীয় সংস্করণটিও প্রথম সংস্করণের জনপ্রিয়তা লাভ ক'র্‌বে এমন আশা রাখি। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যাঁর কিছুও কৌতূহল আছে, তিনি কানাইবাবুর বইটি উপেক্ষা করতে পারবেন না।

শ্রীসুকুমার সেন

ভূমিকা

শরৎচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে ভূমিকা রচনা শুধু ধৃষ্টতা নয়, বাতুলতাও বলা যেতে পারে নিঃসন্দেহে। তবে যতটুকু প্রকাশ থাকা উচিত সেটুকু যথাস্থানে উদ্ধৃত না থাক্‌লে যে অঙ্গহানি হ'য়ে যায়—সে-বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকাও উচিত নয়।

তাই তাঁরই ভাষার ছন্দ নিয়ে উদ্ধৃত ক'রে কর্তব্য শেষ ক'র্‌লাম:

"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হ'য়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হ'তে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া ক'রেছিল। অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভ'রে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। পিতার আমার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ ক'র্‌তে পারেননি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন ক'রে হারিয়ে গেছে, সে-কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোট-বেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ ক'রে যাননি এই ব'লে কত দুঃখই না ক'রেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হ'তে পারে ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয় সতের বৎসর বয়সের সময় গল্প লিখ্‌তে সুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প-রচনা অকেজোর কাজ মনে ক'রে আমি অভ্যাস ছেড়ে

দিলাম। তারপর অনেক বৎসর চ'লে গেল। আমি যে কোনকালে একটি লাইনও লিখেছি, সেকথাও ভুলে গেলাম।

আঠার বৎসর পরে একদিন লিখ্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লাম। কারণটা দৈব-দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিকপত্র বের ক'র্‌তে উদ্যোগী হ'লেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকদের কেউ-ই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজি হ'লেন না। নিরুপায় হ'য়ে তাঁদের কেউ-কেউ আমাকে স্মরণ ক'র্‌লেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় ক'রে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজি হ'য়েছিলাম। কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার ক'রেছিলাম। উদ্দেশ্য, কোন রকমে একবার রেঙ্গুন পৌঁছ্‌তে পার্‌লেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্যসত্যই আবার কলম ধ'র্‌তে প্ররোচিত ক'র্‌লো। আমি তাঁদের নব-প্রকাশিত 'যমুনা'র জন্য একটি ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হ'তে না হ'তেই বাংলার পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ ক'র্‌লো। আমিও একদিনেই নাম ক'রে ব'স্‌লাম। তারপর আমি অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে লিখে আস্‌ছি। বাঙ্গালাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান্ লেখক—যাকে কোনদিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ ক'র্‌তে হয়নি।" ["শ্রীকান্তে"র ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা]

"...সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হ'য়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। 'তাদের

প্রভৃতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্ব্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে। সংসারে সৌন্দর্য্যে-সম্পদে-ভরা বসন্ত আসে জানি; আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতী-জাতী-যূথি, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা-পবন; কিন্তু যে আবেষ্টনে, দৃষ্টি আমার আবদ্ধ র'য়ে গেল তার ভিতরে ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘট্‌লো না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি, শ্রুতি-মধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকেই পেয়েছি ব'লে প্রকাশ ক'র্‌বার ধৃষ্টতাও আমি করিনি। এমনি আরও অনেক কিছুই—এ-জীবনে যাঁদের তত্ত্ব খুঁজে মেলেনি, স্পর্দ্ধিত অবিনয়ে মর্য্যাদা তাঁদের ক্ষুণ্ণ করার অপরাধও আমার নেই। তাই সাহিত্য-সাধনার বিষয়-বস্তু ও বক্তব্য আমার বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়, তারা সঙ্কীর্ণ, স্বল্প-পরিসরবদ্ধ। তবুও এটুকু দাবী করি, অসত্যে অনুরঞ্জিত ক'রে তাদের আজও আমি সত্যভ্রষ্ট করিনি।"
[৫৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে টাউন-হলে স্বদেশবাসীর অভিনন্দনের প্রতিভাষণ]

পরিচিতি

২৪-পরগণার "মামুদপুরে" ছিল তাঁর পৈত্রিক বাসভূমি। মতিলাল-বাবু হুগলী জেলার "দেবানন্দপুরে" (মামার বাড়ীতে) বসবাস ক'র্‌তেন। বৈকুণ্ঠবাবুর (মতিলালবাবুর বাবা) অকাল-মৃত্যুর পর হালিসহর নিবাসী রামধন গাঙ্গুলীর কাছে মতিবাবুর মা ছেলেকে সঁপে দিয়ে এসেছিলেন। তিনি (রামধনবাবু) তাঁর বড় ছেলে কেদারনাথ গাঙ্গুলীর মেজ মেয়ে ভুবনমোহিনী দেবীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ভাগলপুরে বসবাসের ব্যবস্থা ক'রে দেন। ভুবনমোহিনী দেবী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি

(মতিবাবু) ঘর-জামাইরূপেই বসবাস ক'রেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর খঞ্জরপুরে তিনি একটি বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ভাগলপুরে প্রথমে একটি মেয়ে জন্মায়। তিনিই শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলাদেবী। পরের সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হ'য়েই মারা যায়। তাই সংস্কারবশে, সন্তানলাভ ও তার দীর্ঘ-আয়ু কামনায় ভুবনমোহিনীকে কয়েকমাস দেবানন্দপুরে পাঠানো হয়। সেখানেই শরৎচন্দ্রের জন্ম হয় (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬; বাংলা ৩১শে ভাদ্র, ১২৮৩)।

সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

১৮৭৬—১৫ই সেপ্টেম্বর, ৩১শে ভাদ্র, ১২৮৩—জন্ম। ১৮৭৭-৮৬—ভাগলপুর ও দেবানন্দপুরে বাল্য ও কৈশোর যাপন। ১৮৮৭—ভাগলপুরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ ও টি. এন. জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশ। ১৮৯৩—হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ২য় শ্রেণীর ছাত্র। সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত। ১৮৯৪—ব্রাঞ্চ স্কুলে ১ম শ্রেণীতে পাঠকালে ভাগলপুরে পুনঃগমন ও টি. এন. জুবিলী স্কুলে পুনঃপ্রবেশ। ২য় বিভাগে এনট্রান্স পাশ (ডিসেম্বর)। সাহিত্য-সভার সৃষ্টি ও নেতৃত্ব। প্রথমে "শিশু" পরে "ছায়া" নামে হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা পরিচালনা। ১৮৯৫-৯৬—টি. এন. জুবিলী কলেজে এফ. এ, ক্লাসে যোগদান। মাতার মৃত্যু (নভেম্বর)। পড়াশুনায় ইস্তফা। ১৮৯৬-৯৯—খেলাধূলা, সাহিত্য-চর্চ্চা, আদমপুর ক্লাবে অভিনয় ও বনেলী-এষ্টেটে চাকুরী। ১৯০০-১৯০২—সন্ন্যাসী বেশে দেশ-ভ্রমণ, মজঃফরপুরে অবস্থিতি। প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব। পিতার মৃত্যু, শ্রাদ্ধাদি শেষ ও ক'লকাতায় আগমন। ১৯০৩—বর্ম্মা যাত্রা (জানুয়ারী); কুন্তলীন পুরস্কার লাভ। ১৯০৫—মেসোম'শায় অঘোরনাথের মৃত্যু (৩০শে জানুয়ারী), মৌলমিন পেগুতে, ও পরে

রেঙ্গুনে চাকুরী। ১৯০৭—ভারতী পত্রিকায় "বড়দিদির" আত্মপ্রকাশ ও ক'ল্‌কাতায় আগমন (নভেম্বর)।

১৯১২—ক'ল্‌কাতায় আগমন (অক্টোবর-ডিসেম্বর)। যমুনায় "বোঝার" শুভাগমন। ১৯১৩—যমুনায় নিয়মিত রচনাদানের স্বীকৃতি। "রামের সুমতি", "পথ-নির্দ্দেশ"ও "বিন্দুর ছেলে" প্রকাশ। পুস্তকাকারে "বড়দিদি", ভারতবর্ষে—"বিরাজ বৌ"। ১৯১৪—যমুনার সম্পাদক (জুন), ক'ল্‌কাতায় আগমন। ১৯১৫—যমুনার সম্পর্ক ত্যাগ, ভারতবর্ষে যোগদান। ১৯১৬—স্বাস্থ্য-হানি ও কর্ম্মত্যাগ। ক'ল্‌কাতা আগমন ও বাজে-শিবপুরে অবস্থিতি। ১৯১;—বসুমতী কর্ত্তৃক গ্রন্থাবলী প্রকাশের সূচনা। ১৯২১—কংগ্রেসে যোগদান। ১৯২২—শ্রীকান্তের ১ম পর্ব্ব ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ (অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস)। ১৯২৩—"জগত্তারিণী" পদক লাভ। ১৯২৪—"রূপ ও রঙ্গ" নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র সহযোগে সম্পাদনা (৪ঠা অক্টোবর)। ১৯২৫—ঢাকা, মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব (১০-১১ এপ্রিল)—পাণিত্রাসে গৃহ নির্ম্মাণ। ১৯২৭—ইটালীয় অনুবাদ পাঠে (শ্রীকান্ত ১ম পর্ব্ব) রমঁ্যা রলাঁ কর্ত্তৃক পৃথিবীর "প্রথম শ্রেণীর" ঔপন্যাসিকের সম্মান দান। ১৯২৮—৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে দেশবাসীর সম্বর্দ্ধনা (সেপ্টেম্বর)। ১৯২৯—মালিকান্দা অভয় আশ্রমে বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতিত্ব (১৫ই ফেব্রুয়ারী), রংপুরে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতিত্ব (৩০শে মার্চ)। ১৯৩১—রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতিত্ব (ডিসেম্বর)। ১৯৩২—টাউন-হলে নাগরিক ও সাহিত্যিকগণের পক্ষ থেকে অভিনন্দন (১৮ই সেপ্টেম্বর)। ১৯৩৪—ফরিদপুর সাহিত্য-সম্মিলনের মূল সভাপতি (২৭শে জানুয়ারী), বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের "বিশিষ্ট সদস্য" (জুলাই)। অশ্বিনী দত্ত রোডে গৃহ নির্ম্মাণ ও প্রবেশ। ১৯৩৬—

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ-কল্পে টাউন-হলে উদ্বোধন-বক্তৃতা (১৫ই জুলাই) ও আল্‌বার্ট-হলে সভাপতিত্ব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক "ডি.-লিট্‌" উপাধি দান। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজে সভাপতিত্ব (৩১ জুলাই); ৬১তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অভিনন্দিত (২৫ আশ্বিন)। ১৯৩৮—পার্ক নার্সিংহোমে, ৬২ বৎসর বয়সে মৃত্যু (১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮, ২রা মাঘ, ১৩৪৪)।

২৩নং মাণিক সরকার ঘাট রোড

ভাগলপুর

তাং—১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৫৬

শরৎচন্দ্রের সংগে আমার যে পারিবারিক সম্পর্ক আছে অর্থাৎ আমি "দূর-সম্পর্কে"র মামা আর তিনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগ্নে—এই বিচারে যাঁরা কিছু বলেন, কি লেখেন তাঁরা আমাদের দু'জনের ওপরেই কিছুটা হয়তো তাঁদের অজ্ঞাতেই অবিচার করেন।

আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছিল। শৈশবে তাঁর চেলা এবং সাক্‌রেদ ছিলাম। পরিণত বয়সে আমাদের মধ্যে একটা গাঢ়-বন্ধুত্ব জন্মায়।

শরৎচন্দ্রের মা ৺ভুবনমোহিনী দেবীকে আমরা মেজদিদি বোলতাম। তিনি আমাদের জ্যেঠাম'শায়ের দ্বিতীয়া কন্যা ছিলেন। সেকালে একান্নবর্তী পরিবারের এই রকম ব্যবস্থাই ছিল। ফলে, পার্থক্য বোধটাকে স্তিমিত করাই হোত!

আমার জন্মের অল্পদিন পরে, আমার মাতাঠাকুরাণীর সন্তান-সম্ভাবনা হওয়াতে এবং মেজদিদির শরতের জন্মের পর একটি সন্তান মারা যাওয়াতে মেজদিদির স্তন্য-পানের সুযোগ এবং সৌভাগ্য ঘোটেছিল

আমার। আমার শৈশব কেটেছিল শরৎচন্দ্রের ঘরে, লালনে পালনে। মেজদিদি চিরকালই আমাকে তাঁর দেওয়া "ফুটি" নামেই ডাক্‌তেন।

এই সূত্রে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক ছাড়িয়ে ভ্রাতৃভাবও হয়তো গোড়ে উঠেছিল। নৈলে, তাঁর অনেক মামা কোলকাতায় থাক্‌লেও—অসুস্থ হোয়ে আমাকে সেবার জন্তে ভাগলপুর থেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন প্রকাশচন্দ্রের মারফৎ তা তিনিই বোল্‌তে পারেন!

শরৎচন্দ্রের জীবনের অবসান হয় আমার কোলে। তাঁর সংগে বহুতরভাবে মেলামেশার জন্ম তাঁর জীবনের কাহিনী এবং রহস্য-জানার অবসর এবং সৌভাগ্য ঘোটেছিল আমার। তিনি কোন কথাই প্রায় গোপন কোর্‌তেন না আমার কাছে।

শরৎচন্দ্রের জীবনী বিবৃতির সময় এইকথা মনে রেখেই কাজ ক'রেছি। স্বকপোল কল্পনার স্থান হয়নি বোলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ধু' ধু' ক'র্ছে মাঠ, এক মুঠো চাল নেই ঘরে, গ্রামবাসী যখন সহজ জীবন যাপনের পাথেয় সন্ধানে ব্যাকুল, জমিদারসাহেবের নায়েবম'শায় ঠিক সেই সময়েই—পাইক্ ও দরোয়ান সঙ্গে নিয়ে হানা দিলেন প্রতিটি ঘরে।

গ্রামবাসীরা নিরুপায়—অসহায়। মিনতি জানালো—খেতে পাইনি হুঁজুর—খাজনা দেবো কিসে ?

নায়েবম'শায় ক্রোধে ফেটে প'ড়্লেন। ব'ললেন—জমি যখন দখল ক'রে বসে আছ, খাজনা তখন দিতেই হবে। না পারো, ঘটিবাটি যা কিছু সম্বল আছে, বিক্রী করো—

তাদের মধ্য থেকে একটি বলিষ্ঠ যুবক সাম্নে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'র্লো—তারপর ?

নায়েবম'শায় সদম্ভে বাকীটুকু শেষ ক'র্লেন—দিয়েথুয়ে বাঁচে, বেঁচো, নইলে—শনের দড়ি কিংবা পুকুরের জলের ত অভাব নেই !

পাশের দরোয়ান ও পাইকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে পরমুহূর্ত্তে কি যেন একটা ইঙ্গিত ক'র্লেন। তারা হুকুমের দাস। চকিতে লাফিয়ে প'ড়্লো সাম্নের নিরপরাধী একজন লোকের 'পরে।

নায়েবম'শায় গলাটা পরিষ্কার. ক'রে নিয়ে উৎসাহিত কণ্ঠে ব'ল্লেন—আচ্ছা ক'রে পাকাড়্ লেও।

যুবক ধৈর্য্য ধ'রে আর স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকৃতে পার্লো না। দলবল নিয়ে একেবারে মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়ালো। সংযত ও সবিনয়ে নিবেদন ক'র্লো—এ ত কখনও হ'তে পারে না নায়েবম'শায় ! না খেতে পেয়ে, পলেপলে শুকিয়ে ম'র্ছে লোক, তাদের উপর এ জুলুমটা, কি না

ক'র্‌লেই নয়? আপনাকে অনুরোধ ক'র্‌ছি নায়েবম'শায়, ওদের ছেড়ে দিন!

নায়েবম'শায় কর্কশ কণ্ঠে উত্তর দিলেন—তা হয় না, এটা জমিদারের আদেশ। বিস্ময়ে যুবক ফেটে প'ড়্‌লো। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—কেন?

নায়েবম'শায় উত্তর দিলেন না, বীরদর্পে এগিয়ে চ'ল্‌লেন। যুবক তাঁর পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো। ব'ল্‌লো—মানুষ না খেতে পেয়ে ম'র্‌বে তবুও খাজনা দিতে হবে? কেন? আপনি কিংবা আমাদের জমিদার, কেউ কি আপনারা মানুষ নন?

নায়েবম'শায় গর্জ্জে উঠ্‌লেন—পথ ছাড়ো!

যুবক সহজ কণ্ঠে উত্তর দিল—ওদের কয়েকজনকে সঙ্গে বেঁধে নিলে চ'ল্‌বে না নায়েবম'শায়, আমাদের সকলকেই সঙ্গে নিতে হবে!

আশপাশের দিকে তাকিয়ে নায়েবম'শায় সহসা থম্‌কে দাঁড়ালেন। আবার সেই ইঙ্গিত। দরোয়ান বাঁধন খুলে দিল। কিন্তু তিনি ক্রোধে ফুল্‌তে ফুল্‌তে ব'ল্‌লেন—দেখা যাবে!

নায়েবম'শায় চলে গেলেন। গ্রামবাসীরা মুক্তির আনন্দে সহসা সাড়া দিতে পার্‌লো না। শুধু তাদের বুক ভেদ ক'রে নেমে এলো অকারণ চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস!···এটা মুক্তির আনন্দ না অব্যক্ত বেদনার গভীর অবসাদ—কে জানে?

* * *

রাত গভীর হ'ল, বৈকুণ্ঠ চাটুয্যে কিন্তু বাড়ী ফি'র্‌লেন না। স্ত্রী ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লেন। পাড়াপড়্‌শীদের বাড়ী গিয়ে অনুসন্ধান সুরু ক'র্‌লেন—তোমরা ওঁর কোন খবর জানো? এত রাত হ'ল—এখনও কেন ফির্‌ছেন না?

কারণটা তাদেরও অজ্ঞাত। সবাই বেরিয়ে প'ড়্‌লো তাঁর সন্ধানে। কিন্তু কোন্ খোঁজ পাওয়া গেল না।

পরদিন সকালে পুকুরপাড়ে লোকে লোকারণ্য। কারা যেন বৈকুণ্ঠের মাথাটা ঘাটের উপর রেখে গেছে, দেহের বাকীটা অংশ প'ড়ে আছে জলের ভেতরে।

* * *

মৃতদেহ সৎকার ক'রে পড়্শীরা ফিরে এলেন। কারণটা তাঁদের কাছে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু ঘাটিয়ে কোন লাভ নেই। যখন তাঁরা শক্তিহীন, তখন তাঁদের সইতেই হ'বে। বয়োবৃদ্ধের দল ব'ল্লেন—দেখ বৌমা, ব্যাপারটা আমরা ভাল বুঝ্ছিনে। বরং বলি, কাজটা চুকে গেলে, ছেলেটাকে কোথাও সরিয়ে দাও। বলা ত' যায় না—শত্রুর দল কখন কি ক'রে বস্‌বে কে জানে ?

কথাটা তাঁরও মনে লেগে গেল। স্বামীর শেষকৃত্য সমাধা হ'লে পর —প্রয়োজনীয় কাজগুলো গুছিয়ে নিলেন একে একে। জমিদারের খাজ্না কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়ে এলেন নিজের হাতে। তারপর একদিন রাতারাতি দশ-বারো বছরের ছেলে মতিলালকে নিয়ে গঙ্গা পার হ'য়ে অন্ধকার পথে হালিসহরের রামধন গাঙুলীর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লেন।

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। কড়াটা বারকয়েক নাড়াতেই গৃহিনী গোবিন্দমনি (রামধণবাবুর স্ত্রী) ভেতর থেকে উত্তর দিলেন, কে ?

রামা-কণ্ঠের কাতরতা ফুটে উঠ্লো—আমরা অসহায় দু'টি প্রাণী, দিদি !

গাঙুলী-গিন্নী দরজা খুলেই চম্‌কে উঠ্লেন—কে, দিদি ? এত রাতে—

কথা তাঁর শেষ হ'তে দিলেন না। ব'ল্লেন—বড় বিপদে প'ড়ে রাতারাতি পালিয়ে এসেছি—ছেলেটাকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে !

গাঙুলী-গিন্নী বাধা দিয়ে ব'ল্লেন, এখানে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে চলো।

উত্তরে বৈকুণ্ঠবাবুর স্ত্রী ব'ল্লেন—সময় ত' বেশী নেই ভাই ! অন্ধকারের

মধ্যে আমাকে ফিরে যেতে হবে। দাদা কোথায়? কথা দাও ভাই, মতিকে তোমরা গ্রহণ ক'র্‌লে!

অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা না গেলেও শেষের কথাগুলো ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো। গোবিন্দমনি ব'ল্‌লেন—সব কথাই আমাদের কানে এসেছে দিদি—ভেতরে এসো—

ঠিক সেই সময়েই খড়ম্ পায়ে খট্ খট্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে রামধনবাবু পাশে এসে দাঁড়ালেন। গোবিন্দমনি মতিলালকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ব'ল্‌লেন, তোমায় কথা দিলাম দিদি, ওকে আমরা গ্রহণ ক'র্‌লাম।

কয়েক সেকেণ্ড সকলেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। পরমুহূর্ত্তে দরজাটা সশব্দে বন্ধ হ'য়ে গেল।

রামধনবাবু দরজাটা তাড়াতাড়ি খুলে ডাক্‌লেন, এত রাতে কোথা যাবে বোন!

উত্তর পাওয়া গেল না! অন্ধকারের মধ্যে তিনি ততক্ষণ এগিয়ে গেছেন অনেকখানি পথ। রামধনবাবুর সে ডাক তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছালো কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

* * *

মতিলাল চালাক-চতুর বুদ্ধিমান ছেলে। লেখাপড়ায় আগ্রহও যথেষ্ট। মিশুকে। কয়েক দিনের মধ্যে বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে শুধু আলাপ জমিয়ে তুল্‌লেন না—পরস্পরের ব্যবধানটা মুছে দিয়ে তাঁদের মধ্যেই নিজের একটা স্থান ক'রে নিলেন অকপটে।

রামধনবাবু খুশী হ'য়ে উঠ্‌লেন। বড় ছেলে কেদারনাথকে ডেকে একদিন ব'ল্‌লেন,—দেখ কেদার, ছেলেটিকে যখন আমি গ্রহণ ক'রেছি, তখন আমার ইচ্ছে, ও আমার বাড়ীর একজন হ'য়ে উঠুক্। বংশও ভাল। তাই ব'ল্‌ছিলাম, ভুবনের সঙ্গে বিয়ে ওর দিই!

কেদারবাবু পিতার ইচ্ছার বিরোধিতা ক'র্লেন না। ব'ল্লেন—যখন আপনার ইচ্ছা, তাই হোক্।

*   *   *   *

পাঁজিপুঁথি দেখে দিন স্থির হ'য়ে গেল। মতিলাল সাত বছরের মেয়ে ভুবনমোহিনীর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে গাঙ্গুলীবাড়ী মুখর হ'য়ে উঠ্লো।

*   *   *   *

পিতার অকালমৃত্যু মতিলালকে হতভম্ব ক'র্লেও কিছুদিনের মধ্যেই নিজেকে খাড়া ক'রে তুল্লেন। ভাগলপুরের বাড়ীতে নিজেকে সম্পূর্ণ খাপ খাইয়ে পড়াশোনায় দিলেন মন।

অল্পদিনের মধ্যে মতিলাল বাড়ীর ছেলেমেয়েদের আকর্ষণের বস্তু হ'য়ে উঠ্লেন। চল্তি ভাষায় যাকে বলে—যুবকসমাজের পাণ্ডা। ভুবনমোহিনী তখনও শিশু। তাঁর বিধবা দিদির উপর মতিলালের দেখাশুনার ভার প'ড়্লো।

মতিলাল কাব্যচর্চ্চায় দিলেন মন! তাঁর কবিতা ও গল্পের ভক্ত হ'য়ে উঠ্লো যুবকসমাজ—বিশেষ ক'রে ভুবনমোহিনীর দিদি। গাঙ্গুলী-বাড়ীতে সহজেই প্রমাণিত হ'ল, মতিলাল একজন অসামান্য প্রতিভাশালী। তাঁর আদর, যত্ন ও খ্যাতি বাড়্লো বই কম্লো না।

একদিন বর্ষার শেষরাতে হঠাৎ একটা বিষাক্ত সাপ ভুবনমোহিনীর দিদিকে কামড়ে দিল! কেদারনাথ নিজের হাতে ক্ষত স্থানটা বেঁধে দিলেন। কেটে খানিকটা রক্তও বার ক'রে দিলেন। ছেলের দল ডাক্তারসাহেবের কাছে ছুট্লো। কিন্তু নিরাশ হ'য়ে ফির্তে হ'ল—সফরে গেছেন তিনি—সন্ধ্যার আগে কিছুতেই ফির্বেন না!

রোজা এলো। ঝাড়-ফুঁক সুরু হ'ল। কিছুতেই কিছু হয় না।

এমনি ক'রে সারাদিন কেটে গেল,—সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। যন্ত্রণায় ছটফট্ ক'র্ছেন বড়্দি।

বাড়ীর সকলের মুখে গভীর একটা বিমর্ষের ছায়া। একটু দূরে অপলক দৃষ্টিতে ব'সে আছেন মতিলাল।

অবশেষে, গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। ছুট্লেন কেদারনাথ। আর ভয় নেই—ডাক্তারসাহেব এসে গেছেন। ছেলের দলও কেদারনাথের পিছু পিছু ছুট্লো। একা ব'সে রইলেন শুধু মতিলাল।

বড়্দি কাতরকণ্ঠে ব'ল্লেন—আর সহ্য ক'র্তে পার্ছি না মতি! বাঁধনগুলো কেটে দাও। একটু স্বস্তি পাই!

মতিলাল বড়দির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। মতিলালও ছিলেন তাঁর একান্ত অনুগত। কোন বিচার-বিবেচনা না ক'রেই বাঁধনগুলো কেটে দিলেন—একের পর এক। রোগী একটু সুস্থ বোধ ক'র্লেও কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়্লেন।

ডাক্তার এলেন। বাঁধন কাটা—মাথাটা এলিয়ে প'ড়েছে কাঁধের ওপর। ডাক্তারসাহেব তবুও একবার চেষ্টা ক'র্লেন—কিন্তু তখন তিনি ইহজগতের মায়া কাটিয়ে যাত্রা ক'রেছেন পরপারে!

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ২৪ ও ২৭]

* * * *

বয়স যত বাড়ে পিতার শোচনীয় মৃত্যুর ভয়াবহ দৃশ্য বার বার প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা জাগায়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তাঁর সেই ইচ্ছাটা স্থবিরতা প্রাপ্ত হ'ল। মতিলাল ডুবে রইলেন বইএর মধ্যে। তবুও কি ভুল্তে পার্লেন নিজেকে? শেষে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে শিখ্লেন মদ।

সংসার তাঁর ভাল লাগে না, অথচ স্নেহশীলা সেবাপরায়ণা ভুবন-

মোহিনীকেও তিনি অবহেলা ক'র্‌তে পারেন না। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝে জন্মালো একটি কন্যা—নাম তাঁর অনিলা। দ্বিতীয় সন্তান মারা গেল ভাগলপুরে। তাই স্থির হ'য়ে গেল, এবার সন্তানসম্ভবা ভুবনমোহিনীকে দেবানন্দপুরে নিয়ে যাওয়া হবে।

* * * *

মাটির কাঁচা ঘরের বাইরের উঠানটায় ব্যাকুলভাবে মতিলাল পদচারণা ক'র্‌ছেন। ভেতরে মেয়েরা ভুবনমোহিনীকে নিয়ে ব্যস্ত। সহসা শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে সেই জীর্ণ কুটির মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌লো। মেয়েদের উচ্ছ্বাসমাখা স্বর ভেসে এলো···মেয়ে···মেয়ে···মেয়ে ··

মতিলালবাবুর আশা ভঙ্গ হ'ল। আবার মেয়ে! ঠিক সেই সময়েই মতিলালের মা ছুটে এলেন বাইরে। ব'ল্‌লেন—মতি, কাগজে টুকে রাখ্‌—১২৮৩, ৩১শে ভাদ্র, শুক্রবার—

মতিলালবাবু ক্ষুণ্ণমনেই টুক্‌রো একটা কাগজে টুক্‌তে লাগ্‌লেন, বাংলা ১২৮৩ সাল, ৩১শে ভাদ্র, শুক্রবার, ইং ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬···

ছেলের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে মতিলালবাবুর মা সহাস্যে ব'ল্‌লেন—ভয় নেই রে মতি, ছেলে—ছেলে হ'য়েছে!···

* * * *

সংসারের চাপ বাড়ে। ভুবনমোহিনী তাগিদ দেন—একটা কিছু কাজের চেষ্টা দেখো, নইলে সংসার চ'ল্‌বে কেমন ক'রে?

মতিলাল বিরক্তিভরে বইখানা নামিয়ে রাখ্‌লেন। এ সবের চিন্তা তাঁর ভাল লাগে না। অবশ্য মনে মনে ভুবনমোহিনীকেও তাঁর ভয় কম ছিল না। যে মানুষ প্রতিবাদ ক'রে, তাকে বোঝান সহজ, কিন্তু যে কোন-দিন কোন অনুযোগ মুখফুটে করেনি—সে শুধু দুর্বোধ্য নয়—ভয়ের বস্তুও বটে! তাই স্থানীয় জেলে—তিরিশ টাকা মাইনের একটা চাকরী নিয়ে, সমস্ত কিছুর দায়িত্বের হাত থেকে মুক্তি পেতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

নিয়মিত মাসের প্রথম তারিখে তিরিশটি টাকা এনে দেন—ভুবনমোহিনীও খুশী হন। স্বামীর উপার্জ্জনের টাকা—এটাই ত তাঁর স্বর্গ-সুখ! কিন্তু বড় সরল, অতি বিশ্বাসী ও আত্মভোলা ভুবনমোহিনী দেবী! এ সুযোগ কিন্তু পুরোপুরি গ্রহণ ক'রলেন মতিলাল। তাঁর অজ্ঞাতসারে কিছু টাকা আত্মসাৎ ক'রে নেশার আসরটি জমিয়ে তুললেন দিনের পর দিন। এপাশে ভুবনমোহিনী দেবী কায়ক্লেশে সংসার গুছিয়ে তুলতেই ব্যস্ত। দিন কেটে চ'ললো কোনক্রমে, কিন্তু ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা আর হ'য়ে উঠলো না। অবশেষে শরৎচন্দ্রের পড়াশুনার আদিপর্ব্ব সুরু হ'ল কুসুমকামিনী দেবীর কাছে। বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ। শেষে ধ'রলেন বোধোদয়। এর সঙ্গে যুক্ত হ'ল পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র। পড়ানো ও বোঝানো চ'লতে লাগলো একসঙ্গে।

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ৪৬]

* * * *

গাঙুলী-পরিবারে সহসা একটা অঘটন ঘ'টে গেল। সংসারটা চারপাশে ছিট্‌কে প'ড়লো। কিছুদিনের জন্য ভুবনমোহিনীকেও দেবানন্দ-পুরে আশ্রয় নিতে হ'ল।

গ্রামে শিক্ষার কোন সু-ব্যবস্থা ছিল না। খড়ের ছাউনির প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপে প্যারী পণ্ডিতের (বন্দ্যোপাধ্যায়) ছোট একটি পাঠশালা ব'সতো। সেখানে প'ড়তো পাড়ার যত ছোট ছেলেমেয়ে। পণ্ডিত-ম'শায়ের পেশা ছিল যজমানী। তারই ফাঁকে যেটুকু সময় পেতেন, দু'বেলা ছেলে-মেয়েদের একটু দেখাশুনা ক'রতেন—আর ঘন ঘন তামাক সেবন ক'রতেন। এই তামাকের খরচ যোগাড় হ'তো প্রতি মাসের পঞ্চমীর দিন—পড়ুয়াদের কাছে গুরুদক্ষিণা হিসাবে। এ-রীতি সে সময়ে প্রতি গ্রামেই প্রচলিত ছিল। কেউ পয়সা দিত, কেউ চাল, কেউ লাউ, কেউ বেগুন—যার যা সামর্থ্যে কুলোয়।

শরৎচন্দ্রকেও এখানে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হ'ল। কিন্তু সে-বয়সে তিনি ছিলেন বড় চঞ্চল ও উদ্দাম প্রকৃতির। প্রতিদিন যেরূপ তামাক সাজা থাকে, তেমনি একদিন তামাকের পরিবর্ত্তে ইটকুচি দিয়ে তামাক সেজে রাখ্‌লেন। পণ্ডিতমশাই যেরূপ আরামে যথারীতি তামাক সেবন করেন, সেইরূপ তামাক সেবনে প্রবৃত্ত হ'লেন। কিন্তু কিছুতেই আর ধূমোদ্গার হয় না। প্রাণপণে হুঁকোতে টান দিলেন—তবুও যেই কে সেই! ব্যাপার কি? কল্‌কেটি উপুড় ক'রে দেখেন—তামাকের পরিবর্ত্তে টুক্‌রো ইট! এটি যে ছাত্রদের কীর্ত্তি সেটুকু বুঝ্‌তে পণ্ডিত-ম'শায়ের একটি মুহূর্ত্তও বিলম্ব হ'ল না। সুরু হ'ল নির্য্যাতন।

বিনোদ বাঁড়ুয্যে ছিল ভীরু প্রকৃতির ছেলে। ভয়ে শরৎচন্দ্রের নাম দিল বলে। শরৎচন্দ্র দেখ্‌লেন বেগতিক। পণ্ডিতম'শায় কাছে আসার পূর্ব্বেই বিনোদকে জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে—দিলেন ছুট্‌। ছেলেরাও তাঁর পিছুপিছু ছুট্‌লো। পণ্ডিতম'শায়ের কড়া আদেশ—ধর্‌ ওটাকে ধর। বন্ধু হ'লেও ধ'র্‌তে এখন হবেই—নইলে মুক্তি নেই কারও—

কিন্তু তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সাধ্য ছিল না কারও। সকলেই ঘর্ম্মসিক্ত হ'য়ে ফিরে এলো। ব'ল্‌লো—পণ্ডিতম'শায়—ঘাটের বাঁধা জেলেদের ডিঙ্গি খুলে নিয়ে শরৎ পালিয়েছে!

বলিস্‌ কি রে? বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে প'ড়্‌লেন পণ্ডিতম'শায়!

আমরা সবাই দেখে এলাম ত তাই! একসঙ্গে উত্তর দিল ছাত্রের দল।

ডুবে যাবে না তো? একটা অজানা আশঙ্কায় বুকটা তাঁর দুরু দুরু ক'রে কাঁপ্‌তে সুরু ক'র্‌লো—সবই যে এর সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড—কি মুশ্‌কিলেই না পড়া গেল! তাড়াতাড়ি ছুট্‌লেন শরৎচন্দ্রের ঠাকুরমাকে খবর দিতে!

শরৎচন্দ্র সেদিন আর বাড়ীমুখো হ'লেন না। পণ্ডিতম'শায়ের যা রাগ—ধরা প'ড়্লে কি আর রক্ষা আছে? সরস্বতী নদীর স্রোতে সোজা ডিঙি ভাসিয়ে দিয়ে চুপ্‌চাপ্‌ বসে রইলেন। ডিঙি কৃষ্ণপুরের রঘুনাথ গোস্বামীর আখড়ার কাছে গিয়ে ঠেক্‌লো। সেখানেই নিশ্চিন্তে রাতটুকু দিলেন কাটিয়ে।

এ-পাশে সমস্ত গ্রাম তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হ'ল—পাশের গ্রামেও লোক ছুট্‌লো। কোথাও কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। রাতটা আশঙ্কা ভরে কাট্‌লো। পরদিন সকালে আবার লোক খুঁজ্‌তে বেরুলো—অবশেষে দেখা গেল, পরম নিশ্চিন্তে আখড়ায় ব'সে রাধা-কৃষ্ণের কীর্ত্তন গলধঃকরণ ক'রছেন শিশু শরৎচন্দ্র।...

প্রকৃতির সহজ স্ফুরণকে আমরা চল্‌তি কথায় বলি 'দস্যিপনা"—দেখিও সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। ফলে শাসনের বেড়াজালে। তাদের সেই সহজ স্ফুরণের কণ্ঠরোধ ক'রে—আমরা খুশী হই। ঘোষণা করি 'গুড বয়'—সমাজের আদর্শ ছেলে। শাসনের ভয়ে তাদের প্রকৃতিটা কতকটা সংযত হ'লেও মনেপ্রাণে তারা তাদের সহচর খুঁজে বেড়ায়। তাই যখনই কারও মধ্যে দেখে সেই চঞ্চলতা—তখনই তাদের তারা আপন ক'রে নিতে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে।

শরৎচন্দ্রেরও সঙ্গীর অভাব হ'ল না। পণ্ডিতম'শায়ের ছেলে "কাশীনাথ", আর এক যাজক ব্রাহ্মণের ভাগ্নী "কালিদাসী" ওরফে রাজলক্ষ্মী তাঁর একান্ত অনুগত হ'য়ে প'ড়্‌লো। সকল কাজের সাথী হ'ল তারাই। যত ঝগড়া, তত ভাব—কেউ কাউকেও একটি মুহূর্ত্ত ছেড়ে থাক্‌তে পারে না।

['বাতায়ন', শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪৫]

* * * *

পণ্ডিতমশায়ের আর একটি গুণ ছিল। প্রায়ই আফিং সেবন কর্‌তেন ব'লে নেশায় মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়্‌তেন। শরৎচন্দ্র সেই অবকাশে তাঁর প্রিয় সঙ্গিনী কালিদাসীকে নিয়ে সরে প'ড়্‌লেন নিঃশব্দে। অন্য ছেলেরা তাঁকে যথেষ্ট ভয় ক'র্‌তো, মিথ্যে ঘাটিয়ে লাভ কি? কখন ঝোপের আড়াল থেকে ইটের টুক্‌রো দিয়ে মাথাটা ফাটিয়ে দেবে কে জানে?

কালিদাসী বয়সে শরৎচন্দ্রের চেয়ে কিছু ছোট ছিল। রোগা—পেটমোটা, গায়ের রংটা কিন্তু ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চুলগুলো ছোট ছোট,—শরৎচন্দ্রের একান্ত অনুগত! খেলা ত ছাই, বন থেকে জোগাড় ক'রে আন্‌তে হ'ত বৈঁইচি ফল।

এই বৈঁইচি ফলের প্রতি শিশু শরৎচন্দ্রের লোভ ছিল অসাধারণ। এই অমৃত সংগ্রহে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে কালিদাসীর নির্য্যাতনের সীমা থাক্‌তো না। মাথার চুলগুলো প্রায় শেষ হওয়ার যোগাড় হ'তো, পিঠে দু'চার ঘা যে প'ড়তো না এমন কথা নয়, কিন্তু মেয়েটির ছিল সহ্য করার অসম্ভব ক্ষমতা। কোনদিন কিন্তু মুখফুটে এর কোন প্রতিবাদ সে করেনি, বরং অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে গভীর জঙ্গল থেকে সংগ্রহ ক'রে আন্‌তো এই অমূল্য সম্পদ্‌।

শরৎচন্দ্রের রাগ প'ড়ে যেতো সঙ্গে সঙ্গে। সস্নেহে তা'র হাতখানি ধ'রে কোলের কাছে টেনে নিয়ে চিবুকখানি তুলে আদরমিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—খুব লেগেছে নারে কালিদাসী?

কালিদাসীর চোখের পাতাগুলো ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠলো। শরৎচন্দ্র নিজের হাতে তার চোখের পাতাগুলো মুছে দিলেন ধীরে ধীরে। অনুতপ্ত কণ্ঠে ব'ল্‌লেন—এই কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন তোর গায়ে হাত তুল্‌বো না—বুঝ্‌লি!

বৈঁইচি ফলের মালাটা এগিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লেন—খা'।

কালিদাসী জিভ্ বার ক'রে দু'হাত পিছিয়ে গেল। ব'ল্লো, একবার দিয়ে আর কি ফিরিয়ে নিতে আছে? না—না—তুমি খাও।...

*   *   *   *

দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ হ'য়ে শরৎচন্দ্রকে বাঙলা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হ'ল। বোধোদয় ও পদ্যপাঠ পড়া সুরু হ'ল কিন্তু প্রকৃতির সহজ বিকাশ তাঁর কোনমতেই রুদ্ধ করা গেল না। স্কুল থেকে পালিয়ে এর বাগান ওর বাগান থেকে আম, কাঁটাল, আনারস সংগ্রহ, ও তার সদ্ব্যবহার চ'ল্‌তে লাগ্‌লো পূরোদমে।

*   *   *   *

সরকারি চাকরী থেকে অবসর নিলেন কেদারনাথ। তারপরেই দীননাথ গেলেন মারা। এপাশে অমরনাথ (ন-কাকা) অসুস্থ হ'য়ে প'ড়্‌লেন। অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে এগিয়ে চ'ল্‌লো। ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিলেন। এমন সময় অমরনাথ ব'ল্‌লেন, একবার ভুবনকে যে আমি দেখবো!

সংসারের চাপে কেদারনাথ ঋণজালে জড়িয়ে প'ড়েছিলেন। তবুও মেয়েকে আন্‌তে ছুট্‌লেন দেবানন্দপুর।

মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌তে গিয়ে কেদারনাথ স্বচক্ষে দেখ্‌লেন ভুবনমোহিনীর দুরবস্থা। চোখে তাঁর জল বাধা মানে না। অথচ মতিলালবাবু সেইরূপই নির্ব্বিকার। তিনি শিশুদের সঙ্গে মিশে, শিশুর মত খেলা করেন। অবসর সময়ে বই নিয়ে বসেন—কখনও বা কাগজকলম নিয়ে গল্প বা কবিতা লিখতে বসেন কিন্তু শেষ করার ধৈর্য্য তাঁর থাকে না। সকল লেখাগুলোই অসমাপ্ত রয়ে যায়!

আর ভুবনমোহিনী এপাড়া ওপাড়া থেকে শাকসব্জি সংগ্রহ ক'রে কোন রকমে স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেন। বাকী সময়টুকু ছেলে-

মেয়েদের নিয়েই তাঁর কেটে যায়। সন্ধ্যায় কাটেন, পইতের সুতো, কখনও বা বুনেন আসন··

ভুবনমোহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। তার কিছুদিন পরেই অমরনাথ গেলেন মারা। কেদারনাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। ঠিক সেই সময় ডিহিরিতে মতিলাল একটি চাকরী পেয়ে গেলেন। সপরিবারে তিনি যাত্রা ক'র্‌লেন ডিহিরিতে। কিন্তু সে-চাকরী তাঁর বেশীদিন স্থায়ী হ'ল না। পুনরায় ফিরে এলেন ভাগলপুরে।

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ৪১, ৪২ ও ৪৩]

* * *

ভাগলপুরে যখন ফিরে এলেন তখন শরৎচন্দ্রের বয়স হবে প্রায় সাত। বাড়ীর ছোটবড় ছেলেমেয়েদের পাণ্ডা হ'য়ে ব'স্‌লেন দু'দিনের মধ্যে। ছেলেরাও যেন তাঁকে খুশী ক'র্‌তে পার্‌লেই আনন্দ পায় সকলের চেয়ে বেশী।

বাড়ীর কর্ত্তাদের নিষেধ, ছেলেমেয়েদের বাইরে কোথাও যাওয়া চ'ল্‌বে না। শরৎচন্দ্র কিন্তু সেই নিষেধের গণ্ডী মেনে নিতে পারলেন না। সাঙ্গপাঙ্গদের ব'ল্‌লেন—চল্, নদীর ঘাটে একটু ঘুরে আসা যাক্।

ছেলেমেয়ের দল অস্বোয়াস্তি বোধ করে।

শরৎচন্দ্র তাদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বলেন,—যেমন তোরা বোকা! আরে, "মানা" মানেই খুশীমত যাওয়া, শুধু কি তাই, বারে বারে যাওয়া। চল্—

পাণ্ডার আদেশে ছেলের দল অমান্য ক'র্‌তে সাহসী হয় না। হয়ত শরৎ রাগ ক'রে ব'স্‌বে। নিঃশব্দে সবাই খিড়কী-পথে বেরিয়ে প'ড়্‌লো একে একে।

কেদারবাবু বিক্ষুব্ধ হ'লেন। এমন একগুঁয়ে ছেলেও তিনি দেখেননি

তাঁর জানে। ভুবনমোহিনীকে কাছে ডেকে ব'ল্লেন—এমন সৃষ্টিছাড়া ছেলেও ভূ-ভারতে আমি দেখিনি ভুবন! ওকে একটু শাসন করো—নইলে আর বাগ মানানো যাবে না।

ভুবনমোহিনী নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ ছাড়াই বা তাঁর জবাব দেওয়ার আছে কি?

কেদারবাবু বাইরের ঘরে চলে গেলেন। ভুবনমোহিনী সেইখানে দাঁড়িয়ে আঁচলের খুঁট্‌টা নাড়াচাড়া ক'র্‌তে কর্‌তে ভাব্‌লেন—যে দুষ্টু-ডিঙ্‌র ছেলে ও, সহজে কি ওকে পোষ মানানো যাবে?

* * *

রোগাটে পাকাটে ময়লাটে শরৎচন্দ্র শান্তশিষ্ট ছেলের মত অন্দরমহলে চুপি চুপি প্রবেশ ক'র্‌লেন।

ভুবনমোহিনী দেবী এতক্ষণ তাঁরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন। কানটা চেপে ধ'রে ধমক্ দিলেন—কোথায় ছিলি হতচ্ছাড়া ছেলে?

শরৎচন্দ্র অভিমানে ফুলে পড়্‌লেন। চোখের পাতাগুলো সিক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো পরমুহূর্ত্তে। নিরুত্তরে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মা'র মনের দৃঢ়তা চকিতে মুছে গেল। হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে ঘরের ভেতর নিয়ে এলেন। আঁচল দিয়ে চোখের পাতাগুলো মুছে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সস্নেহে ব'ল্লেন—কেন কথা শুনিস্‌নে বল্‌তো?

শরৎচন্দ্র বিস্ময়ে ফেটে প'ড়্‌লেন। ব'ল্লেন, কেন? তোমার সব কথাই ত শুনি!

ভুবনমোহিনী ব'ল্লেন, বাবার কথা তুই একটিও কানে তুলিস্‌নে কেন? যা বলেন ঠিক তার বিপরীত ক'রিস্—এসব কি ধরণের দুষ্টুপনা বল্‌তো?

শরৎচন্দ্র মা'র কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, মুখখানা লুকিয়ে, চুপি চুপি ব'ল্‌লেন—ওঁরা বাধা দেন কেন?

*   *   *

অন্দরমহলে যাওয়ার গলিপথে, গোয়াল ঘরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। তার শাখা-প্রশাখা খাপরির চালের ওপর হেলে প'ড়েছিল। গাছটায় বারো মাস পেয়ারা ফল্‌তো। ছেলেমেয়েদের সবারই ছিল গাছটার উপর লোভ—বিশেষ ক'রে শরৎচন্দ্রের।

কেদারনাথবাবু ও চাকর, মুশাই পেয়ারাগুলি সংরক্ষণের আশায় প্রতিটি স্তবকে ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রো জড়িয়ে বেঁধে, প্রত্যেকটি গুণে রাখ্‌তেন।

কিছুদিন পরে মুশাই খবর দিল—বাবু শয়্‌তা সব খা লিয়া।

অনুসন্ধানে জান্‌তে পার্‌লেন—তাঁর অক্ষৌহিণীকে পাহারায় রেখে, শরৎচন্দ্র সবগুলি নিঃশেষ করেছেন অসঙ্কোচে, অবশ্য প্রসাদ থেকে সাঙ্গোপাঙ্গের দল বঞ্চিত হয়নি—সে আশাও নিরর্থক। তবে দু'চার জনের যা মাথা ফেটেছে আতিশয্যের প্রাচুর্য্যে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থাও হ'য়েছে তেমনি! পেয়ারা-বাঁধা কাপড় পুড়িয়ে ক্ষত স্থানটি বেঁধে দেওয়া হ'য়েছে কখনও—আর সামান্য আঘাত পেয়েছে যারা, তাদের ব্যবস্থা হ'য়েছে চিবানো দুর্ব্বা ঘাস—তার বেশী কিছু নয়!

কেদারবাবু আপন মনে হাসেন। বলেন—ওটা ছেলে নয়—একটা ডাকাত!

*   *   *

মুশাই ঘুমিয়ে প'ড়্‌লেই চাবি চুরি ক'রে ভাঁড়ার ঘরের দরজা খুলে ভেতরের বেড়াল, ইঁদুর ও বেঁজীর স্বাধীন স্বরূপ দেখার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সুরু হ'য়ে যায়।

পাশে একটা ছেলে হয়ত একটু আওয়াজ ক'রে বস্‌লো। শরৎচন্দ্র কট্‌মটিয়ে তার দিকে তাকিয়ে নীরব থাকার নির্দ্দেশ দিলেন—চুপ!

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ৫৭]

* * *

সরকারদের বাড়ীর রাজু (রাজেন্দ্রনাথ) ঘুড়ি ওড়াতে ছিল ওস্তাদ। তার সঙ্গে পাল্লা দেয়—সে তল্লাটে ছিল না এমন কেউ। শরৎচন্দ্র ঠিক্ ক'র্‌লেন—রাজুর ঘুড়ি কাট্‌তে হবে।

সারাদিন চ'ল্‌লো সুতোয় মাঞ্জা দেওয়া। তারপর সুরু হ'ল ঘুড়ি ওড়ানো।

শরৎচন্দ্র দিলেন রাজুর ঘুড়ি কেটে। রাজু সক্রোধে ছুটে এলো—কে কাট্‌লো তার ঘুড়ি ?

মনিমামা ও সুরেন্দ্রনাথ তাকে ধ'রে নিয়ে এলো শরৎচন্দ্রের কাছে। পাড়া-প্রতিবেশী হিসাবে উভয়ের মধ্যে মুখচেনাচিনি ছিল। কিন্তু শক্তির পরিচয় নিয়ে দেখা হ'ল এই প্রথম। অথচ এই পরিচয়েই বন্ধুত্ব হ'ল দৃঢ়। চকিতে রাজুর রাগ জল হ'য়ে গেল, উভয়ে উভয়ের কাঁধ ধরাধরি ক'রে বেরিয়ে প'ড়্‌লো গঙ্গাতীরে।

মাঝপথে সহসা রাজু থম্‌কে দাঁড়ালেন। পরমুহূর্ত্তে জলে ফেলে দিলেন তার লাটাইখানা।

সবিস্ময়ে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—একি ক'র্‌লে রাজু ?

রাজেন্দ্রনাথ ব'ল্‌লেন—কাজ ওর শেষ হ'য়ে গেছে ভাই! তাই ওকে ভাসিয়ে দিলাম মা গঙ্গার বুকে—

তারপর আর কোনদিন রাজুকে ঘুড়ি ওড়াতে দেখা যায়নি।

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ. পৃঃ ৮২]

* * *

ফড়িং, বেড়াল, বেঁজি, লাল-নীল মাছের চাষ স্থরু হ'ল। আড়াই ফুট লম্বা শিশুকাঠের বাক্সের মধ্যে রাখা হ'ল রাম ফড়িং, গঙ্গা ফড়িং, গাধা ফড়িং, কেরাণী ফড়িং। এদের তত্ত্বাবধানের ভার প'ড়্লো ছোট-গিন্নীর বড় মেয়ে 'ছুনী'র ওপরে। সাঙ্গোপাঙ্গোদের আদেশ দিলেন—নিয়ে এসো আকন্দপাতা—ঘাস—দাও জল।

আর নিজে পরীক্ষা চালাতে লাগ্লেন—তাদের আহার ও আয়ুর মেয়াদ।

সারা বাড়ীতে হৈ-চৈ, যেন রাজস্থয় যজ্ঞের আয়োজন চলেছে।

[শরৎ-পরিচয়, স্থ. না. গ., পৃঃ ৫৮]

* * *

বাড়ীর বউদের মধ্যে ছোটগিন্নীই (কুস্থমকামিনী) ছিলেন শিক্ষিতা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে নিজের হাতে পুরস্কার দিয়েছিলেন। সেই গর্ব্ববোধটা তাঁর সব সময়েই ছিল জাগ্রত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' ও 'বঙ্গদর্শন' নিয়ে বস্তেন। বাড়ীর ছোটবড় ছেলে-মেয়ের দল তাঁর পাশে ব'সে সেই পাঠ শুন্তো একমনে। তাদের মধ্যে শরৎচন্দ্রই ছিলেন প্রধান শ্রোতা। আর বইগুলি সংগ্রহ ক'রে এনে দিতেন মতিলালবাবু। তিনিও এই মহিলাটিকে একটু বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখ্তেন।

[শরৎ-পরিচয়, স্থ. না. গ., পৃঃ ১০-১১]

* * *

পোষা বুড়ো কোকিলটার মুখে রা' ফোটে না। কত শীত-বসন্ত এলো গেল, তবুও সে নির্ব্বিকার।

শরৎচন্দ্র স্বরস্তম্ভনের মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা ক'র্লেন—নিয়ে এসো কচি আমের পাতা!

অক্ষৌহিণী ছুটলো। চোখের পলকে কচি আমের পাতায় উঠানটা গেল ভরে। সাজিয়ে রাখা হ'ল তার মুখের কাছে, কিন্তু শয়তান পাখীটা দিনে রাতে একটিবারও ঠোকর মার্লো না।

শরৎচন্দ্র তখন ব্যবস্থা দিলেন, মরিচের গুঁড়ো আর কচি আমপাতার রস ওর গলায় ঢাল্‌তে হ'বে!

সাঙ্গোপাঙ্গের দল আশ্চর্য্য হ'য়ে ডাগর ডাগর চোখ মেলে তাঁর মুখের দিকে তাকালো। সহজ কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন—দেখিস্‌নি সেদিন চন্দরবাবুর বাড়ীতে?

কি? কি শরৎ—একসঙ্গে প্রশ্ন ভেসে উঠ্‌লো।

সঙ্গে সঙ্গে মুন্তরিবাই ব'ল্‌লো—আদার রসে মরিচের গুঁড়ো—

শরৎচন্দ্রও যোগ দিলেন—আমের কচি পাতার রস, কোকিলের আদার কাজ করে কিনা!—মরিচ গুঁড়িয়ে দিলে এমন ডাক্‌বে মনে হবে যেন যমুনাপুলিনের কুঞ্জবন।

কথা ও কাজ সঙ্গে সঙ্গে সারা হ'ল। সবাই মিলে বুড়োকে চেপে ধন্বন্তরি রসায়ন খাইয়ে দেওয়া হ'ল। বিপুল আশা নিয়ে রাত্রি যাপন ক'র্‌তে ফিরে গেল ছেলের দল। কেউ কেউ সারা রাত কোকিলের কুহুতানও শুন্‌লো।

সকাল হ'তেই সব একে একে ছুটে এলেন খাঁচার পাশে। দেখ্‌লেন বুড়ো কোকিল ঠ্যাং উল্‌টে যাত্রা ক'রেছে পরপারে!

সে দৃশ্য দেখে শরৎচন্দ্রের চোখের জল আর থামে না।

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ৫৯]

*   *   *   *

. গঙ্গার ধারে বিরাট একটা অশ্বত্থ গাছ। তা'র একটি ডালের ওপর ছোট একটি ঘর। সেখানে ব'সে রাজু সাধন-ভজন ক'র্‌তো। প্রবেশের

অধিকার বড় একটা কারও ছিল না। সে ঘরে যাওয়া ও আসার জন্যে সরু একটা বাঁশ লাগানো থাক্‌তো। যে অনায়াসে সেই বাঁশ বেয়ে সেখানে যেতে পার্‌তো, রাজুর বিচারে সেই হ'তো পুণ্যাত্মা—আর যারা প'ড়ে যেতো, তাদের সেখানে যাওয়ায় অধিকার ছিল না কোনদিন।

সেই হিসাবের খাতায় শরৎচন্দ্রও ছিলেন একটি পুণ্যাত্মা। কারণ, উভয়েরই ছিল গভীর মনের মিলন। উভয়েই ক'র্‌তেন সাধন-ভজন।

তারই ঠিক নীচে বাঁধা থাক্‌তো রাজুর নিজস্ব একটা ছোট ডিঙি। সময় অসময় নেই, খেয়াল হ'লেই তাতে উভয়ে চড়ে পাড়ি দিতেন গঙ্গার অপর পারের দিকে।

*　　*　　*　　*

নেপাল থেকে ছোটকর্ত্তা একটা বিরাট-বপু কুকুর নিয়ে এলেন। নাম তার "টমি"। ছোট ছেলেমেয়েদের সে একটি বিস্ময়ের বস্তু।

শরৎচন্দ্র সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে একটু দূরে ব'সে ব'সে তা'র আচার-ব্যবহার ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'র্‌ছিলেন। সহসা মুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন, ঠিক এই জাতের কুকুর নিয়ে বরফের ওপর নৌকোর মত গাড়ী চ'ড়ে বেড়াতে কতই না মজা!

ছেলের দল ত অবাক্। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—বরোফ্! যা আমরা খাই?

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন, হ্যাঁরে—হ্যাঁ! ও দেশটা বরফের দেশ কি-না! প্রায়ই বরফ প'ড়ে। যখন সেগুলো জ'মে শক্ত হ'য়ে যায়, ও দেশের লোকগুলো তখন ওই গাড়ীগুলো নিয়ে হাওয়া খে'তে বেরিয়ে পড়ে।

ছেলের দল দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লো। ব'ল্‌লো, যদি এখানেও পড়্‌তো!

শরৎচন্দ্র হেসে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, তোদের দুঃখ্খু যে সেই গরীব

মানুষটার মত হ'ল রে! রাস্তায় লাগাম কুড়িয়ে পেয়ে ঘোড়ার শোকে কেঁদে কেঁদে শেষ পর্য্যন্ত সে মারাই গেল।

ওঃ, বানানো গল্প বুঝি! ছেলেমেয়ের দল হেসে লুটোপুটি খেতে খেতে এ ওর গায়ে গড়িয়ে প'ড়্‌লো।

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ৬০-৬১]

* * *

মতিলালবাবুর মনটা ছিল শিশুর মত সরল। ছেলেদের নিয়েই ছিল তাঁর কারবার। বাড়ীর কর্ত্তারা যখন ছেলেদের ক'র্‌তেন শাসন, মতিলালবাবু সকলের চোখে ধূলি দিয়ে তাদের লাঞ্ছনার বোঝাটা হাল্‌কা করার চেষ্টা ক'র্‌তেন। সন্ধ্যায় সন্ধ্যামণি ফুলের মালা গেঁথে, সাম্‌নে যে প'ড়্‌তো তারই গলায় পরিয়ে দিতেন। কখনও বা গোপনে তাদের আহার যোগাতেন। আবার ভোরে উঠে তাদের জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়ে হুক্কা হুক্কা রবে বারকয়েক শেয়ালের ডাক ডেকে নিঃশব্দে প'ড়্‌তেন সরে। আর ছেলের দল ভয়ে পরস্পর পরস্পরকে জাপ্‌টে ধ'রে চোখ বুজিয়ে প'ড়ে থাক্‌তো কাঠ হ'য়ে সব শুয়ে।

শরৎচন্দ্র বহু চেষ্টা ক'র্‌লেন কিন্তু শেয়াল মহাপ্রভুর সন্ধান ক'র্‌তে পার্‌লেন না কোনদিন।

* * *

"সংসার কোষ" থেকে শরৎচন্দ্র আবিষ্কার ক'র্‌লেন, বেলের শেকড় ফণা-ধরা গোখ্‌রো সাপের মুখের কাছে ধ'র্‌লেই সে হীনবল হ'য়ে পড়ে—মাথাটা নীচু ক'রে নেয়।

মনিমামা আবিষ্কার ক'র্‌লেন, "ঐ হ্রীং হ্র্যাং হ্রিং হ্রিং হ্রিং রক্ষ রক্ষ স্বাহা" জপ ক'র্‌লে নাকি সকল বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

ছেলের দল জপ ক'র্‌তে সুরু ক'র্‌লো।

শরৎচন্দ্র একটা হাঁড়ি আর সরা যোগাড় ক'রে আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন—সাপের সন্ধানে।

অনেক চেষ্টার পর একটা গোখ্‌রো সাপের বাচ্ছা ধরা হ'ল। বেলের শেকড় নিয়ে পরীক্ষা সুরু হ'ল। সাপ ফণা তুলে দুল্‌তে লাগ্‌লো। শরৎচন্দ্র তার মুখের সাম্‌নে ধ'র্‌লেন বেলের শেকড়। সাপটা মাথা ত নীচু ক'র্‌লোই না বরং তিনবার শেকড়টার ওপর পর পর ছোবল দিয়ে—অন্য কিছুতে ছোবল মার্‌বার চেষ্টা ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

মনিমামা বিপদের আশঙ্কা বুঝে মোটা লাঠি দিয়ে একেবারে তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

শরৎচন্দ্র মরা সাপটার দুঃখে সহানুভূতি জানালেন, আহা, বেচারা!

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ৬৩]

বাড়ীর পশ্চিম সীমানায় একটা বিরাট মাঠকোঠা ছিল। ওপরে ওঠার জন্যে ইট আর মাটি দিয়ে ৮।১০ ফুট উঁচু সিঁড়ি গাঁথা ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে, লাফানোর আগে কেমন ক'রে পায়ে স্প্রিং দিতে হয় তাঁ'র ডিমনেষ্ট্রেশন্‌ দেখাতেন শরৎচন্দ্র, প্রথমে একটা বেড়াল বাচ্চা ফেলে দিয়ে। কখনও বা নিজেই লাফিয়ে প'ড়্‌তেন।

সঙ্গীরাও সেই নীতি অনুকরণে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌তো।

[শরৎ-পরিচয় সু. না. গ., পৃঃ ৬৫]

* * * *

শনিবার ছুটির পর অমরনাথের নিমতলায় বস্‌তো বাজার। ভাঙ্গা খোলামকুচি ঘসে টাকা, আধুলি, সিকি, তৈরী ক'রে—তেঁতুলবিচি, রাটের বিচি, শুকনো তুঁত, ডুমুর, বিচিত্র পাতার ডাঁটা, চ'ল্‌তো কেনাবেচা।

শরৎচন্দ্র ছিলেন প্রধান ও উৎসাহী ক্রেতা। এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, মাছের দাম কত?

উত্তর এলো—আট আনা।

মুখখানা বিকৃত ক'রে শরৎচন্দ্র জবাব দেন, বল কি? গিন্নীর আবার মাছ নইলে ভাত রুচে না—দাও পোয়াটাক্।

শুক্‌নো তেঁতুলবিচি ঠোঙায় তুলে নিয়ে পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করেন, পুঁইশাক কত ক'রে?

উত্তর এলো—দু'গাছা!

বলিস্ কি রে? না—তোরা পাকা বাড়ী তৈরী না ক'রে ছাড়্‌বি না দেখ্‌ছি! চারগাছা হবে না?

সে মাথা নাড়্‌লো। শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, দে দে, তিনগাছা দে!

সে খুশীভরে ঘেঁটুপাতাগুলো তুলে দিল।

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ৬৫]

*   *   *   *

রান্নাঘরের পিছন দিয়ে গঙ্গাস্নানে যাওয়ার যে রাস্তা প'ড়্‌তো তার মাঝে একটা পড়ো বাগান ছিল। সেটি সেদিনে শ্যামবাবুর বাগান নামে পরিচিত ছিল।

এই বাগানটি ছিল শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের লীলাক্ষেত্র। এখানে বাড়ীর ছোটকর্ত্তা অঘোরনাথবাবুর সফরের জিনিবপত্র-বাহক একটি ঘোটকী ও তার বাচ্চা সকল সময়েই বিচরণ ক'র্‌তো। তার রক্ষক ছিল এক-চোখো ভাতুয়া। বয়সে ছিল শরৎচন্দ্রের সমবয়সী। তারই সহযোগিতায় এই ঘোটকীর পিঠে চ'ড়ে শরৎচন্দ্র তার গতির সঙ্গে সমতা রেখে ব্যালেন্সের নানারূপ কসরৎ দেখাতে সুরু ক'র্‌লেন।

সঙ্গীদের উৎসাহ বেড়ে গেল। সংগ্রহও সুরু হ'য়ে গেল। রাজুদের বাঁদরীটাকে আনা হ'ল। যদিও একটু-আধটু কামড়ায়, তবুও সে নইলে সব মজাই মাটি!

বাড়ীর কুকুর টমি! প্রকাণ্ড ও গিদ্‌খোড় তার চেহারা। তাকে আগুনের রিং টপ্‌কাতে শেখানো হ'ল।

গোরাচাঁদ রায়ের বাগানে—প্যারালাল বার, হোরাইজেণ্টাল বার ও ট্রাপিজের কসরৎ শেখার রীতিমত রিহার্স্যাল আরম্ভ হ'য়ে গেল।

শেখা ত শেষ হ'ল। কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ ত চাই! সুযোগের অপেক্ষায় রইলো সবাই। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সরস্বতীপূজা এলো। ঘোষেদের পোড়ো বাড়ীতে খেলা দেখাবার ব্যবস্থা হ'ল। কেদারনাথ বাড়ী নেই,—অঘোরনাথ সফরে গেছেন—বাড়ীতে আছেন মতিলাল! তিনি ত শিশুরাজ! ছেলেদের নিয়ে হৈ-চৈ করা, তাদের সুখে-দুঃখে অংশ গ্রহণ করাই ছিল তাঁর বৈচিত্র্যহীন জীবনের চরম সান্ত্বনা!

মেয়েরা মত দিয়েছেন—সবই প্রায় ঠিক—শুধু একটা ভয়, যদি অঘোরনাথ ফিরে আসেন! তাই মনে মনে জপ সুরু হ'য়ে গেছে—ঐ হুং হুং হ্রিং হ্রিং হ্রিং রক্ষ রক্ষ স্বাহা! আজ নয় হে মা কালী—কাল যেন আসে, হে মা দুর্গা!

সাজগোজ শেষ। খেলা সুরু হ'বে। পাকা রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। হায়, হায়—সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল—স্বয়ং অঘোরনাথ যে উপস্থিত!

ছেলের দল মুষ্‌ড়ে প'ড়্‌লো। মেয়েদের ক্ষোভের সীমা রইলো না। এত আয়োজন, এত উৎসাহ সবই ব্যর্থ হ'য়ে গেল!

মেয়েরা আশাবাদী। এত সহজে হাল ছাড়্‌লেন না। অঘোরনাথকে ভোজনে পরিতৃপ্ত ক'রে কেদারনাথের স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী কথাটা পাড়্‌লেন

—ছোট্ ঠাকুরপো—আজকের দিনে ছেলেরা একটু খেলাধুলো ক'রতে চাইছে—যদি তুমি মত দাও—

বিন্ধ্যবাসিনীকে অঘোরনাথ যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি ক'রতেন। কিন্তু তাঁর এই মহা অপরাধী ভাব দেখে—অঘোরনাথ জিজ্ঞাসা ক'রলেন—ব্যাপার কি?

ছেলেরা, মানে মনি-শরৎ—একটু খেলা দেখাবে ব'লে ঠিক ক'রেছে—একটু জড়তাভরা কণ্ঠে উত্তর দিলেন বিন্ধ্যবাসিনী।

খেলা? জিম্‌নাষ্টিক? কোথায় রাস্‌কেলরা?

ছেলেরা ভয়ে যে যেদিকে পারে ছুট্‌লো। বিন্ধ্যবাসিনী ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে ফিরে এলেন। কিন্তু আশা ছাড়্‌লেন না!

ক্লান্ত অঘোরনাথ শয্যা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গভীর নিদ্রামগ্ন হ'য়ে প'ড়লেন!—ঘন নাসিকা-গর্জ্জন সুরু হ'য়ে গেল—ঘোঁঘোর ঘোঁ—......

মেয়েরা ভাব্‌লেন আর ভয় কি? কর্ত্তা যখন নিদ্রিত, তখন ছেলেরা একটু খেলুক—একটু হৈ-চৈ করুক্, সেই সঙ্গে তাঁরাও একটু নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করুন!

সুরু হ'ল খেলা। প্রাণখোলা আনন্দে খেলা দেখাতে সুরু ক'রলেন মনিলাল ও শরৎচন্দ্র। তাঁরা আজ বেপরোয়া! বহুদিন পরে স্বাধীনতা পেয়েছেন—তাঁদের উৎসাহ দেখে কে?

শিশু সুরেন্দ্রনাথ অনুরোধ জানালেন—আমিও একটু দুল্‌বো শরৎ!

শরৎচন্দ্র তখন কল্পতরু। ব'ল্‌লেন—বেশ, দোল্।

লোহার মোটা রডের উপর পা দুটো তুলে সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা ক'রলেন—এবার ঘুরি?

ঘোর্?

দু'বারের পরেই চিৎ হ'য়ে নীচে প'ড়ে গেলেন সুরেন্দ্রনাথ! কোন

সাড়া নেই—শব্দ নেই। ভয়ে সবাই দিশেহারা! এখন কি হবে? কি করা যাবে?

মনি ব'ল্‌লেন—চল্, ডাক্তারের কাছে যাই—

শরৎচন্দ্রের মনে তখন ভয়ের চেয়ে অনুশোচনাই বেশী! কি ক'র্‌বেন স্থির ক'র্‌তে না পেরে—সুরেন্দ্রনাথকে জোর ক'রে খাড়া ক'রে দাঁড় করিয়ে পিঠে দুম্‌দাম দুটো কিল বসিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আট্‌কা দম—কোঁকাতে কোঁকাতে কান্নার সঙ্গে বেরিয়ে এলো! পরমুহূর্ত্তেই উঠ্‌লো আশ্বস্ত হাসির রোল!

শরৎচন্দ্র বিজ্ঞের মত জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—কিরে, তোর জ্ঞান ছিল?

সুরেন্দ্রনাথ ব'ল্‌লেন—ছিল।

কি মনে হ'চ্ছিল?

মরে যাচ্ছি।

তখন কি ক'র্‌লি?

ঐ হ্রং হ্রীং……বলার চেষ্টা ক'র্‌লুম।

আশ্বস্ত হ'য়ে শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলি!

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ১৫-১৯]

* * *

ছেলে মহলের সর্দ্দার। সুতরাং মেজাজটা ঠিক সর্দ্দারের মত হওয়াই উচিত। সাঙ্গোপাঙ্গোদের সকল সময় হাতের মুঠোর মধ্যে না রাখ্‌লে কর্ত্তৃত্ব পরিচালন কি সম্ভব কোনদিন?

অবসর সময়ে খেলাধূলার অনুমতি ছিল গাঙ্গুলীবাড়ীর সীমানার মধ্যে। সে সীমানা অতিক্রমের ইচ্ছা হয়ত ছিল সকলেরই, কিন্তু সে দুঃসাহস ছিল না কারও। তাই তারা নিঃশব্দে উঠানের মধ্যে "গাব্‌ব" খুঁড়ে মার্ব্বেল খেলার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিল। কিন্তু সর্দ্দার শরৎচন্দ্রের

গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করাই ছিল জন্মগত অধিকার। নিঃশব্দে ভীরু কাপুরুষের মত সকল কিছুর বাধা মেনে নেওয়ার মত দুর্ব্বল প্রকৃতি ছিল না তাঁর। তাই বাড়ীর কর্ত্তাদের দৃঢ় গণ্ডীকে তিনি অতিক্রম ক'রতেন খিড়কির দিকের দাঁতরাঙা গাছ বেয়ে। বাড়ীতে ঢুক্‌তেনও সেই পথে। তবে মেজাজটা তখন থাক্‌তো একান্ত উদার। বাইরে "জিৎগুল্লি" খেলে বহু জেতা-গুলি দান ক'রে দিতেন সাঙ্গোপাঙ্গোদের। কেবলমাত্র দান ক'রতেন না তাঁর প্রিয় ধপ্‌ধপে সাদা বড় গুলি "**টল**" আর ছোটগুলি "**আন্‌টা**"। কারণ ছোটটিকে ক'ড়ে আঙুলে আট্‌কে ধ'রে বড়টি পরিচালন করাই ছিল তাঁর চিরদিনের রীতি। সহজ ভাষায়—বিজয় অভিযানের মোক্ষম অস্ত্র।

তাঁর গতিবিধির সঙ্গে ছেলেদের ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। গাছটা নড়্‌লেই সকলে বুঝ্‌তে পারতেন ফিরে এসেছে শরৎ। কালমুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে সবাই ছুট্‌তো সেই গাছের দিকে। সর্দ্দারও গাছের একটা ডালে ব'সে—নির্লিপ্ত কণ্ঠে বিলিয়ে দিতেন সেদিনের সব জেতা-গুলিগুলো—নে, তোরা নে!

খুশীতে মুখর হ'য়ে উঠ্‌তো ছায়া-ঢাকা সেই স্থানটা। কিন্তু সচেতন ছিলেন সবাই। কর্ত্তাদের আগমনে বিপদের সম্ভাবনা—শাস্তিও ছিল তদোধিক কঠোর। তাই কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে শূন্য হ'য়ে প'ড়্‌তো সে স্থানটি! [শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ, পৃঃ ৬৮]

সহর থেকে গঙ্গাটা সরে গেছে মাইলখানেক পথ। মাঝখানে শুকনো একটা খাত। নাম যমুনীয়া। তাতে চানন নদীর ঘোলাটে গেরুয়া জলের ঢল নেমেছে। ও পাশের চড়ায়—ভুট্টাগাছ গজিয়েছে এক মানুষেরও ওপর। দূর থেকে হেলে দুলে কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে—ওরে, আয়—আয়···

শিশু-মন দুলে ওঠে। স্থির কি থাকা যায়?

শনিবারের বিকেল। ছুটি পাওয়া গেছে সকাল সকাল। হাতে কিছু কাজ নেই অথচ একটা কিছু না ক'র্‌লেও নয়! মনিলাল ও শরৎচন্দ্র আর নিশ্চেষ্ট থাকৃতে পার্‌লেন না। মালকোঁচা মেরে ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌লেন যমুনীয়ার সেই লাল জলে।

ক্ষেতে বসে গাছগুলোর সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে, কতককে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে, কাউকে বা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে, তাদের স্নেহ-পরশটুকু উপভোগ ক'র্‌লেন পরম নিশ্চিন্তে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফির্‌তে হবে—নইলে জানাজানি হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং ফির্‌লেন · বেলা তখন পাঁচটা!

কিন্তু ভয় যেখানে বিপদের, উৎপত্তি ত সেখানেই! সে বীরত্ব কাহিনীটি ইতিমধ্যে ছড়িয়ে প'ড়েছে সহরময়। বাড়ী ফেরার পথে কথাটা অঘোরনাথের কানে গিয়েও উঠ্‌লো। ক্রোধে সর্ব্বশরীর তাঁর রি-রি ক'র্‌তে লাগ্‌লো! এতবড় বেয়াদপ ছেলে? রোগের ভয় দূরে থাক্, ডুবে মরার সম্ভাবনাই যে সকলের চেয়ে বেশী! তিনি খড়ম-হাতে তৈরী হ'য়ে রইলেন—ছোঁড়া দুটো একটিবার বাড়ী ফির্‌লে হয়! এমন শিক্ষা দেবেন—যা' সারা জীবনেও ভুল্‌তে পার্‌বে না কোনদিন!

চুপিচুপি মামা-ভাগ্নে দাঁতরাঙা গাছের ডাল ধ'রে যেই ভেতরের বাড়ীতে পা দিয়েছেন—অমনি অঘোরনাথ লাফিয়ে পড়্‌লেন মনির ওপর। ছুটে এলেন বিন্ধ্যবাসিনী। মনিকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেও দু'চার ঘা নিঃশব্দে পিঠে তুলে নিলেন—কিন্তু শরৎচন্দ্র?

যঃ পলায়তি সঃ জীবতি! শরৎচন্দ্র একটি মুহূর্ত্তও অপব্যয় ক'র্‌লেন না - সটান চম্পট।

রবিবারেও শরৎচন্দ্রের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

সোমবার সকালে অঘোরনাথ বেরিয়ে গেলে দেখা গেল শরৎচন্দ্র গোয়ালের চালে বসে পেয়ারা খাচ্ছেন!

সবিস্ময়ে ছেলেমেয়ের দল জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—কোথায় ছিলি রে ?

নির্লিপ্ত কণ্ঠের উত্তর ভেসে এলো—গোয়াল-ঘরে।

খেতিস্‌ কি ?

তোরা যা খাস্‌ !

বলিস্‌ কি রে ? কে দিলে ?

ছোটদের প্রতি কোঁচড়্‌ থেকে দু'চারটি পেয়ারা ছুঁড়ে দিয়ে গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—ছোড়্‌দি থাক্‌তে আবার ভয় কি ?

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ, পৃঃ ৬৯-৭০]

*　　*　　*　　*

ভদ্র-ঘরের ছেলে। তায় আবার গোঁড়া গাঙুলী-বাড়ীর দৌহিত্র। লেখাপড়া না শিখ্‌লে লোকে গায়ে থুথু দিতে সুরু ক'র্‌বে। দেবানন্দপুরে থাকাকালীন সময়টা শুধু বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে, পাড়া-প্রতিবেশীর যত বদ ছেলেদের সঙ্গে মিশে হৈ-চৈ ক'রেছে—লেখাপড়া সেই যে-কে সেই। 'বোধদয়' থেকে 'চারুপাঠে'র মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারপর ডিহিরি গমন। সেখানেও সেই অবস্থা—এপাশে বয়সও ত নেহাৎ কম হ'ল না ! সমবয়সী মামারা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে চ'লেছে। অতএব যে-কোন প্রকারেই হোক্‌ পরীক্ষা ওকে দেওয়াতেই হবে।

আয়োজন চ'ল্‌লো সেইমত। দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হ'ল। অক্ষয় পণ্ডিতমশাইকে নিযুক্ত করা হ'ল মনিলাল ও শরৎচন্দ্রকে পড়ানোর জন্যে।

যথারীতি স্কুল যাওয়া—তার উপর গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশুনা—খেলাধূলার সময়ের একান্ত অভাব দেখা দিল। সুতরাং শরৎচন্দ্র ছেলেদের দলে টেনে নিলেন দু'চার দিনের মধ্যে। বুঝিয়ে দিলেন—যারা বোকা-ছেলে তারাই বইয়ের পোকা হ'য়ে মরে। আর যারা বুদ্ধিমান, তারা যেমন

ফাঁকি দেয়, তেমনি খেলাধূলা ক'রে কাটায় সময়! মানে, শরীরের জন্যে চাই খেলাধূলা—পড়ার জন্যে চাই মন! আর সেই মনের জন্ম হ'লো ওই খেলাধূলার আবর্তে।

ছেলেরা খুশী হ'ল! তারাও ত তাই চায়! কিন্তু বাড়ীতে মা-বাবা বা দাদা-কাকার যে লৌহাবেষ্টনী! মুক্তি তাদের আস্‌বে কেমন করে! উৎসুক-ভরা কণ্ঠে সুধালো—খেলাধূলার সময় পাবো কেমন করে?

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে কয়েক সেকেণ্ড চুপ্‌ ক'রে থেকে ব'ল্‌লেন,—তোমরা অমনি বুঝি ভাবতে সুরু ক'রেছো—খেলাধূলা মানে স্কুল-কামাই?

তা ছাড়া আর কি! কণ্ঠে তাদের বিস্ময়ের সুর।

যেমন তোমরা বোকা!—অবজ্ঞার একটু হাসি হেসে ব'ল্‌লেন—আরে ঘড়িটা একটু ফাষ্ট ক'রে দিলেই ত পাট্‌ চুকে যায়!

সে কেমন ক'রে সম্ভব? অধিকতর বিস্ময়ে ফেটে প'ড়্‌লো তারা।

বুদ্ধি একটু খরচ করো! চোখে-মুখে দুষ্টুমাখা হাসি।

হতবাক হ'য়ে মাথা চুল্‌কোতে লাগ্‌লো সবাই।

শরৎচন্দ্র একটু ভারীকে কণ্ঠে ব'ল্‌লেন—আরে পণ্ডিতমশাইরা যখন তামাক খেতে যাবেন—সেই ফাঁকে ঘড়ির কাঁটা একটু এগিয়ে দিলেই পাট্‌ চুকে যায়—

ধরা প'ড়্‌বে না? তাছাড়া মই পাবে কোথায়?

মই কি হবে? একজনের পিঠে একজন চাপ্‌লেই ঘড়িতে হাত পৌঁছে যাবে—তারপর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড—

খুশীতে সবাই মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো। ঠিক্‌ বলেছিস শরৎ!…

কাজ সুরু হ'য়ে গেল। ছেলেদের আনন্দের সীমা নেই! কিন্তু বিপদে প'ড়্‌লেন পণ্ডিতমশাইয়ের দল। বাড়ী পৌঁছে দেখেন তখনও চারটে বাজতে অনেক দেরী!

সেক্রেটারী, হেড পণ্ডিতমশায়ের কাছে কৈফিয়ৎ তলব ক'রলেন। শিক্ষকেরদল গালে হাত দিয়ে ভাব্‌তে সুরু ক'র্‌লেন—কিন্তু সঠিক কোন কারণ ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! ঠিক সময়ে স্কুল বসে—ঘড়িও তখন ঠিক থাকে, অথচ মাঝের এই সময়টুকুর মধ্যে ঘড়িই বা এত ফাষ্ট হ'য়ে যায় কেমন ক'রে?

একদিন নয়, দু'দিন নয়—এ ঘটনা চ'ল্‌লো মাস দুই তিন। শিক্ষকরাও বিভ্রান্ত হ'য়ে প'ড়্‌লেন। অবশেষে, কারণ নির্ণয়ের ভার প'ড়্‌লো অক্ষয়-পণ্ডিতের ওপর।

পণ্ডিতমশাই গোপনে জানলার পিছু চুপ ক'রে বসে থাকেন আর মাঝে মাঝে তামাক খেতে ছুটেন—কারণও ধরা পড়ে না, লাঞ্ছনারও শেষ থাকে না—রীতিমত ভৌতিক ব্যাপার ঘটছে বলা চলে!

একদিন ক্লাস থেকে বেরিয়ে সোজা তামাক খেতে না গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়াবামাত্র পণ্ডিতমশাই দেখ্‌তে পেলেন—যোগীনের কাঁধে বসে মোহন ঘড়ির বড় কাঁটাটা এগিয়ে দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতমশাই গর্জ্জে উঠ্‌লেন—তবে রে ছুঁচো পাজির দল—

ছেলেরাও এক নিমিষে বই-খাতা নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় লাভের আশায় দিল ছুট্—

পরক্ষণে হন্তদন্ত হ'য়ে পণ্ডিতমশাই বেত হাতে ক্লাসে ঢুক্‌লেন। ক্লাস ফাঁকা—কেবলমাত্র ব'সে আছেন শরৎচন্দ্র। পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে ডুবে গেছেন একেবারে।

পণ্ডিতমশাই বেতটা শূন্যে বার দুই ঘুরিয়ে তর্জ্জন গর্জ্জন সুরু ক'র্‌লেন—পাজি ছুঁচো কোথাকার—

শরৎচন্দ্র অভিনয়ে কোতাহুরন্ত। হঠাৎ চম্‌কে ওঠার ভাণে ব'ল্‌লেন—কি হ'য়েছে পণ্ডিতমশাই?

জানো না? ঘড়ি ফাষ্ট ক'র্‌ছিল কে? ক্রোধে কাঁপ্‌ছেন পণ্ডিত-মশাই।

কিছু ত জানি না! একান্ত বিনয়ী নম্র ছেলের অভিনয়! আমি অঙ্ক কষ্‌ছিলুম—আপনার পা ছুঁয়ে ব'ল্‌ছি—কিচ্ছু জানিনে!

মুখের সেই ভঙ্গি দেখে অবিশ্বাস করে কার সাধ্য! পণ্ডিতমশাই ভেবে নিলেন সত্যই নিরপরাধী এই বালকটি! হেড্‌পণ্ডিত অম্বিকাচরণও ছুটে এসেছিলেন। ছেলেটির মুখের গোবেচারী ভাব দেখে, ক্লাসের মধ্যে তাঁকেই সেরা ছেলে স্থির ক'রে নিলেন। শুধু তাই নয়, গুড্ কন্‌ডাক্ট প্রাইজ দেওয়ার ব্যবস্থাও হ'ল সেই সঙ্গে।······

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ৭৩-৭৪]

* * *

ছুটির দিন সকালে রোয়াকের ওপর মাদুর পেতে ছেলের দল সুর ক'রে দুলে দুলে প'ড়্‌ছে প্যারিচরণ সরকারের 'ফার্ষ্ট বুক'। বি এল্ এ—ব্লে; কেউ বা পি এস্ এ এল্ এম্—"পাস্‌লাম" প'ড়্‌ছে।

স্বভাব-গম্ভীর মেজদা'; বইয়ের পাতা উল্‌টে দেখ্‌লেন না, বা পুনরায় বানান শোনার প্রয়োজন বোধ ক'র্‌লেন না। ভেবে নিলেন "পাস্‌লাম" কথাটার চেয়ে 'পিস্‌লুম' কথাটাই শ্রুতিমধুর, সুতরাং পিস্‌লুম বলাই বাঞ্ছনীয়। পাশের ছোট ছেলেটির কানমুলে দিয়ে ব'ল্‌লেন পাস্‌লাম কিরে? বল, পিস্‌লুম! পরীক্ষার সময় ছাড়া গৃহশিক্ষক থাকে না—বড়োরাই কাজ চালিয়ে দেন,—সেটাই এ বাড়ীর নিয়ম। সুতরাং ছেলেটিও চীৎকার সুরু ক'র্‌লো—পি এস এ এল এম—পিস্‌লুম—পিস্‌লুম—

চণ্ডীমণ্ডপের সাম্‌নে বসে আছেন কেদারনাথ। সাম্‌নে হাতবাক্স, ও হিসাবের খাতা। পাশে ভট্টাচার্য্যমশাই তামাক খাচ্ছেন। স্নানের

পথে বৈকুণ্ঠমামা তেল মাথ্‌ছেন আর গল্প ক'র্‌ছেন—হঠাৎ কেদারনাথের কানে গিয়ে ভাস্‌লো—পিস্‌লুম।

তিনি সচকিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, পিস্‌লুম কিরে? বল, "সাম্‌"!

ভুল ধরা প'ড়লো, হাসির রোলও উঠ্‌লো—কিন্তু মেজদা' ধমক দিলেন হাস্‌ছিস্‌ যে বড়ো? পড়েছিস্‌ পূরোণো পড়াগুলো?

চকিতে হাসি মিলিয়ে গেল। ভয়ে প্রাণ দুর্‌ দুর্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। কেউ-বা জপ আরম্ভ ক'রে দিল—ঐ ইং হ্রিং হ্রিং……

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ৭৫-৭৬]

* * * *

চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে বিছানায় ধপ্‌ধপে সাদা চাদর পাতা। সপ্তাহ-খানেকের শতছিন্ন ও দীর্ণ 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা। পিল্‌সুজের উপর চল্‌ চল্‌ ক'রছে এক প্রদীপ তেল। দুটো সল্‌তে জ্বল্‌ছে একসঙ্গে। ছেলেরা প'ড়্‌ছে দুলে দুলে।

বারান্দায় নেয়ারের খাটে শুয়ে উৎকর্ণ হ'য়ে র'য়েছেন কেদারনাথ। পুরোনো পড়া ছেলেরা প'ড়্‌তেই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—তোদের বুঝি নোতুন পড়া দেয়নি?

ছেলের দল উত্তর দিল—না।

কেন?

পণ্ডিতমশাই স্কুলে আসেননি! জ্বর হ'য়েছে—

পণ্ডিতম'শায়ের জ্বর? কথাটা পুনরাবৃত্তি ক'রে খাড়া হ'য়ে উঠে বস্‌লেন কেদারনাথ। মুশাইকে ডেকে বাতি জ্বালালেন। তারপর বেরিয়ে প'ড়্‌লেন—কারণ, তিনি যে তখন বাঙালী সমাজের সমাজপতি, স্কুলের সেক্রেটারী, কর্তব্যবোধও ত একটা থাকা উচিত!

কেদারনাথ বেরিয়ে গেলেন—ছেলেদের আনন্দ দেখে কে? বড়্‌দা বাড়ীতে নেই—মেজ্‌দা অন্য কাজে ব্যস্ত—এখন বাড়ীর কর্ত্তা ত তারাই!

শরৎচন্দ্র ইংরিজি কপ চাতে স্বরু ক'র্‌লেন—

ক্যাট ইজ আউট

লেট মাইস্ প্লে······

মুক্তির আনন্দ তখন দু'কূল উপ্‌ছে উঠেছে। দুঃসাহসের খরস্রোত—দিগ্‌বিদিক শূন্য হ'য়ে ছুটে চ'লেছে—সম্মুখের সমস্ত বাধা ও নিষেধের গণ্ডী তলিয়ে গেছে অতল তলে:

ছেলের দল স্বরু ক'রে দিল—

ডান্স লিট্‌ল বেবি, ডান্স আপ হাই—
নেভার মাইণ্ড, বেবি— মাদার ইজ নাই।
ক্রো এণ্ড কেপার—কেপার এণ্ড ক্রো
দেয়ার লিট্‌ল বেবি, দেয়ার ইউ গো—
আপ টু দি সিলিং,—ডাউন্ টু দি গ্রাউণ্ড
ব্যাক্‌ওয়ার্ডস্ এণ্ড ফরওয়ার্ডস্
রাউণ্ড এণ্ড রাউণ্ড।
ডান্স লিট্‌ল বেবি, এণ্ড মাদার উইল সিং,
মোরলি মোরলি ডিং ডিং ডিং······।

শরৎচন্দ্র হিন্দি অনুবাদ স্বরু করে দিলেন—

খুশীসে খুশীসে—তাক্ ধিন্ ধিন্······

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ৭৭-৭৮]

* * * *

শেষ বর্ষার সন্ধ্যা। বৃষ্টি কখনও নবযৌবনা নারীর মত মুখর হ'য়ে উঠ্‌ছে ঝম্ ঝম্—আবার কখনও গুরুগম্ভীর থম্‌থমে ভাব—রুদ্ধ গুমোট আবহাওয়া! ছেলের দল পাঠ অভ্যাস ক'রে চ'লেছে নিয়া

কেদারনাথ তাঁর নির্দ্দিষ্ট খাটে ক্লান্ত শরীরে একটু তন্দ্রামগ্ন হ'য়ে প'ড়েছেন—গোরা সিং তার সাধের দড়ির খাটিয়া পেতে ছোট একটি প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে সুর ক'রে তুলসীদাস প'ড়ে চ'লেছে।

হঠাৎ একটা চামচিকে এসে ছেলেদের মাথার ওপর উড়্‌তে সুরু ক'র্‌লো। জন্মগত সংস্কার—"চাম্‌চিকে যার গায়ে ব'সবে—সে চাম্‌চিকের মত রুগ্ন হ'য়ে যাবে,"—সুতরাং একপাশে ভয়—অন্যপাশে অস্বস্তি। মনিলাল ও শরৎচন্দ্র কর্ম্মমুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন।

দেবিন সাম্‌নে বই খুলে—লম্বা হ'য়ে শুয়ে—গালের উপর হাত রেখে—মনোযোগ সহকারে পড়ার অভিনয়ে সম্পূর্ণ নিদ্রিত।

এপাশে দু'জনে দুটো সুন্দর ক'রে ছোলা বাখারি নিয়ে ঘোরাতে সুরু ক'র্‌লেন। চাম্‌চিকেটা জান্‌লা দিয়ে পালালো—কিন্তু পায়ে লেগে প্রদীপটা গেল উল্‌টে! আলো নিভ্‌লো—ফর্‌সা চাদরখানা রেড়ির তেলে ভিজে গেল—অপরাধটা অমার্জ্জনীয়।

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। দু'জনে ভেতর ঘরে আত্মগোপন ক'র্‌লেন—বেচারা দেবিন ঘুমোতে লাগ্‌লেন তেমনিভাবে।

কেদারনাথের তন্দ্রার আমেজ টুটে গেল কয়েক মিনিট পরে। দেখ্‌লেন, ঘর অন্ধকার—ছেলেরা কেউ পড়ার ঘরে নেই। ডাক দিলেন, মুশাই—

জী—

বাত্তি কেঁও বুৎ গিয়া?

মুশাই ঘরে ঢুকে দেশলাই জ্বাল্‌লো। দেখ্‌লো: অবস্থা যেরূপ ভয়াবহ তেমনি করুন। মনি-শরৎ নেই—দেবিন ঘুমে কাতর। ব'ল্‌লো, মনি-শরৎ থানে গিয়া—দেবিন বাত্তি গিরায় দিয়া—

কেদারনাথ সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলেন। দেবিনের কান ধ'রে জাগিয়ে তুললেন। আদেশ দিলেন, লে যাও আস্তাবল মে।

শরৎ-মনি তখন আহারে ব'সেছেন—আর বেচারী দেবিন আস্তাবলের অন্ধকারে ব'সে ঘোড়ার চিঁ-হিঁহিঁ রব, পা ঠোকার ঠক্ঠক্-খট্‌খট্ শব্দ শোনেন—আর চোখের জলে ভাসেন !...

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ১৮-১৯]

* * * *

পাণ্ডারা সকল সময়েই সরে পড়ে, ধরা প'ড়ে যায় গোবেচারা ! দলের মধ্যে দেবিনই পড়েন ধরা—ভাগ্যে শাস্তিও জুটে সেইরূপে। সেদিন গঙ্গাতে স্নান ক'র্‌তে গিয়ে বাড়ীর ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল ঠাকুরদাসের কাছে উত্তম-মধ্যম ত খেলেনই, উপরন্তু পাওনা জুট্‌লো অন্ধকারাচ্ছন্ন কুঠরী ঘরের মধ্যে তালাবদ্ধ অবস্থায় সারাদিন অনাহার ও বন্দী-জীবন যাপন।

দেবিনের অবস্থা দেখে ছেলের দল একটু মন-মরা হ'য়ে প'ড়্‌লো। কেবল শিশুরাজ মতিলাল টোকা মেরে জান্‌লা খুলে একছড়া কলা দিয়ে ব'ল্‌লেন, "খেয়ে, খোসাগুলো এখানেই রাখ্—আমি ফেলে দেবো।"

সারাদিনের পর দেবিন মুক্তি পেলেন। দেবিনকে ঘিরে ছোটদের বৈঠক ব'স্‌লো কিন্তু বড়্‌দা ঠাকুরদাস, আর মেজ্‌দা বিপ্রদাসের বিরুদ্ধে কোন কিছু করা সম্ভবপর হ'ল না। কারণ তাঁরা এখন অনেক বড়,—শুধু কি তাই তাঁরাই তো ভবিষ্যতের অভিভাবক !....

রাত্রে যথারীতি পড়াশুনা শেষ হ'ল,—তবে একটু আগেই ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। কারণ ছোটছেলে, সারাদিন না খেয়ে আছে, বাড়ীর কর্ত্তারাও একটু লজ্জিত হ'য়ে প'ড়েছিলেন।

খাওয়া শেষ হ'লে পর কুসুমকামিনী দেবীর ঘরে ছোটদের আসর ব'স্‌লো ! তখন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পাঠে ব্যস্ত। ছোটরা ধ'র্‌লো আমাদের একটা গল্প ব'ল্‌তে হবে !

এই ত প'ড়ছি—শোন না! সস্নেহে উত্তর দিলেন কুসুমকামিনী দেবী।

না! ছেলেরা জিদ ধ'র্‌লো।

তবে?

একজন ব'ল্‌লো, ভুতের গল্প! অপরে বাধা দিয়ে ব'ল্‌লো—না—পক্ষীরাজের গল্প! আর একজন ব'ল্‌লো, যক্ষের গল্প!

কুসুমকামিনী দেবী ব'ল্‌লেন—তোরা যখন সকলে একমত হ'তে পার্‌লি না—তখন সকাল সকাল সব ঘুমিয়ে পড়্‌গে যা!

শরৎচন্দ্র এতক্ষণ নীরব ছিলেন। ব'ল্‌লেন, ছোড়দি একটি সত্যি ঘটনা বলো না!—যা আমরা কোনদিন শুনিনি!

ঠিক সেই সময়েই বিপ্রদাসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি সচকিত হ'য়ে আপন মনে মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—তবে শোন:

শ্রাবণের সন্ধ্যা। সারাদিনই ঝির্ ঝির্ ক'রে বৃষ্টি প'ড়্‌ছে। শেষ আর নেই। সকাল সকাল খেয়ে বৈঠকখানার ঢালা বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালিয়ে ছেলের দল পড়াশুনা ক'র্‌ছে।

বাড়ীর বড়কর্ত্তা ক্যাম্বিসের খাটের ওপর শুয়ে তন্দ্রার আমেজটুকু উপভোগ ক'র্‌ছেন। পেয়াদা গোরী সিং তুলসীদাসের রামায়ণ সুর ক'রে প'ড়্‌ছে। ভেতরে মেজ্‌দার (বিপ্রদাসবাবু) কড়া শাসনের মধ্যে পড়াশুনা চ'ল্‌ছে, তখন তোরা অনেকেই খুব ছোট। হঠাৎ ঘরের পিছন থেকে একটা "ফোঁস" শব্দ ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গে মেজ্‌দার গগনভেদী চীৎকার—বাবারে—মা'রে—খেয়ে ফেল্‌লেরে।

পায়ে লেগে সেজ্‌টা উল্‌টে বাতিটা নিভে গেল। বাড়ীশুদ্ধ লোক সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। ব্যাপার কি?

অনুসন্ধান সুরু হ'ল। দেখা গেল—ঘরের পিছনে কা'দের একটা ষাঁড় শুয়ে আছে। বোধ হয় খুব বেশী খেয়েছিল—বার বার ফোঁস্

ফোঁস্ ক'রে দীর্ঘশ্বাস ছাড়্ছে! মেজ্দা সাপ ভেবে আঁৎকে উঠেছেন।...

এই গোপন খবর পেয়ে ছেলেদলের খুশীর অন্ত নেই। হাসি তাদের আর থাম্তে চায় না। কুসুমকামিনী কাজ উপলক্ষ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন পরমুহূর্ত্তে।

শরৎচন্দ্র গায়ে চাদরটা ভাল ক'রে মুড়ি দিয়ে, ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'ল্লেন, দেখ্লি ত সাহসের বহর। উনিই আবার আমাদের শাসন করেন!

পাশ থেকে একজন ব'লে উঠ্লো—বারে বারে ফেল ক'রে, তবুও কি লজ্জা আছে? যত ঝাল্ ঝাড়্বে আমাদের ওপরে—

মনে পড়ে গেল সেদিন দেবিনের সন্ধ্যাবেলার কথা! তার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিল—হাসির ফোয়ারা ছুটলো—হা-হা-হা—হি-হি-হি-হি...

[শরৎ-পরিচয়, সু. না গ., পৃঃ ৩৬-৩৭]

*　　*　　*　　*

সকাল বেলা মেঘের গর্জ্জন—দুপুরে দু'পশলা বৃষ্টি—সন্ধ্যায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া—শুধু তাই নয়, আকাশে মায়াবী চাঁদের জ্যোৎস্না। মাঝে মাঝে টুক্রো কালো মেঘের পরশ। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল সেদিন সন্ধ্যার সেই মোহিনীমোহন রূপ।

বর্ষার কূলে ভরা গঙ্গা,—মাণিক সরকারের শিবের মন্দিরে সন্ধ্যারতি। দূরে রাজুর আমবাগানে (রামবাবুর বাগান নামে পরিচিত) রাজুর বাঁশীর করুন ধ্বনি—মনটা সকলেরই উতলা—

এমন সময় খবর এলো—শরৎচন্দ্রকে সাপে কাম্ড়েছে! ছেলেদের চোখে জল, বয়স্কদের মুখে গভীর কালোছায়া—কি হবে কে জানে? বাইরে লোকে লোকারণ্য—

উঠানে বসে শরৎচন্দ্র, পাশে কেদারনাথ—তাঁরই পাশে বিষণ্ণ-বদনে দাঁড়িয়ে মতিলাল। ভুবনমোহিনী মেয়েদের পাশে ব'সে কাঁদ্‌ছেন—ওগো বাবা গো···কি হবে গো···কালে যে কামড়ালো ছেলেটাকে··· মা মনসা—দোহাই মা আমার—এই খুদ-কুঁড়োকে ফিরিয়ে দাও মা! তোমার ষোড়শোপচারে পূজো দেবো মা—

মেয়েরা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা ক'র্‌ছেন—একটু চুপ ক'রো না—তোমার কান্না দেখ্‌লে যে ছেলেটাও মুষ্‌ড়ে প'ড়্‌বে!

তাঁরই পাশে কাঁচুমাচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে মনিলাল—তিনিই এ কাল-দৃশ্যের একমাত্র সাক্ষী!

কেদারনাথ হরিণের শিংএর বাঁটের চক্‌চকে ছুরিখানা দিয়ে ক্ষতস্থানটা ভাল ক'রে চিরে দিলেন। রক্ত খানিকটা বেরিয়ে গেল। বাঁধন দেওয়া হ'য়েছে, পায়ের গুছি থেকে উরু পর্য্যন্ত।

একজন সহসা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—সাপ দেখেছিলি?

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন—হুঁ!

কোথায় ছিল?

খাপ্‌রার তলায়—না জেনে পা দিতেই চক্কোর তুলে ছুব্‌লে দিলে।

তারপর কি ক'র্‌লি?

মনিমামা পৈতে বেঁধে দিলে।

কেদারনাথ শরৎচন্দ্রের হাতে একটু নুন তুলে দিয়ে ব'ল্‌লেন—দেখ্‌তো খেয়ে!

শরৎচন্দ্র মুখ বিকৃত ক'র্‌লেন—চিনি!

আবার দেখ্‌তো—

এবার আর মুখ বিকৃত নয়—ব'ল্‌লেন, নুন!

ঠিক সেই সময়েই রাজু এসে উপস্থিত। হাতে প্রিয় সেই বাঁশী। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—কি হ'য়েছে? শরৎ কোথায়? দাঁড়াবার সময়

নেই—কারও কথায় কান দেওয়ার অবসর তার নেই। যেমন ঝড়ের মত এসেছিল তেমনি ঝড়ের মত প্রশ্ন তুল্‌লো—মায়াগঞ্জে খুব ভাল রোজা আছে- নিয়ে আস্‌বো ডেকে?—

মতিলাল এতক্ষণে যেন কূল খুঁজে পেলেন। ব'ল্‌লেন—যাও তো লক্ষ্মীটি! কিন্তু কিসে যাবে?

আমার ডিঙি আছে—যাবার সময় স্রোত পাবো—আসার সময় পাল—

রাজু দাঁড়ালো না—বেরিয়ে গেল ঝোড়ো হাওয়ার মত!

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ৮৮-৮৯]

* * * *

রবিবার ছুটির দিন। পড়াশুনার চেয়ে খেলাধূলাই চলে বেশী। বাড়ীর কর্তারাও থাকেন একটু উদাসীন। নিয়মের কঠোর বাঁধনে নামে কিঞ্চিৎ শিথিলতার ছায়া। এটুকুই আনন্দ—এটুকুই মুক্তির আস্বাদ। এরই সাধনায় কাটে সারাটি সপ্তাহ!

এ হেন ছুটির দিনে শরৎচন্দ্র সকাল থেকে কোথায় যে উধাও হন, তার সঠিক সন্ধান ক'র্‌তে পারেন না অনুচরবৃন্দ!

অনুনয়-বিনয় চ'ল্‌লো প্রথমে, তারপর এলো অনুরোধের পালা। তবুও দলের নেতা অচল অটল। বাধ্য হ'য়েই চেলাচামুণ্ডার দলকে নিরস্ত হ'তে হ'ল।

সেদিনটা বোধ হয় মেজাজটা একটু সরিফ ছিল। সহসা সুরেন্দ্রনাথকে ব'ল্‌লেন- তোকে একটা জিনিষ দেখাবো চল! কয়েক পা এগিয়েই থম্‌কে দাঁড়ালেন। ব'ল্‌লেন—নাঃ, তুমি ফাঁস ক'রে দেবে, দরকার নেই দেখিয়ে।

সুরেন্দ্রনাথ আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা ক'র্‌লেন—না, কখনও না! মাইরী কালীর দিব্যি ব'ল্‌ছি—

ঠিক্ ত ?

আচ্ছা সুর্য্যিমামা—গঙ্গা আর হিমালয় সাক্ষী—তোমাকে ছুঁয়ে ব'ল্‌ছি!

তা হ'লে চল্—

কিছুদূর এগিয়ে ঘোষেদের পোড়ো বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। উত্তরদিকে গঙ্গার ঠিক পাড়ের উপরেই নিম আর দাঁতরাঙা গাছের ঘন জঙ্গল। সেখানে মানুষ কেন গরু-ছাগলও ঢুক্‌তে সাহসী হয় না। গুলঞ্চের ল', কাঁটালতার বন দু'হাতে সরিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চ'ল্‌লেন শরৎচন্দ্র। পিছু পিছু চ'লেছেন সুরেন্দ্রনাথ। মনে তাঁর গভীর শঙ্কা—যদি সাপে তাড়া করে ?

শেষে এক কল্পলোকে এসে পৌঁছ্‌লেন দুজনে। কচি সবুজ পাতা। স্নিগ্ধ মলয় পবন। সূর্য্যের মৃদুলঘু পরশ—গঙ্গার কুলুকুলুধ্বনি—মনকে স্বপ্নপুরীতে টেনে নিয়ে যায়—চোখের পাতা অপলক হ'য়ে ওঠে। অন্তরটা নিজের অজ্ঞাতে ফুকারে ওঠে—আহা, কি সুন্দর!—সাম্‌নে ধু ধু ক'র্‌ছে চর—ওপারে সবুজের কোলে হিমালয়ের অস্পষ্ট চূড়া—

মাঝে বড় একটি ঝামা—শরৎচন্দ্র সেখানে লাফিয়ে উঠে বসার আসন ক'রে নিয়ে ব'ল্‌লেন—এটি আমার তপোবন! এখানে আমি সাধনা করি!

সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—এখানে বসে বুঝি ঠাকুরের নাম জপ করো ?

দূর পাগলা! এখানে ব'সে আমি প্রকৃতির দৃশ্য দেখি! দেখ্‌ছিস্ না—কেমন ঝামাটাকে কেন্দ্র ক'রে খরস্রোত ব'য়ে চ'লেছে! ও-পাশে চর, হিমালয় আর তার চূড়া—পিছনে লতার কুঞ্জ, আব্‌ছা রোদের ছায়া—আর গঙ্গার কলনিনাদ—মনটা থেই হারিলে ফেলে, আর আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি—আর দেখি, তবুও পুরানো হয় না—

পুনরায় লাফিয়ে ঝোপের পাশে ফিরে এলেন। ব'ল্‌লেন—ভারি

সুন্দর, না?

সুরেন্দ্রনাথ ব'ল্‌লেন—হ্যাঁ!

শরৎচন্দ্র সাবধান ক'রে দিলেন—কিন্তু খুব সাবধান!

কেন? ভুত আছে বুঝি?

না বড় বড় সাপ আছে!

তোমার ভয় করে না?

অবজ্ঞার সুরে ব'ল্‌লেন শরৎচন্দ্র—ওরা আমার পোষ মেনে গেছে।

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ২৪]

*　　　*　　　*

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ ক'রে শরৎচন্দ্র সর্ব্ব-বিদ্যাবিশারদ হ'য়ে উঠ্‌লেন। ইংরিজী স্কুলের তুচ্ছ "রয়েল-রিডার" দু'নম্বর ছাড়া তাঁর পাঠ্য-পুস্তক ব'লে আর কিছু রইলো না। তখন সেদিনের সেই বেকার অবস্থায় "হরিদাসের গুপ্তকথা" ও "ভবানীপাঠক" এই দু'টি হ'ল সম্বল! [এগুলি মতিলালেরই সংগ্রহ। তিনি নিজে প'ড়্‌তেন এবং কুসুমকামিনী দেবীকে প'ড়্‌তে দিতেন।] অবশ্য চুরি ক'রেই গলাধঃকরণ ক'র্‌তেন নীরবে এবং একান্ত গোপনে।

ফল এর অবশ্য ভালই হ'য়েছিল। বছরের শেষে ফার্ষ্ট হ'য়ে ডবল্‌ প্রমোশন পেলেন। চেলা-চামুণ্ডের দল উৎসাহিত হ'ল। বন্ধুরা সম্‌ঝে চ'ল্‌তে সুরু ক'র্‌লেন—বড়োরাও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হ'য়ে উঠ্‌লেন।...

[শরৎ-পরিচয়, সু. না গ., পৃঃ ২০]

*　　　*　　　*

খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মধ্যেই পড়াশুনা যখন অগ্রসর হ'চ্ছিল, ঠিক তখনই গাঙ্গুলী-বাড়ীতে একটা অঘটন ঘ'টে গেল। হালিসহর থেকে

ভাগলপুরে ফেরার পথে বাঙালীটোলার মোড়ে, মেয়ে-বোঝাই ঘোড়ার গাড়ীটা উলটে নালার মধ্যে প'ড়ে গেল। আঘাত সকলেই কিছু না কিছু পেলেন, কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী আঘাত পেলেন বিন্ধ্যবাসিনী। বহু চিকিৎসার পরও কিছুতেই যখন তিনি আরোগ্য লাভ ক'র্‌তে পার্‌লেন না, তখন ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন—ক'লকাতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ছাড়া গত্যন্তর দেখা যাচ্ছে না! বিরাট একটা খর্‌চা চাপ্‌লো কেদারনাথের ওপর। ও-পাশে অমরনাথের মেয়ে সুরবালার বিয়ের ব্যবস্থা না ক'র্‌লেও নয়! অবস্থাগতিকে ব্যবস্থা ক'রতে হ'ল কেদারনাথকে। নিজে কিছুদিনের জন্য হালিসহরে রওনা হ'লেন বসবাসের উদ্দেশ্যে। আর মতিলালকে সপরিবারে কিছুদিন দেবানন্দপুরে বসবাসের আদেশ দেওয়া হ'ল।

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ৯৫-৯৬]

*　　　*　　　*

দেবানন্দপুরে ফিরেই শরৎচন্দ্র হুগলী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হ'লেন বটে, কিন্তু সংসারের অবস্থা তখন সম্পূর্ণ অচল। ভুবনমোহিনী দেবীর অলঙ্কার বিক্রী ক'রে দিন চলে কোনরূপে। দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়ার সময় ছাড়া মতিলাল সকল সময়ে ঘরছাড়া—কাজের সন্ধানে ব্যস্ত।

নিয়মিত স্কুলের মাইনে যোগানো প্রায় অসম্ভব। লজ্জায় শরৎচন্দ্র স্কুল-পলাতক। সহপাঠীও সে-সময়ে জুট্‌লো সেইমত।

বামুনের ঘরের ছেলে—নিয়ম ত রক্ষা ক'র্‌তেই হবে! সুতরাং অনাড়ম্বরে পৈতে হ'য়ে গেল। সেই সুবাদে প্রাপ্তিযোগ ঘট্‌লো লাল একটি ছাতা। স্কুল যাওয়ার পথে ট্রেণ আস্‌তে দেখলেই সেই লাল ছাতা দেখিয়ে গাড়ী থামানোর প্রচেষ্টা চ'ল্‌তে লাগ্‌লো।

কোন গাড়ী থামে, কেউ বা ভ্রুক্ষেপও করে না। গড়্‌গড়িয়ে চলে যায় গন্তব্য স্থলে। যাত্রীরা হাসে—ছেলের দলও বন্য আনন্দ উপভোগ করে, আর যে গাড়ী থামে, তার খালাসীরা বেয়াকুব ব'নে যায়। ক্রোধে ফুল্‌তে থাকে। ঘন ঘন কয়লা ছুঁড়ে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে। তখন সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে শরৎচন্দ্র পাশের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করেন। এ-খেলা চ'ল্‌লো কিছুদিন।

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ৯৮]

* * *

এপাশে সংসারের অবস্থা অধিকতর সঙ্গীন হ'য়ে উঠ্‌লো। ভুবন-মোহিনীর সমস্ত অলঙ্কার একের পর এক উত্তমর্ণের ঘরে আশ্রয় লাভ ক'র্‌লো। এমন কি বাস্তু ভিটেটুকুও বন্ধক প'ড়্‌লো শেষ পর্য্যন্ত।

শরৎচন্দ্রের পড়াশুনাও একরূপ বন্ধ হ'য়ে গেল। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে, হৈ-চৈ ক'রে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন। মুন্সীবাবুদের তেতুয়া পুকুরের পাড়ে একটি কুঁড়েঘর তৈরী ক'রে অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা ক'র্‌লেন। সেখানে গ্রামের বাগান থেকে ভাল ভাল আম, কাঁঠাল লিচু, আনারস ও কলা সংগ্রহ ক'রে ভুরিভোজন চালাতে লাগ্‌লেন। কখনও-বা গরীব প্রতিবেশীদের ঘরে বিতরণও ক'রে এলেন। তামাক খেয়ে ঝিমানো মেজাজটাকে শানিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা ক'র্‌লেন সেই সঙ্গে। সে বিলাস কেন্দ্রের সঙ্গী হ'লেন কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশ ভট্টাচার্য্য, বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপেন ঘোষ। এঁরা যেমন দুঃসাহী, তেমনি বেপরোয়া। প্রয়োজন বোধে, পূর্ব্বে জানিয়ে প্রতিপক্ষের ফসল লুণ্ঠন ক'র্‌তে এতটুকুও দ্বিধা বোধ ক'র্‌তেন না বরং মনে-প্রাণে গর্ব্ব অনুভব ক'র্‌তেন।

তখন শরৎচন্দ্রের মাথায় ঝাঁক্ড়া চুল, সঙ্গে একখানা দোধারি ছুরি। দলে পরিচালক হ'লেন তিনি নিজেই !

[বাতায়ন, শরৎ স্মৃতিসংখ্যা—পৌষ ১৩৪৫]

* * * *

শরৎচন্দ্র এ বয়সে দাবা খেল্‌তে শিখেছিলেন। সঙ্গী ছিল মুন্সীবাড়ীর ছেলে সদানন্দ। সদানন্দ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মেলামেশা করুক, অভিভাবকগণ এটি মোটেই পছন্দ ক'র্‌তেন না। ফলে, দিনের-বেলা তাঁদের মেলামেশা প্রায় বন্ধ হ'য়ে গেল। অথচ একদিন না খেল্‌লে উভয়েরই মেজাজ যায় বিগ্‌ড়ে, কাজে ব'সে না মন—ভুল হয় প্রতি পদে। সুতরাং স্থির হ'ল সন্ধ্যার পর যখন কর্ত্তারা আমোদ-প্রমোদে ও গল্প-গুজবে উঠ্‌বেন মেতে, সেই সময়ে দু'জনে দু-দান খেলে নেবেন পরম নিশ্চিন্তে। কিন্তু সদরদরজা দিয়ে রাস্তা চলা যে প্রায় বন্ধ ! তাহ'লে এখন উপায় ?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—কুচ্‌পরোয়া নেই ! তোদের বাড়ীর পিছন দিকে যে গাছটা হেলে ছাদে গিয়ে ঠেকেছে, আমি সেই গাছ বেয়ে উপরে উঠে যাবো। তুই মইটা ঠিক্ ক'রে লাগিয়ে রাখিস্ !

সদানন্দ সভয়ে ব'ল্‌লেন—অন্ধকারে গাছ বেয়ে আস্‌বি—যদি প'ড়ে যাস্ ?

শরৎচন্দ্র অভয়-হাসি হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—জানি একটু এপাশ ওপাশ হ'লেই মৃত্যু, কিন্তু ওটা ত জীবনে একটিবারই আসে !

সতীশ বাঁশী ও বেহালা বাজাতে পার্‌তেন। বেকার শরৎচন্দ্রের হাতেখড়ি প'ড়্‌লো তাঁর হাতে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনিই হ'য়ে উঠ্‌লেন দলের মধ্যে সেরা গাইয়ে ও বাজিয়ে। এর পরেই তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল যাত্রাদলের প্রতি।

কাজটা লোভনীয়, কিন্তু অভিভাবকের মত সহজে পাওয়া সম্ভবপর নয়। তাই লুকিয়ে তিনি হ'লেন গ্রামছাড়া। ভিড়লেন যাত্রার দলে। কিছুদিন সাকরেদিও ক'রলেন, কিন্তু বেশীদিন অভিভাবকের চোখে ধূলি দেওয়া সম্ভবপর হ'ল না। তাঁরা ধ'রে নিয়ে এলেন গ্রামে। আরম্ভ হ'ল পড়াশুনা। এবার সাথী হ'ল কালিদাসী ওরফে রাজলক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী এখন একটু বড় হ'য়েছে, কিন্তু সেই রোগা ছিপ্‌ছিপে গড়নে তার এতটুকুও পরিবর্ত্তন দেখা দেয়নি। সে আজও মার খায়—আবার সুযোগমত শাসনও করে।

বোঝাপড়া তার মুখে নয় চোখের ভাষায়। এমন চোখে সে চায়—সেখান থেকে অগ্নিবৃষ্টি হয়—পুরুষের অন্তরাত্মা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে একটা অজানা আশঙ্কায় দুরু দুরু ক'রে কাঁপ্‌তে সুরু করে। শুধু কি তাই—সে মুষ্‌ড়ে পড়ে নিজেরই অজ্ঞাতে। শরৎচন্দ্রও নতি স্বীকার ক'রে এগিয়ে আসেন। হাত দু'টো তুলে নিয়ে মৃদু চাপ দেন। আঙুলগুলো নিজের হাতে তুলে নিয়ে খেলা করেন। কখনও বা বাতাসে উড়ে আসা মাথার চুলগুলো ঠিকভাবে বিন্যস্ত ক'রতে ক'রতে জিজ্ঞাসা করেন, রাগ ক'রলি কালিদাসী?

কালিদাসী তবুও নিরুত্তর। অভিমানে ফুলছে সে নীরবে।

হাতখানায় টান দিয়ে শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—চল্—

না!

মিছে রাগ করিস্ না কালিদাসী! তুই সঙ্গে না থাকলে কোন কাজেই আমার সিদ্ধিলাভ হয় না!

মিছে কথা!

বিশ্বাস কর্! তোকে কারণে-অকারণে মারি সত্যি, কিন্তু তুই বুঝিস্‌না কেন—ভালবাসি ব'লেই ত মারি! শুধু যা উচ্ছ্বাস একটু

বেশী! তাই ব'লে তুই আমার উপর রাগ্ ক'র্‌বি? হাতখানা একটু জোরে টেনে ধ'রে ব'ল্‌লেন—চল্—

কোথায়?

আজ ছিপ ফেল্‌বি না?

শীকারী উভয়েই, কিন্তু পারদর্শিতায় অধিকতর পটু ছিল কালিদাসী। বিশেষ ক'রে কোথায় মাছ চরে, প্রতি টোপে কোথায় মাছ ধরা যায়—তার নিশানা দিতে পার্‌তো সে একাই!

রাগ প'ড়ে গেল কালিদাসীর। ছুট্‌লো সে ছিপ আন্‌তে।

বিধবা মা কিংবা বড় বোন সুরলক্ষ্মী হয়ত সাম্‌নে প'ড়ে গেল। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—এই ভ'র রোদে কোথায় আবার চ'ল্‌লি কালিদাসী?

মাছ ধ'র্‌তে!

প্রতিদিন এই দুপুরে মাছ ধ'র্‌তে যাবি! কেন? নবাবের মেয়ের বুঝি মাছ নইলে মুখে ভাত রুচে না?

এ-সব কথা গায়ে মাথার মেয়ে নয় কালিদাসী। কোনরকমে এদের চোখে ধূলি দিয়ে ছিপ দুটো নিয়ে সরে একবার প'ড়্‌তে পার্‌লেই বেঁচে যায় সে এ-যাত্রা!

ছিপ ফেল্‌তে বস্‌লো দু'জনে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ফায়ফরমাসের অভাব নেই: এই কালিদাসী তামাক সাজ! চার ফেল্—তোর বেশ খাচ্ছে—আমার খাচ্ছে না কেন? ক'টা ধ'র্‌লি? বেটাচ্ছেলে মাছগুলো বড় চালাক হ'য়ে গেছে, একবার ঠুক্‌রেই স'রে প'ড়্‌ছে বারে বারে। যাই বল্, তোর হাতযশ আছে। ক'টা ধ'র্‌লি? বলিস্ কি? বারোটা—আমার যে তিনটে! দে-দে তামাক সেজে দে এক ছিলিম!

চারে মাছ এসেছে। কালিদাসীর মন কিছুতেই উঠ্‌তে রাজী নয়। কিন্তু উপায় কি? শরৎদা'র হুকুম—মাথায় তাকে পেতে নিতেই হবে!

এক ছিলিম শেষ হ'য়ে গেল—তবুও মাছ ঠোক্‌রায় না! এপাশে

কালিদাসীর মাছ তিরিশের কোঠা পেরিয়ে গেল। অস্বস্তিবোধ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন শরৎচন্দ্র। ব'ল্‌লেন—কি তামাক খাওয়ালি কালিদাসী—মেজাজটা ঠিক খুল্‌লো না! খাওয়ানা আর এক ছিলিম!

মুখখানা ভার ক'রে আদেশ পালন ক'র্‌লো কালিদাসী। আড়চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দুষ্টু-হাসি হাস্‌লেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু মেজাজটা তখনও ঠিক তাজা হ'য়ে ওঠেনি। তাই আরও কিছুক্ষণ ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ ক'রে টান দিয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লুকিয়ে রেখে এলেন হুঁকো আর কল্‌কেটা!

এপাশে রোদ গড়িয়ে এসেছে। সন্ধ্যা হ'তে বেশী আর দেরী নেই। হাই তু'লে, আলিস্যি ভেঙে ব'ল্‌লেন শরৎচন্দ্র—আরও মাছ ধ'র্‌বি?

কেন?

সন্ধ্যা যে হ'য়ে এলো!

এলোই বা!

আম খাবি না?

সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসীর মন প্রলুব্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো—খাওয়াবে কে?

যে খাওয়ায়—

দাঁড়াও, আরও একটু দেখি!

আমার ভাল লাগ্‌ছে না!

ক'র্‌বো কি?

ওগুলো ঘরে পৌঁছে দিয়ে আয়!

গেলে মা বা দিদি সহজে ছাড়্‌বে না!

যেমন তুই বোকা! ছিপ্‌টা এখনে ফেলে যা—বাড়ী গিয়ে বোকার অভিনয় ক'র্‌বি—এই যাঃ, ছিপ্‌টা আন্‌তেই ভুলে গেছি! যাই, ছুটে যাই—নইলে কেউ হয়তো নিয়ে পালাবে!

তুমি কটা ধ'রেছো ?

পাঁচটা !

ওগুলো দাও। কালিদাসী ছিপ্ গুটোতে আরম্ভ ক'রলো।

শরৎচন্দ্র অপেক্ষা ক'রতে লাগ্‌লেন। কালিদাসী বাড়ীর পথে পাড়ি দিল। যাওয়ার পথে সে মাসীমাকে (ভুবনমোহিনীকে) অর্দ্ধেকের বেশী মাছ দিয়ে খুশী মনেই বাড়ী ফিরলো। শরৎচন্দ্রের শেখানো "বুলি" ক'প্‌ছে ফিয়ে এলো কিছুক্ষণ পরে।

শরৎচন্দ্র অধীরভাবে অপেক্ষা ক'রছিলেন। কালিদাসীকে দেখে খুশী হ'লেন। কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ ক'রতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ ক'রলেন না। ব'ল্‌লেন, এত দেরী ক'রে ফিরলি যে !

একটু দেরী হ'য়ে গেল। হাসিমুখে কালিদাসী পাশে এসে দাঁড়ালো।

ঐ হাসিটিই শরৎচন্দ্র দেখ্‌তে চেয়েছিলেন। এ যেন স্বর্গের অমৃত-সুধা ! জীবন-মন সব শীতল ক'রে দেয়। ব'ল্‌লেন, চল্ জমিদারবাবুর বাগানে ! ভাল ভাল আম আছে সেখানে !

কিন্তু ওদের দরোয়ানটা যে ডাকাত ! যেমন বিদ্‌কুটে চেহারা, মেজাজটাও ঠিক তেমনি ! সেদিন আমার চুল ছিঁড়ে নিয়েছিল !

আজ একবার নিক্ না দেখি ! ছুরিখানা দেখিয়ে ব'ল্‌লেন,—তোর গায়ে হাত দিলে তাকে খুন ক'রে ফেল্‌বো আমি !

সত্যি ? কালিদাসীর চোখে মুখে অপার বিস্ময়।

আমি থাকতে কে গায়ে তোর হাত দেয়ে দেখি ? এমন সাধ্য আছে কার ?

কালিদাসী তা জানে। নিজে মারেন সত্যি—কিন্তু ওটা যে অতৃপ্ত উচ্ছ্বাসের প্রতিচ্ছবি—মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় অকপটে ! কিন্তু তার জন্যে শরৎদা অনায়াসে খুন্ ক'রতে পারে—। কথাটা ভেবে

দেহ-মন কালিদাসীর আনন্দে আপ্লুত হ'য়ে উঠ্‌লো। এ দুনিয়ায় তবে তার গতিরোধ করে কে?

চ'ল্‌লেন দুজনে। চুপি চুপি পিছনের পাঁচিল বেয়ে বাগানের ভেতর ঢুকেই শরৎচন্দ্র কালিদাসীকে ভেতরে টেনে তুলে নিলেন। ব'ল্‌লেন, এটা ন্যাক্‌ড়া আমের গাছ। তুই এই ঝোপটার পাশে দাঁড়া, আমি ফেল্‌বো, তুই কোঁছড়ে কুড়িয়ে রাখ্‌বি—বুঝ্‌লি!

সরসর ক'রে গাছে উঠে গেলেন শরৎচন্দ্র। আম পাড়ার ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ শব্দে আকৃষ্ট হ'য়ে বাগানের গোঁফো মালি ছুটে এলো এক নিমেষে। কালিদাসীকে অস্পষ্ট আলোকে চিন্‌তে পেরে গর্জ্জে উঠ্‌লো, কোন্‌ হ্যা—

শরৎচন্দ্র সতর্ক হ'য়ে গাছের ডালে আত্মগোপন ক'র্‌লেন। কালিদাসীও চতুর মেয়ে। ঝট্‌ ক'রে কোঁছড়্‌ থেকে আম ক'টা ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, শরৎচন্দ্রের সেই প্রিয় ছুরিখানা তুলে নিয়ে একটা গাছের গোড়া খুঁড়্‌তে ব'সে গেল।

মালি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, কেয়া ক'র্‌তে হ্যা?

দাবাই ঢুঁড়্‌তা—দাবাই—

দাবাই? হিঁয়া'পর দাবাই?

জী, হ্যাঁ! মেরি মাতাজি বাত্‌মে ভুগ্‌তা হ্যা—এই শিকড় লেকে ধারণ ক'র্‌নেসে আচ্ছা হো যায়গি।

মালি কালিদাসীর কথা শুনে হাস্‌লো। খুশীও হ'ল। ব'ল্‌লো—হিঁয়া'পর বহুৎ বড় বড় সাপ হ্যা—জল্‌দি কোরো—

কালিদাসী শরৎচন্দ্রের শিষ্যা। ছুরি ও এক টুক্‌রো শিকড় হাতে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চ'ল্‌লো।

শরৎচন্দ্র সেই অবসরে গাছ থেকে নেমে আম চারটি কুড়িয়ে নিয়ে, প্রাচীর টপ্‌কে—সাম্‌নের পথে এসে দাঁড়ালেন।

কালিদাসী গেট থেকে বেরিয়েই শরৎচন্দ্রকে সাম্‌নে দেখে সবিস্ময়ে ব'ল্‌লো, তুমি?

হ্যাঁ। সহাস্যে উত্তর দিলেন শরৎচন্দ্র। পথ চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে আম চারটি তার হাতে তুলে দিয়ে ছুরিটি ফিরিয়ে নিলেন। ব'ল্‌লেন, তুই খাবি কালিদাসী!

আর তুমি?

অনেক খেয়েছি!

মিছে কথা! তুমি দুটো খাও—

আরে না—

তা হ'লে নেবো না। ঠোঁট ফুলিয়ে রুখে দাঁড়ালো কালিদাসী। শরৎচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি ক'র্‌লেন না। তার হাত থেকে দুটো আম ফিরিয়ে নিয়ে ব'ল্‌লেন—তোর যখন ইচ্ছে—তাই হোক্।

হোক্ না এখুনি খেয়ে ফেলো। রাস্তার উপর ব'সে প'ড়ে কালিদাসী ছুরিখানা নিজের হাতে টেনে নিয়ে আম ফালি ক'রে ব'ল্‌লো—নাও খেয়ে নাও।...

* * * *

পাশের বাড়ীর বৌ সুরবালা ভুবনমোহিনীর কাছে প্রায়ই আস্‌তেন। সুখ-দুঃখের কথা কইতেন, গল্প ক'র্‌তেন। ডাক্‌তেন "খুড়ীমা" বলে! স্বামী তাঁর বিদেশে চাক্‌রী করেন। বাড়ীতে থাকেন এক সরকার আর কালা শ্বাশুড়ী।

বয়স আঠারো-উনিশ। দেখ্‌তে শুন্‌তে সুরূপা বলা চলে! আচার-ব্যবহারে রুচিমার্জ্জিতা। বিশেষ ক'রে অন্তরটি ছিল তাঁর মধুমাখা। মানুষের দুঃখ তিনি দেখ্‌তে পারেন না। তাই এটা-ওটা উপলক্ষ্য ক'রে এঁদের প্রতিদিনই কিছু না কিছু সাহায্য ক'রে যেতেন।

শরৎচন্দ্র তাঁকে বৌদি ব'লে ডাক্‌তেন। তিনিও শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত

স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তেন। শুধু তাই নয়, তাঁর যতকিছু আব্‌দার তিনি হাসিমুখে জুগিয়ে যেতেন।

একদিন বন-ভোজনের ব্যবস্থা হ'ল। ছেলের দল দূরে একটা বাগানে সমস্ত যোগাড়-যন্ত্র ক'র্‌তে ব্যস্ত রইলো! শরৎচন্দ্র এলেন বৌদির কাছে কিছু চাঁদা ও পান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

সুরবালা তাঁদের উৎসবে চাঁদা দিলেন, পাঁচ টাকা। সাজা হ'তে লাগ্‌লো পান! গল্পও চ'ল্‌তে লাগ্‌লো দু'জনের মধ্যে।

শরৎচন্দ্রের মনটা তখন পড়েছিল বন্ধু বান্ধবের কাছে। তাঁর দেরী সহ্য হ'চ্ছিল না। বারে বারে তাগিদ দিতে লাগ্‌লেন, কই তোমার হ'ল বৌদি!

সুরবালা উত্তর দিলেন, একটু দাঁড়াও, খিলিগুলো মুড়ে নিই!

শরৎচন্দ্র কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ ক'র্‌লেন, না তুমি ইচ্ছে ক'রেই দেরী ক'রে দিচ্ছো!

সুরবালা মুখ তুলে হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—তাই ত' দিচ্ছি! এমন জরুরি কাজ সেখানে তোমার কত আছে বলতো?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—সে তুমি বুঝ্‌বে না।

অবশেষে হাসিমুখে সুরবালা সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। হাতের ওপর একটি একটি ক'রে পানের খিলি সাজিয়ে দিলেন। আদর ক'রে কোলের কাছে টেনে এনে একটি চুম খেলেন শরৎচন্দ্রের কপালে।

বয়স তখন তাঁর পনোর কি ষোল। সেই আকর্ষণের সন্নিধানে সুপ্ত যৌবন তাঁর সহসা আত্মপ্রকাশ ক'রে বস্‌লো। তিনি অধীর আবেগ ও এক অপূর্ব্ব অনুভূতির তড়িৎ প্লাবনে বন্ধুমহলের কাছে আর ফিরে যেতে পার্‌লেন না। দূরে একটা পড়ো বস্তির নির্জ্জন ঢিবিটার উপর ব'সে চোখের জলে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন।

* * * *

একটা অজ্ঞাত লজ্জায় শরৎচন্দ্র কয়েকদিন সুরবালার সম্মুখীন হ'তে পারলেন না। কিন্তু সুরবালা এই ঘটনাটাকে কোন প্রাধান্যই দিলেন না। গোপনে তিনি এই দরিদ্র পরিবারকে যেরূপ সাহায্য ক'রে যাচ্ছিলেন উপহারের লৌকিক আচরণে,—তেমনি সেদিনও তিনি এসেছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন বাড়ীতেই ছিলেন। সুরবালাকে দেখে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। সুরবালা নানা কথার মধ্যে সহসা জিজ্ঞাসা ক'রে ব'সলেন, আচ্ছা খুড়ীমা শরৎঠাকুরপো হঠাৎ পড়াশুনা ছেড়ে দিলেন কেন? শুনি ত' লেখাপড়ায় উনি খুব ভাল—

ভুবনমোহিনীর শেষ পর্য্যন্ত শোনার ধৈর্য্য রইলো না। তিনি চোখের জলে ভাসতে লাগলেন। ব'ল্‌লেন—সংসারের অবস্থা ত সবই দেখতে পাচ্ছো, মা! এতগুলো ছেলেমেয়ের মুখে দিয়ে, কি করেই বা ওর পড়াশোনার ব্যবস্থা করি! তোমার খুড়োম'শায় ত এ জগতেরই মানুষ নন!—নিজের মনে বসে বসে কি যে ভাবেন, কি যে করেন, একা তিনিই জানেন! দেখোনা একবার ওঘরে গিয়ে—কেমন নির্ব্বিকার চিত্তে বই নিয়ে বসে আছেন ভোলানাথের মত!

সুরবালা সমস্তই লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছিলেন—এতদিনে মুখ খুললেন, যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে ত ঠাকুরপো আমার কাছে থেকেই পড়াশোনা ক'রতে পারেন।

ভুবনমোহিনী ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে ব'ল্‌লেন, ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে তোমায় ব'ল্‌বো'খন মা।

সুরবালা ফিরে গেলেন। শরৎচন্দ্র সুরসাধনায় মত্ত হ'য়ে উঠলেন। কণ্ঠস্বরটি ছিল তাঁর মধুমাখা।

* * *

মতিলালবাবু রাজি হ'লেন সহজেই। ব'ল্‌লেন, যদি একটা হিল্লে হয় ভালই ত!

ভুবনমোহিনী ব'ল্‌লেন, শেষে ছেলেটাকে বিকিয়ে দিতে হবে?

মতিলালবাবু হাস্‌লেন। ব'ললেন, একটু ভুল ক'র্‌লে ভুবন—সুরো'মা আমাদের শরৎকে কিনতে চাইছেন না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছেলেটিকে মানুষ ক'রে তুল্‌তে চান! তুমি দ্বিমত ক'রো না—সুযোগ জীবনে মানুষের খুব কমই এসে থাকে।

ভুবনমোহিনীও রাজি হ'লেন অবশেষে। শরৎচন্দ্র সুরবালার বাড়ীতে গিয়ে পুনরায় পড়াশুনা আরম্ভ ক'র্‌লেন।

*　　　*　　　*　　　*

বৌদির আশ্রয়ে আস্তানা লাভের পর, শরৎচন্দ্রের চঞ্চল প্রকৃতি অনেকখানি সংযত হ'য়ে উঠ্‌লো। কালিদাসী আছে, তবে জীবনের দ্বারে আজ সে গৌণ্য—মূখ্য হ'ল বৌদি! বৌদির ফায়-ফরমাস খেটে—বৌদির সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ ক'রেই তৃপ্তি পান সকলের চেয়ে বেশী। তাই নিয়মিত স্কুল যান—পড়াশুনা করেন। আবার অবসর সময়মত গল্প গুজবও করেন। হাসিখুশীর মধ্যে এমনি ক'রে চ'ল্‌লো কিছুদিন।

স্কুল থেকে ফেরার পথে সহসা খবর পেলেন কালিদাসীর বিয়ে—ঘাটের মড়া এক বুড়ো বরের সঙ্গে। ঘটনাটি অবিশ্বাস্য হ'লেও একটা কুতূহল জেগে রইলো মনের কন্দরে। সকাল সকাল খাওয়া সেরে তিনবন্ধু যাত্রা ক'র্‌লেন বিবাহ বাসরে। কিন্তু চোখে যা দেখ্‌লেন—মন তা বিশ্বাস ক'র্‌তে রাজী হ'ল না কোনমতে।

মাত্র বাহাত্তর টাকা পণে বুড়ো রাজী হ'য়েছেন একসঙ্গে দুটি মেয়েকে গ্রহণ ক'র্‌তে!

তরুণমন কেঁদে উঠ্‌লো—এও কি সম্ভব?

বাস্তব পরিচয় দিল—ধূলোবালির জগতে—অসম্ভব ব'লে কোন বস্তু নেই কোনকালে! যা দেখ তাও সত্য—যা শোন তাও সত্য—পার্থক্য শুধু রুচিবোধের।

শরৎচন্দ্র ফিরে গেলেন, কিন্তু মনে নিয়ে গেলেন রূঢ় একটা বেদনা !

উপন্যাস পড়ার বয়স এটা নয়, কিন্তু এরই মধ্যে প'ড়েছেন অনেক। যদিও গোপনে—মাঠে, ঘাটে, গোয়ালঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে—তবুও চিত্ত তাঁর হাহাকার ক'র্‌তে লাগ্‌লো—এও কি সম্ভব ?

সমাজ পেয়েছে মুক্তি,—কৌলিন্য—তাও পেয়েছে মর্য্যাদা—মা'র নিরুপায় কাতর হৃদয়—পেয়েছে কি সান্ত্বনার বাণী ?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগে, একটা অহেতুক উত্তেজনায় দেহ-মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, কিন্তু সমাধানের পথ যে রুদ্ধ চিরতরে !

ব্যথাই করে সৃষ্টি—বেদনাই হয় তার সান্ত্বনার পাথেয়—

সহসা ভাবুক শরৎচন্দ্রের কলম মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস প'ড়ে—মনে যে কল্পনা দানা বেঁধেছিল,—পিতা মতিলালের অসম্পূর্ণ কাহিনী পড়ে, মনে যে সৃষ্টির প্রেরণা জেগে ছিল,—কাশিদাসীর বিবাহবাসর তার দ্বার দিল মুক্ত ক'রে ; রচনা ক'র্‌লেন—কাকবাসা—ব্রহ্মদৈত্য। আরম্ভ হ'ল কোরেল গল্প—......

সৃষ্টির অবসাদে—চিত্তের উত্তেজনা হ্রাস পেল ধীরে ধীরে। মনটা চিন্তার স্বর্গ থেকে নেমে এলো মাটির ধূলিতে। স্নেহ, ভালবাসা ও মমতার আবর্ত্তে বার বার ঘুর্‌পাক্ খেয়ে, নিজেকে নোতুন ক'রে চেনার বাসনায় নিজেই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠ্‌লেন দিনের পর দিন।

* * *

এপাশে বৌদির (সুরবালার) স্নেহ-যত্নের শেষ নেই।

টিফিনের সময় খাবার পাঠিয়ে দেন, সেই খাবার বন্ধুবান্ধবেরা সবাই মিলে ভাগ করে খান।—বৌদির প্রসংশায় অশ্বত্থছায়াতল মুখর হ'য়ে ওঠে। বলেন—হ্যাঁ, আর একটা কথা—এই যে আমাদের বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা—কোনদিন জীবনে যেন ম্লান না হয় !

বন্ধুবর্গ সমস্বরে উত্তর দিলেন—নিশ্চয়! আম্‌রা শপথ ক'র্‌ছি এই আশ্‌খ গাছের তলায় ব'সে—জীবনে যে যতই বড় হোক্ না—কাউকে আমরা ভুল্‌বো না কোন সময়ে!···

শরৎচন্দ্র স্কুল থেকে ফির্‌লে, সুরবালা আদর ক'রে তাঁকে ঘরে নিয়ে বসালেন। বইগুলো নিজেই টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখ্‌লেন। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—টিফিনের খাবার সকলের কুলিয়েছিল?

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন, খুব ভাল হ'য়েছিল বৌদি! সবাই আমরা পেট ভ'রে খেয়েছি।

সুরবালা আদরে তাঁর চিবুকখানা দোলা দিয়ে ব'ল্‌লেন—এত মিথে কথাও ব'ল্‌তে পারো তুমি! ওইটুকু খাবার—তাও পাঁচজনে—সবার উপর পেট ভ'রে—বলিহারি তোমার লজ্জা! যাও হাতমুখ ধুয়ে এসো গো।

শরৎচন্দ্র হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এলেন। সুরবালা একথালা খাবার নিয়ে সাম্‌নে বসিয়ে খাওয়ালেন। ব'ল্‌লেন, ভাল ক'রে পাশ করা চাই—আমি খুড়িমাকে কথা দিয়েছি কিন্তু!

শরৎচন্দ্র সলজ্জ হাসি হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, আচ্ছা তুমিই বলতো বৌদি—তোমার কথার অবাধ্য হ'য়েছি কি কোনদিন?

* * * *

ইতিমধ্যে সংবাদ এলো কালিদাসীর স্বামী ভীষণ অসুস্থ। বিয়ের ক ছদিন পরেই সুরলক্ষ্মী ইহ-জগতের মায়া কাটিয়েছিলেন, সুতরাং স্বামীর সেবার জন্যে ডাক প'ড়্‌লো রাজলক্ষ্মীর। বিয়ের পর স্বামীগৃহে তার এই প্রথম যাত্রা। সেদিন স্বামী একাই ফিরে গিয়েছিলেন—আজ ডাক প'ড়েছে শেষের দিনে সেবাশুশ্রূষার আশায়। যেতে হ'ল রাজলক্ষ্মীকে। কিন্তু দু'মাস পরে ফিরে এলো মাথার সিন্দুর মুছে আর

হাতের শাঁখা ভেঙে দিয়ে। এর পরেই মা'র সঙ্গে ক'র্‌লো কাশী-ধামে যাত্রা।

মা একা ফিরে এলেন—ফির্‌লো না শুধু কালিদাসী। শোনা গেল—পথে তার বিসূচিকা রোগে অপমৃত্যু ঘটেছে। এ সংবাদে শরৎচন্দ্র মর্ম্মাহত হ'লেন। এ যেন বিধাতার নির্ম্মম পরিহাস! চিত্তের মর্ম্মবেদনায় দুটো দিন কোথায় যে কেমন ক'বে কেটে গেল—তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন না! বৌদি কাছে ডেকে সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে লঘু পরিহাস ক'র্‌লেন, কালিদাসীকে সত্যই তুমি ভাল বেসেছিলে বটে!

লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌লেন শরৎচন্দ্র। ব'ল্‌লেন, কি যে তুমি বলো বৌদি!

তবে এমন ক'রে গম্ভীর হ'য়ে বসে আছো কেন দুটো দিন?

এমনি ভাব্‌ছি?

বৌদি গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন—উঁহু—না, অন্যকিছু!

ধাঃ! বৌদির কোলে মুখ লুকালেন শরৎচন্দ্র।

বৌদি এই সুযোগই খুঁজ্‌ছিলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ব'ল্‌লেন—তা হ'লে খাবে চলো!

সুরবালা তাঁর কথা রাখ্‌তে আপ্রাণ চেষ্টা ক'র্‌লেন। নিজে পাশে বসে খাওয়ান—নিজেই শয্যা রচনা ক'রে দেন—অবসর সময়ে ব'সে আবার গল্প করেন দু'জনে। শরৎচন্দ্র কখনও তাঁকে দেশ-বিদেশের কথা গল্পের ছলে ব'লে চলেন—বৌদিও শোনান কাল্পনিক কত রূপকথার কাহিনী! দিন কাট্‌ছিল বেশ সুখেই। সহসা সুরবালা অসুস্থ হ'য়ে প'ড়্‌লেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর সেবা ক'র্‌তে লাগলেন। ডাক্তারকে খবর পাঠালেন

কিন্তু ডাক্তারের সেদিকে খেয়ালই নেই। এদিকে রোগী জ্বরের ঘোরে ভুল ব'ক্‌ছেন। শরৎচন্দ্র নিজে ছুট্‌লেন ডাক্তারের কাছে। জানিয়ে দিয়ে এলেন—যদি তিন দিনের মধ্যে তাঁর বৌদি সুস্থ না হ'য়ে ওঠে, তা হ'লে সশরীরে এ গ্রামে আর তাঁর বাস করা সম্ভব হ'বে না!

সুরবালা পরদিন থেকেই সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। স্বামী প্রতুলবাবুকে খবর পাঠানো হ'য়েছিল। তিনিও এসে প'ড়্‌লেন। সুরবালা ব'ল্‌লেন—একি তোমার পাগ্‌লামো ঠাকুরপো! একটা প্রাণের জন্যে এত লোককে কষ্ট দিলে?

শরৎচন্দ্র উত্তরে মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, এ ছাড়াও ত উপায় ছিল না বৌদি!

* * *

সুরবালা সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠেছেন। স্বামী-সেবায় তিনি সকল সময়ে ব্যস্ত। শরৎচন্দ্র প্রথম উপলব্ধি ক'র্‌লেন, স্বামী-স্ত্রীর মধুরতম সম্পর্কটা কি বস্তু। চিন্তা ধারায় সহসা তাঁর একটা বিপ্লব ঘটে গেল! তিনি নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে ফেল্‌লেন। কাউকে কিছু না জানিয়ে গভীর রাত্রিতে হাঁটা-পথে পাড়ি দিলেন পুরীর অভিমুখে।

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ১৭৭-১৭৮]

* * *

প্রথমে হাঁটাপথ···পরে গরুর গাড়ী ও তাদের দয়ায় আহার সংগ্রহ··তারপর আবার হাঁটাপথ··

পথের ক্লান্তি ও অনাহার তাঁকে দুর্ব্বল ক'রে তুল্‌লো। শরীরটা নিজের কাছে বোঝা ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌লো। শেষে একটা পুকুরপাড়ে বকুল গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে একটা মাটি চাপা ইটের উপর বস্‌লেন স্থির হ'য়ে।

স্নিগ্ধ ছায়া ও শীতল বাতাসে শরীরটা ক্রমেই এলিয়ে প'ড়্তে লাগ্‌লো। তিনি আর ব'সে থাক্‌তে পার্‌লেন না। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চোখ বুজিয়ে গ্রামের কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। মনে পড়ে গেল, সহপাঠিদের কথা—সেই অশ্বত্থ গাছ, টিফিনের সময়ে আসর জমিয়ে ভাগ ক'রে টিফিন খাওয়া, মুরারিপুরের পুলের ধারে মাছ ধরা—বৌদির স্নেহ—বৌদির আদর—বৌদির হাসি—

তন্দ্রাদেবীর আকর্ষণে চিন্তার খেই গেল হারিয়ে।

একটি সুরূপা পূর্ণ-যৌবনা বিধবা, পথের পাশ দিয়ে জল আন্‌তে যাচ্ছিল। সহসা গাছের তলায় একটি যুবককে অকাতরে ঘুমোতে দেখে বিস্মিত হ'লো। সাজ-পোযাক ও চেহারায় সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে ব'লেই মনে হ'ল।

জল নিয়ে ফেরার পথে যুবতী গাছতলায় এসে থম্‌কে দাঁড়ালো। নিদ্রিতের দিকে ভাল ক'রে তাকালো। দেখ্‌লো, মুখখানি শুক্‌নো—সর্ব্বাঙ্গে ফুটেছে ক্লান্তির ছায়া। মনে হ'ল যেন বহুদিন সে অভুক্ত।

যুবতীর প্রাণটা সহসা মমতায় ভ'রে উঠ্‌লো। জলের কল্‌সীটা পাশে নামিয়ে রেখে ঠেলা দিল—এখানে ঘুমোচ্ছো কেন? বাড়ী কোথায় গো তোমার?

শরৎচন্দ্রের তন্দ্রার আমেজ টুটে গেল। চোখ মেলে তাকালেন। দেখ্‌লেন, সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী। সবিস্ময়ে খাড়া হ'য়ে উঠে বস্‌লেন। আপনি পরিচয় গোপন ক'রে ব'ল্‌লেন—জগন্নাথদেবের দর্শনে চ'লেছি—মনের যত কিছু পাপ সঁপে দেবো ব'লে।

যুবতী মুচ্‌কী হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—তা না হয় হ'ল, কিন্তু এখানে শুয়ে কেন?

শরৎচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। ভাব্‌লেন—হয় ত কোন অপরাধ হ'য়ে

থাকবে। ব'ল্লেন—আজ দু'দিন কিছু খাওয়া হয়নি, বিশ্রামও নিইনি—তাই একটু ঘুমিয়ে—

যুবতী পুনরায় হাস্‌লো। ব'ল্লো—গাছতলায় কি ভাল ঘুম হয়? চলো, ব্যবস্থা ক'রে দিইগে!

শরৎচন্দ্র সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালেন। যুবতী পুনরায় হাস্‌লো। ব'ল্লো—ভয় নেই গো—বয়সে নিশ্চয় দু'এক বছরের বড় হবো—চলো! কচি মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে যে!

শরৎচন্দ্র আপত্তি ক'র্‌লেন না। কারণ, যে পথকে তিনি একদিন সহজ মনে ক'রেছিলেন—পথে নেমে দেখ্‌লেন—তার মত বন্ধুর আর এ দুনিয়ায় দু'টি বস্তু নেই! নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা যে কত কঠোর—তা কি মুখের ভাষায় ফোটানো চলে?

যুবতীর নাম সাবিত্রী। বিধবা। সংসারে এক ভগ্নিপতি ও দূর সম্পর্কের দেবর ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। পরম আদরে তাঁকে উঠানে আসন পেতে বসালো। কাপড় একখানা কুঁচিয়ে রাখ্‌লো। ব'ল্লো—জল এনে দিই—কাপড়খানা ছেড়ে ফেল! ঘরে এখন যা' আছে—দু'মুঠো মুখে দিয়ে নাও! সন্ধ্যায় আহারের ব্যবস্থা বরং ক'রে দেবো'খন্।

শরৎচন্দ্র এতখানির আশা রাখেননি—অথচ এই অযাচিত স্নেহকেও উপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেন না। বরং মূল্য যাচাইএর আনন্দে তিনি অন্যমনা হ'য়ে প'ড়্‌লেন।

সাবিত্রী ব'ল্লো- লজ্জা কি? আমি ত তোমার বোনের মত। নাও মুখে-হাতে জল দিয়ে নাও।

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন না। নীরবে নির্দ্দেশ পালন ক'রে গেলেন।

খাওয়া শেষ হ'লে সাবিত্রী নিজেই শয্যাটি পরিষ্কার চাদরে ঢাকা দিয়ে ব'ল্লো—নাও, শুয়ে পড়ো…

শরৎচন্দ্র অকাতরে ঘুমোচ্ছিলেন। রাত্রি তখন প্রায় ন'টা। সাবিত্রী ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে ব'ল্‌লো, আর ঘুমিয়ে কাজ নেই—খাবে চলো।

শরৎচন্দ্র সঙ্কোচভরে মুখ তুলে চাইলেন। সাবিত্রী হেসে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো—ভয় নেই গো—ভয় নেই। জাত যাবে না—আমিও বামুনের মেয়ে—

শরৎচন্দ্র আপত্তি ক'র্‌তে সাহসী হ'লেন না। নীরবে তাকে অনুসরণ ক'র্‌লেন।

[শরৎ-পরিচয়, স্থ. না গ., পৃঃ ১৭৮]

* * * *

শরৎচন্দ্র অসুস্থ হ'য়ে প'ড়্‌লেন। সাবিত্রী অক্লান্ত সেবায় তাঁকে সুস্থ ক'রে তুল্‌লো। শরৎচন্দ্রের বড় ভালো লাগ্‌লো এই সাবিত্রীকে। তাকে একটি মুহূর্ত্ত দেখ্‌তে না পেলে অন্তরটি তাঁর আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠ্‌তো।...

রাত্রি তখন হ'বে প্রায় আট্‌টা। সাবিত্রী পাশের ঘরে শুয়ে। ক'দিন তার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। শরৎচন্দ্র শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাব্‌ছেন—এই সাবিত্রী তাঁর কে? কেনই-বা তাঁর সঙ্গে হ'ল পরিচয়—আর যদিই বা হ'ল—এমন যত্ন ও সেবা ক'রে তাঁকে বাঁচিয়েই বা তুল্‌লো কিসের প্রয়োজনে? কত প্রশ্নই না জাগে তাঁর মনে! কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করার সাহস তাঁর কুলোয় না। কিসের যেন একটা দুর্ব্বলতা তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ ক'রে দিয়ে যায়।

হঠাৎ পাশের ঘরে, কে যেন জোরে ধাক্কা দিতে লাগ্‌লো। ভেতর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আস্‌তে লাগ্‌লো। শরৎচন্দ্র তখনও সম্পূর্ণ শক্তিলাভ করেননি। তবুও বাইরে বেরোনোর চেষ্টা ক'র্‌লেন একবার।

ইতিমধ্যে বাইরে রীতিমত একটা ধস্তাধস্তি সুরু হ'য়ে গেছে। সেই শব্দের সঙ্গে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে আস্‌ছে—আমার শালী—আমি খাওয়াই পরাই—ও আমার!

কে যেন প্রতিবাদ ক'রে উঠ্‌লো - একবার ছাড়্‌না দেখি, বুঝিয়ে দিই ও কার? আমার না তোর? আমার দাদার বৌ—ও আমার

ভেতর থেকে শরৎচন্দ্রের দরজায় ধাক্কা পড়্‌লো! দরজার সাম্‌নে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। দরজা খুলে দিলেন। সাবিত্রী তাঁর পায়ে লুটিয়ে প'ড়্‌লো—আমায় তুমি বাঁচাও ঠাকুর!

শক্তি কেমন করে যে ফিরে পেলেন তা উপলব্ধির অবসর তিনি পেলেন না। দরজা বন্ধ ক'রে সাবিত্রীকে বিছানায় শোয়ালেন। তখন সে তার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে। মুখে জল ও মাথায় তালপাতার পাখার বাতাস ক'র্‌তে সুরু ক'র্‌লেন।

সাবিত্রীর জ্ঞান ফিরে এলো। শরৎচন্দ্র তখন লণ্ঠনটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। দেখ্‌লেন, দুটো মূর্ত্তি দ্বারের পাশে প'ড়ে রয়েছে। একজনের মাথা দিয়ে তখনও রক্ত ঝর্‌ছে, অপরের হাত থেকে রক্ত গড়িয়ে প'ড়্‌ছে। মুখ দিয়ে তাড়ির গন্ধ ভক্‌ ভক্‌ ক'রে বেরুচ্ছে। তখন যে ধস্তাধস্তির শব্দ তিনি শুনেছিলেন—সেটা এদের পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার লড়াই। সাবিত্রী সাশ্রুনয়নে ব'ল্‌লো—এ লড়াই এদের বার মাসের। আর উভয়ের লক্ষ্যবস্তু ব'লে, আজও সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে সমর্থ হ'য়েছে। তাই ত সে শরৎচন্দ্রকে নিজের কাছে আট্‌কে রাখ্‌তে চায়!

ঘৃণায় তাঁর মনটা সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু তাদের সেবা ক'র্‌তে এতটুকুও কার্পণ্য ক'র্‌লেন না। সাবিত্রী টল্‌তে টল্‌তে কোন

রকমে জলের৮ জায়গাটা এগিয়ে দিল, শরৎচন্দ্র ক্ষতস্থানটা ধুয়ে ছেঁড়া কাপড়ের পাড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

* * * *

রাত্রি কাটলো নিশ্চিন্তেই। শরৎচন্দ্র তক্তপোষে, সাবিত্রী একটা কম্বল বিছিয়ে শুলো মেঝের ওপর। শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন,—তোমার ভয় ক'র্‌ছে, না সাবিত্রী ?

সাবিত্রী তেমনি মধুর হাসি হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—মানুষই পশু—কিন্তু তোমার কাছে আমার কোন ভয় নেই !

শরৎচন্দ্র উত্তরের ভাষা সহসা খুঁজে পেলেন না। নীরবে শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন এরই নাম বিশ্বাস ! হয়ত এর কেউ মূল্য দেয়—কেউ দেয় না—তবুও এর মর্য্যাদাকে ফেলে উড়িয়ে দেওয়া তো চলে না !

* * * *

ঠাণ্ডা লেগে শরীরটা শরৎচন্দ্রের আরও একটু বেশী খারাপ হ'ল। সাবিত্রী বিব্রত হ'য়ে প'ড়্‌লো। গায়ের গয়না বাঁধা রেখে পাশের গ্রামে সেই প্রেমিক দেবরকে পাঠালো কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে আন্‌তে। ডাক্তার ডেকে আনারও পরামর্শ দিলো।

দেবরটি আচারে ব্যবহারে ছিল সত্যই ভদ্র। দোষ শুধু একটু উগ্র ধরণের প্রেমিক। স্থান, কাল, পাত্রভেদের পার্থক্য সে বোঝে না।

ডাক্তার এলো। ওষুধও দিয়ে গেল। তেতো ওষুধের নাম শুনেই শরৎচন্দ্রের মুখখানা একটুকু হ'য়ে গেল। ব'ল্‌লেন, অসুখ আমার সেরে গেছে।

সাবিত্রী মৃদু হাস্‌লো। ও-সব শুন্‌ছিনে—খেতেই হবে ! ব'লে একরূপ জোর করেই মুখে ওষুধ ঢেলে দিল।

মুখখানা ভার ক'রে শরৎচন্দ্র শুয়ে রইলেন। সাবিত্রী মৃদু হাসি হাস্তে হাস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল! পা টিপে, তামাক সেজে আন্‌লো। শরৎচন্দ্রের মুখে হাসি ফোটাতে সে যে কি ক'র্‌বে ভেবেই স্থির ক'র্‌তে পারে না!

শরৎচন্দ্র মনে মনে খুশী হলেন, কিন্তু তাঁর মুখের গাম্ভীর্য্য এতটুকুও ম্লান হ'ল না। কারণ এইটুকু জীবনে তাঁর এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হ'য়েছিল—মেয়েদের অবাধ্য না হ'লে, সেবা-যত্ন বেশী ক'রে আদায় করা সম্ভব হয় না!

শরৎচন্দ্র আহার শেষ ক'রে শয্যায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা ক'র্‌লেন। সাবিত্রী হাসিমুখে তামাক সেজে আন্‌লো। শরৎচন্দ্র খুশীমনে টান দিতে সুরু ক'র্‌লেন। পাশের টুলটায় সাবিত্রী হাসিমুখে চেপে ব'স্‌লো।

শরৎচন্দ্র কয়েকটান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে ব'ল্‌লেন—তোমার সাজানো বইগুলো এতক্ষণ দেখ্‌ছিলাম। নাম লেখা দেখ্‌লাম—নীলাম্বর মুখার্জ্জী। ভদ্রলোকটি কে?

সাবিত্রী সহাস্যে উত্তর দিল, স্বামী।

ভদ্রলোকের রুচি ছিল ব'লে মনে হয়। কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় মুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন, প'ড়েছো?

সাবিত্রী সংক্ষেপে উত্তর দিল, একবার নয় বহুবার! বড় ভাল লাগে।

অকারণে শরৎচন্দ্রের বুক ভেদ ক'রে দীর্ঘশ্বাস নেমে এলো। ব'ল্‌লেন, তোমায় অনেক কষ্ট দিলাম। একটু সুস্থ বোধ ক'র্‌লেই রওনা হবো ঠিক্ ক'রেছি!

সাবিত্রী ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, কোথায় ?

নলটি মুখ থেকে নামিয়ে উত্তর দিলেন, পুরী !

সাবিত্রী উৎসাহিত হ'য়ে ব'ল্‌লো, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো ! জীবনে কোন কিছু পাপ যদি ক'রে থাকি—তোমার মতই তাঁর শ্রীপাদপদ্মে স'পে দিয়ে আসবো !

শরৎচন্দ্র কৌতুক বোধ ক'র্‌লেন। ব'ল্‌লেন, ভয় ক'র্‌বে না ?

সাবিত্রী মাথা দুলিয়ে সহাস্যে উত্তর দিল, ভারী ত পুরুষ,—তাকে আবার ভয় ! গম্ভীর হ'য়ে উঠে ব'ল্‌লো, সত্যি ব'ল্‌ছি ! ঠাট্টা আমি ক'র্‌ছিনে। নিজের চোখেই তো দেখ্‌লে আমার অবস্থা !

শরৎচন্দ্র আনমনে কি যেন একটা ভেবে নিলেন। ব'ল্‌লেন, রাস্তাটা কিন্তু বড় দুর্গম !

সাবিত্রী ব'ল্‌লো, তা হোক্‌। সঙ্গে একজন থাক্‌লে পথের কষ্ট লাঘব হয়, বিশ্বাস কর তো ? মাঝপথে সহসা হেসে উঠে ব'ল্‌লো, পা-হাত দুটোই সবল, বোঝা যে হবো না সে-কথা অনায়াসে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারো।

শরৎচন্দ্র উত্তরে মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, হবে গো হবে'খন।

সাবিত্রীও হাস্‌লো। ব'ল্‌লো, না বাবু তোমায় কিছুতেই আমার বিশ্বাস হয় না। আমাকে ছুঁয়ে বলতো, নেবে—নিশ্চয়ই নেবে ?

শরৎচন্দ্র কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ ক'র্‌লেন। ব'ল্‌লেন, কতবার ব'ল্‌বো !

সাবিত্রী হাস্‌লো। ব'ল্‌লো, পুরুষের রাগ দেখো !···

* * * *

কপাটে ধাক্কার দুম্ দুম্ শব্দে শরৎচন্দ্রের সহসা নিদ্রা টুটে গেল। বাইরে চ'লেছে সেই দ্বন্দ্বের পুনরাভিনয়। সাবিত্রী ঘর ছেড়ে শরৎচন্দ্রের পাশে এসে ব'স্‌লো। প্রদীপের বাতিটা বাড়িয়ে দিয়ে ব'ল্‌লো, এখানে আর একটি মুহূর্ত্তও আমার থাক্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে না। চলো, কালই যাত্রা করা যাক্।

যাত্রা সুরু হ'ল। অবিশ্রাম হেঁটে চ'লেছেন দু'টি প্রাণী।

* * * *

সকালে সাবিত্রী ও অতিথির পাত্তা পাওয়া গেল না। দেবর ও ভগ্নিপতির চমক্ ভাঙ্‌লো। বুঝ্‌তে পার্‌লো শীকার তাদের হাত ছাড়া হ'য়েছে।

ভগ্নিপতি অম্বিকাচরণ ব'ল্‌লো,—এত যত্ন, এত আয়াস—বেইমান শেষে কিনা আমার ঘরের লক্ষ্মীকে নিয়ে ভাগ্‌লো!

দেবর অকুলতারণ দমবার পাত্র নয়। ব'ল্‌লো, যেতে হবে হাঁটা-পথে! বাছাধনেরা যাবে কতদূর? দাও তো কিছু টাকা—পাড়ার অপি, অনাদি, সতীশ, মুরারীকে ঠিক ক'রে আসি, তুমি আমি ত র'য়েইছি।

কথা ও কাজ সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক হ'য়ে গেল। নেশার উপকরণও যোগাড় করা হ'লো। সুরু হ'ল অভিযান। দল বেঁধে লাঠিসোটা নিয়ে চ'ল্‌লো সকলে হৈ-হৈ রৈ-রৈ রবে।

* * * *

দীর্ঘ পথশ্রান্ত ও ক্লান্ত শরৎচন্দ্র ও সাবিত্রী সন্ধ্যায় একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় আশ্রয় নিলেন। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে শরৎচন্দ্র তামাক টান্‌ছেন। একটু দূরে বসে আহারের ব্যবস্থাতে নিযুক্ত সাবিত্রী!

সহসা শরৎচন্দ্র মুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন,—তোমায় দেখে আমার কি মনে হ'চ্ছে জানো ?

সাবিত্রী মুখ তুলে চাইলো।

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, পূর্ব্বজন্ম ব'লে যদি কোন বস্তু থাকে তাহ'লে তুমি ছিলে আমার কোন নিকটতম আত্মীয়া !

সাবিত্রী হাস্‌লো।

সহসা একটু দূরে মিলিত কণ্ঠের হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দ ভেসে উঠ্‌লো। ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝার পূর্ব্বেই চারপাশ থেকে আক্রমণ সুরু হ'য়ে গেল। শরৎচন্দ্রকে তারা উত্তম মধ্যম দিয়ে সাবিত্রীর মুখ, হাত, পা বেঁধে, কাঁধে ক'রে নিঃশব্দে গা ঢাকা দিল অন্ধকারে।

অসহায় শরৎচন্দ্র জুল্ জুল্ ক'রে চেয়ে দেখ্‌লেন—ডাকাতের দল অপহরণ ক'রে নিয়ে গেল সাবিত্রীকে। নিরুপায়ে তিনি কাৎরাতে লাগ্‌লেন সেই গাছের তলায় প'ড়ে।

পরদিন সকালে শ্রদ্ধেয় কে. পি. বসু তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ীতে। কয়েকদিন নিজের কাছে রেখে সুস্থ ক'রে তুল্‌লেন। কিছুদিন পরে লোক সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ক'লকাতায় অক্ষয় গাঙ্গুলিম'শায়ের বাসায়।

[শরৎ-পরিচয়. সু. না. গ., পৃঃ ৯৯]

*   *   *   *

বিন্ধ্যবাসিনী দেহত্যাগ করার পরবছরেই কেদারনাথ গুরুগৃহে সন্ন্যাস রোগে দেহরক্ষা ক'র্‌লেন (১লা জানুয়ারী, ১৮৯২)। এপাশে দেবানন্দপুরের দারিদ্র্য-দুর্দ্দশা সহ্যের সীমা অতিক্রম ক'র্‌লো। বাড়ি-ঘর দেনার দায়ে নীলামে উঠ্‌লো। ভাগলপুরে না এলেই নয়। ভুবন-

মোহিনী দেবী ছোটকাকা অঘোরনাথকে সবিস্তারে একখানা চিঠি লিখ্‌লেন। সেই চিঠি পেয়ে অঘোরনাথ স্থির থাক্‌তে পার্‌লেন না। তিনি ভুবনমোহিনীকে নিয়ে এলেন ভাগলপুরে!

শরৎচন্দ্রকেও ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হ'ল টি. এন. জুবিলী স্কুলে। এখানে এসে মন দিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ ক'র্‌লেন, কিন্তু পুরানো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা একেবারে বন্ধ হ'ল না। সুরু হ'ল অভিযান:

স্কুলের পড়ুয়া ছাত্র। মানুষের দুঃখে বেদনা বোধ জাগ্‌লেও সে ব্যথা উপশমের সামর্থ্য তখনও লাভ করেননি—অথচ একটা কিছু না ক'র্‌লেও গরীব বেচারার মান-ইজ্জৎ সব যায়!

কিছুতেই স্থির থাক্‌তে পার্‌লেন না। দলবল নিয়ে শরৎচন্দ্র ও রাজেন্দ্রনাথ বেরিয়ে প'ড়্‌লেন মাছ চুরি ক'র্‌তে।

দু'টি দলে ভাগ হ'য়ে, অন্ধকারে যাত্রা সুরু হ'ল। রাজেন্দ্রনাথ হ'লেন দলের নেতা।

ডিঙ্গী ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দে এগিয়ে চ'লেছে। সহসা রাজেন্দ্রনাথ ব'লে উঠ্‌লেন, একটু আস্তে! বেটারা ভারী পাজী!

একটা ডিঙ্গী সোজা বেয়ে বেরিয়ে গেল। অপরটি সঙ্গে সঙ্গে ঝাউবনের পাশ দিয়ে মকা ক্ষেতের ভেতরে ঢুকে গেল। ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে রাজেন্দ্রনাথ ব'ল্‌লেন—শালারা টের পেয়েছে।

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, ধরা কি মুখের কথা?

রাজেন্দ্রনাথ ব'ল্‌লেন, না রে না। বেটাদের চারখানা নৌকো আছে, যে কোন মুহূর্ত্তে ঘিরে ফেল্‌তে পারে। ভয় নেই, তোরা লাফিয়ে ডুবো সাঁতার কেটে যে যতখানি পারিস্‌ সাঁতারে ছড়িয়ে প'ড়্‌বি—অন্ধকারে শালারা টেরও পাবে না।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, নৌকোর কি হবে?

রাজেন্দ্রনাথ ব'ল্‌লেন—হবে আর কি? কাল সকালে এসে ছাড়িয়ে

নিয়ে যাবো—ব'ল্‌বো কে এসেছিল কে জানে? যদি না দেয়—জালও থাক্‌বে না, মাছ ধরাও আর চ'ল্‌বে না।

সকলেই খুশী হ'য়ে উঠ্‌লেন। হ্যাঁ, এইত তাঁদের অন্তরের কথা। আনন্দে ধীরে ধীরে দাঁড়্‌টানা পুনরায় সুরু হ'য়ে গেল।

জেলেদের নৌকোগুলো সারি সারি খাড়ির মুখে বাঁধা আছে। মিট্‌ মিট্‌ ক'রে আলো জ্বল্‌ছে।

দুটো চড়ার মধ্য দিয়ে খালের মত সরু একটা পথ আছে। বুনো ঝাউগাছ জায়গাটাকে আড়াল ক'রে রেখেছে! সেই পথ ধ'রে খালে গিয়ে পড়া যায়।

সাম্‌নেই দড়ির জাল পাতা। দশবারো সের পর্য্যন্ত মাছ ধরা প'ড়ে সে জালে। নিমেষের মধ্যে জাল থেকে দশপনেরটা মাছ ডিঙ্গিতে তুলে ফেলা হোলো। মাছগুলো পাটাতনের উপর ঝট্‌ পট্‌ ক'রতে লাগ্‌লো। তা'র প্রতিধ্বনি দিগন্তের বুকে ছড়িয়ে প'ড়্‌লো।

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, আর না—পালাই চল!

জাল ছেড়ে সব চুপ-চাপ বসে রইলেন। ডিঙ্গি স্রোতের টানে ভেসে চ'ল্‌লো। ঠিক সেই সময়ে অপর ডিঙ্গি থেকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দ ভেসে এলো।

জেলেদের দু'খানা ডিঙ্গি সে পাশে ছুট্‌লো—একখানা সাম্‌নের দিকে এগিয়ে এলো—একখানা পাহারা দিতে লাগলো ঘাঁটি।

রাজেন্দ্রনাথ চোখের নিমেষে এক পাক খাইয়ে ডিঙ্গির গতিপথ বদ্‌লে একটা ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিলেন।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, কি হ'লো রাজু?

রাজেন্দ্রনাথ ব'ল্‌লেন—চুপ্‌! শালারা টের পেয়েছে!

নৌকোটা কাছাকাছি এগিয়ে এসে সহসা থেমে গেল। কোথাও কোন শব্দ না পেয়ে এগিয়ে-যাওয়া দু'খানা ডিঙ্গিকে অনুসরণ ক'রলো। রাজেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্তমনে ডিঙ্গিখানা স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়ে হালখানা ধ'রে চুপ-চাপ বসে রইলেন।

* * * *

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। ঘাটে এসে ডিঙ্গি বাঁধল। অপর দলও ঘাটে এসে পৌছে গেছে পূর্ব্ব ব্যবস্থামত। শরৎচন্দ্র ও রাজেন্দ্রনাথ মাছগুলোর বিনিময়ে যা' কিছু পেলেন তাই নিয়ে ছুট্‌লেন অম্বুনাথের বাড়ী। লোকটা টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মর্‌তে চ'লেছে, তার উপর একটা বিবাহযোগ্যা মেয়ে। যদি মারা যায় তবে সেই ভাব্‌নাতেই সে মারা যাবে। রাজেন্দ্রনাথ ব'ল্‌লেন, তুই ডাক্তারকে খবর দে শরৎ, আমি বরং একটু এগিয়ে দখি, বেঁচে আছে কি নেই!

* * * *

কলেরার মড়ক্ লাগ্‌লো। লোক ম'র্‌ছে কিন্তু পোড়াবার লোকের যথেষ্ট অভাব দেখা দিল।

ব্রজদা হ'লেন সেই দলের পাণ্ডা।

একবার একটা মৃতদেহ নিয়ে ব্রজদা', শরৎচন্দ্র, রাজেন্দ্রনাথ ও একজন পড়্‌শী রওনা হ'লেন শ্মশানঘাটে।

শীতের রাত। ঝিম্ ঝিম্ ক'রে বৃষ্টি প'ড়্‌ছে। হু হু ক'রে বাতাস বইছে। শব নিয়ে পৌছ্‌লেন কিন্তু কাঠ পাওয়া যাবে কোথায়? এত রাত্রে একাই-বা কে নিয়ে আসবে সে-সব জিনিষপত্র? আর এই অন্ধকার রাতে মৃতদেহের কাছে থাক্‌বেই বা কে বসে?

কাঠ আন্‌তে সবাই চায়—মৃতদেহ আগ্‌লে বসে থাক্‌তে কেউ

রাজী নয়। শেষে রাজেন্দ্রনাথ রাজি হ'লেন। কথা হ'ল : যত তাড়াতাড়ি পারেন সবাই ফিরে আসবেন।

রাজেন্দ্রনাথ বসে রইলেন শ্মশানে আর এঁরা তিনজনে ফিরে চ'ল্লেন কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

বহুক্ষণ অতীত হ'য়ে গেল,—কারও পাত্তা নেই। রাজেন্দ্রনাথ আর একা বসে বসে ভিজতে পারলেন না, মৃতের দেহ-মোড়া লেপটা সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে মড়ার খাটেই একটু জায়গা ক'রে প'ড়লেন শুয়ে।

এদিকে রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। ব্রজদা'র নেশা সহসা টুটে গেল। বৃষ্টির বেগও একটু ক'মেছে। সঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে যাত্রা সুরু ক'রলেন।

গাঢ় অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। শিশুগাছটার উপরে ব'সে একটা দুষ্টু শকুনছানা কাঁদছে,—উঁঙা—উঁঙা—উঁঙা···

ব্রজদা' রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন। শরৎচন্দ্রের হাতটা চেপে ধ'রে ব'ল্লেন—কে কাঁদছে না, ঠিক ছোট ছেলের মত ?

শরৎচন্দ্র রাজেন্দ্রনাথের মুখেই শুনেছিলেন—শকুনছানার কান্না ঠিক ছোট ছেলের মত। সেই অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে ব'ল্লেন—কা'র ভূত ধরেছে এই শ্মশানে ব'সে কাঁদতে—নিশ্চয় কোন একটা শকুনছানা মায়ের জন্যে কাঁদছে।

ব্রজদা' সাহস ফিরে পেলেন। কথাটা তিনিও বহুবার শুনেছেন, কিন্তু এরূপ বাস্তবের সম্মুখীন হননি কোনদিন। ব'ল্লেন—ঠিক ব'লেছিস্ শরৎ—বেটাচ্ছেলে শকুনেরই কান্না বটে!

কয়েক পা এগিয়েই কিন্তু ব্রজদা' থম্‌কে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে যতদুর দেখা যায়, ভাল ক'রে দেখে নিয়ে, হাঁকতে সুরু ক'রলেন—রাজু—রাজু—রাজেন্দ্রনাথ—

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। ব্রজদা' ব'ল্লেন—এই বৃষ্টির মধ্যে

কেউ কি এতক্ষণ ব'সে থাকতে পারে? নিশ্চয় কোথাও কাছাকাছি একটা আশ্রয় নিয়ে থাক্‌বে!

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, তা হ'লেও তাকে খোঁজ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

আনমনে তাঁরা প্রায় মৃতদেহটার কাছ পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছেন। হঠাৎ সেই খাট্ থেকে কি একটা জিনিষ যেন খাড়া হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। নাকি সুরে ব'লে উঠ্‌লো—এঁতক্ষণ বুঁঝি তোঁদের ফেঁরার সঁময় হঁলো—

ব্রজদা' ও সকলে অনুমান ক'রে নিলেন মড়াটা নিশ্চয় দানা পেয়েছে। রাজেন্দ্রনাথও সুযোগ মত সরে পড়েছেন।

মাথার কাঠের বোঝা যে যেখানে পার্‌লেন ফেলে দিয়ে "ওরে বাপ্‌রে" ব'লে চীৎকার ক'রেই দিলেন সবাই ছুট্।

রাজেন্দ্রনাথ বিপদ বুঝে লেপটা মৃতদেহের উপর ফেলে দিয়ে, চীৎকার সুরু ক'র্‌লেন—ব্রজদা', শরৎ—আমি—আমি—রাজু! ভয় নেই, তোমরা সব ফিরে এসো।

যখন সবাই বুঝ্‌লেন—এটা রাজেন্দ্রনাথেরই কণ্ঠস্বর তখন আবার ফিরে এসে মৃতের সদ্‌গতির ব্যবস্থা সুরু ক'র্‌লেন।

* * * *

পাড়ার থিয়েটার ক্লাব—অভিনয় ক'র্‌লেন, "জনা"। শরৎচন্দ্র "জনা"র ভূমিকায় নাম্‌লেন। স্নেহময়ী মায়ের মত তিনি প্রবীরকে সাজিয়ে দিতে ব্যস্ত। সাজানো শেষ হ'লে, এক অপরূপ ভঙ্গিমায় বীর রমণীর চরিত্র ফুটিয়ে তুলে ব'লে উঠ্‌লেন, "যাও পুত্র, সম্মুখ সমরে। হাসিমুখে দেবে প্রাণ, পরাজয় গ্লানি কভু না বহিবে শিরে!"

দর্শকবৃন্দ করতালি দিল। চীৎকার ওঠ্‌লো "এন্‌কোর" "এন্‌কোর"। পরমুহূর্ত্তেই ড্রপ প'ড়ে গেল।

শরৎচন্দ্র ভেতরে গিয়ে একটা তেপায়া চেয়ারে ব'সে রাজেন্দ্রনাথের হাত থেকে কল্‌কেটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে কয়েক টান্ নিশ্চিন্ত মনে টেনে, এগিয়ে দিলেন অপর একজনের হাতে।

* * * *

ঘরখানি ছোট হ'লেও বেশ সুন্দর ক'রে সাজানো। রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বল্‌ছে মিট্ মিট্ ক'রে। সাম্‌নে খোলা একটা বই।

সুরেন্দ্রনাথ ভেতরে প্রবেশ ক'র্‌লেন। শরৎচন্দ্র চিন্তামগ্ন! সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, কি ভাব্‌ছো শরৎ?

শরৎচন্দ্রের তন্ময়তা ভেঙে গেল। ব'ললেন—এ্যাঁ? কি ব'ল্‌ছো?

সুরেন্দ্রনাথের কুতূহল বাড়্‌লো। পুনরায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—এত গভীর ক'রে কি ভাব্‌ছো? সাম্‌নে খোলা ওটা কি বই?

শরৎচন্দ্রের চিন্তাজাল তখনও ছিন্ন হয়নি। অন্যমনা ভাবে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ বই....রবীন্দ্রনাথের···খাড়া হ'য়ে বস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, কত সামান্য ঘটনা। কিন্তু সাজিয়েছেন কতই না সুন্দর ক'রে!

সুরেন্দ্রনাথ ব'ল্‌লেন—সাম্‌নে তোমার পরীক্ষা নয়?

শরৎচন্দ্র চেয়ার ছেড়ে খাটিয়ায় আশ্রয় নিলেন। ব'ল্‌লেন—দূর—ওসব আমার আর ভাল লাগে না!

* * * *

শরৎচন্দ্র টেষ্টে এলাউ হ'লেন। ভুবনমোহিনী দেবী খুশীমনেই বিপ্রদাসকে আহারে বসিয়ে সংবাদ পরিবেশন ক'র্‌লেন—বিপিন, শোরো পাশ ক'রেছে!

খেতে খেতে জবাব দিলেন বিপ্রদাস—এ পাশ তো কিছুই নয় মেজ'দি, ভাল ক'রে পড়ায় মন দিতে বলো!

ব'লছিল—ফি দিতে হবে! নাকি অনেক টাকা লাগ্‌বে—

কত?

ওকে জিজ্ঞাসা করো—ডেকে দিচ্ছি!

থাক্ আমিই জেনে নেব'থন! বাধা দিলেন বিপ্রদাস।

পরদিন খঞ্জনপুরের গুলজারিলালের বাড়ী ছুট্‌লেন বিপ্রদাস। ঘরে টাকা নেই,···যে কোন উপায়ে সংগ্রহ ক'র্‌তেই হবে!

গুলজারি ভাগলপুরে "সাইলক্" নামে সকলের কাছেই পরিচিত। সুদ দিলেই টাকা পাওয়া যায়। একটু ইতস্ততঃ ক'র্‌লেই—মাথা নাড়ে—

—নেহি হোগা সাহেব!

বিপ্রদাসবাবুকে টাকা সংগ্রহে নিরাশ হ'তে হ'ল না। প্রতিমাসে টাকায় চার পয়সা সুদে হ্যাণ্ডনোট লিখে টাকা নিয়ে এলেন।

ফি জমা দেওয়া হ'ল। শরৎচন্দ্রও উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। পরীক্ষার ফল বেরুলো—পাশ ক'রেছেন—সেকেণ্ড ডিভিশনে!···

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ১১৬-১১৭]

* * *

ভর্ত্তি হ'লেন টি. এন. জুবিলী কলেজে এফ্. এ. ক্লাসে। আচরণেও একটু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। ক্লাবে যাঁর হৈ-চৈ ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তিনিই প'ড়্‌লেন ঝিমিয়ে। কোথায় যেন তিনি একটা খেই হারিয়ে ফেলেছেন। নতুন নাটকের জোর চ'ল্‌ছে রিহার্স্যাল, শরৎচন্দ্রের এসব আর ভাল লাগে না। চুপি চুপি উঠে এসে সোজা পড়ার ঘরে গিয়ে বসেন। কখনও-বা আপন মনে কি যেন লিখে চলেন—একান্ত গোপনে।

বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের কুতূহল জাগে কিন্তু তাঁর সম্মুখীন হ'তে কেউ সাহসী হয় না।

সরস্বতী পূজার আয়োজন চ'লেছে জোর। শরৎচন্দ্র, রাজেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সহাধ্যায়ীরা ভোরে উঠে, খালি গায়ে, খালি পায়ে—শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ফুল তুলে ফিরছেন। ঠিক সেই সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে স্মিথ সাইকেলে বাসায় ফিরছিল। কাছাকাছি এসেই স্মিথের মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল। ফুলের সাজির উপর খানিকটা থুথু ফেলে দিয়ে জোরে সাইকেল চালিয়ে দিলে।

রাজেন্দ্রনাথ ও নরু চকিতে লাফিয়ে তাকে ধ'রে হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে এলেন সকলের কাছে। তারপর সবাই মিলে উত্তম মধ্যম দিয়ে দিলেন ছেড়ে।

স্মিথ সেই ছিন্ন পোষাকে ও রক্তমাখা দেহে ফিরে গেল বাসার দিকে। খবরটা চকিতে রাষ্ট্র হ'য়ে প'ড়্‌লো সহরে।

একে ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে—তার উপর প'ড়েছে কীল, লাথি, চড়! ব্যাপারটা যে কত গুরুতর তা অভিভাবক মাত্রেই উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌লেন। ছুট্‌লেন যে যার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে।

শুধু তাই নয়,—সঙ্গে সঙ্গে স্থির হ'য়ে গেল, উঠান থেকে নাক খত্ দিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখীন হ'তে হবে এবং প্রাকাশ্য সভায় সকলকে ক্ষমা চাইতে হবে।

সবাই রাজী হ'ল কিন্তু শরৎচন্দ্র, রাজেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ওঁরা পূর্ব্বেই খবর পেয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় পাড়ি দিলেন যে পাশে দু'চোখ যায়।

সারাদিন হৈ-চৈ, পেটে পড়েনি একটি মাত্রও দানা—মাঝপথে সবাই ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে প'ড়্‌লেন। রাজেন্দ্রনাথের ট্যাকে ছিল গোটা কয়েক পয়সা। সাম্‌নেও প'ড়্‌লো একটা ভুজাওলার দোকান। তিন বন্ধুতে গেলেন ভাজা ছোলা কিন্‌তে।

তাদের পাশে একটা জমাদার এসে দাঁড়ালো। ভুজাওলা তাকে ছাতু

দিতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো! রাজেন্দ্রনাথ বাধা দিলেন, প্রথমে এসেছি আমরা, তারপর জমাদারসাহেব। সুতরাং প্রথমেই আমাদের দেওয়া হোক্।

জমাদারের মেজাজটা রীতিমত গরম হ'য়ে উঠ্‌লো। তাকে উপেক্ষা—এতবড় স্পর্দ্ধা? গালাগালি সুরু ক'র্‌লো—

নরেন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্র সময় অপব্যয় ক'র্‌লেন না! জমাদারের নাকের উপর সবলে তিন চার্‌টা ঘুষি বসিয়ে দিলেন। বেচারী মাটিতে প'ড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগ্‌লো—আর তিন বন্ধু অন্ধকারে আত্মগোপন ক'র্‌লেন।

ধরা পড়ার ভয়। সাম্‌নেই পুলিশ ফাঁড়ি। অবশেষে ধানের মরাইয়ের নীচে আশ্রয় নিয়ে গভীর রাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'র্‌লেন। যখন সবাই গভীর নিদ্রামগ্ন, তখন তিনজনে ধীরে ধীরে গুহার সাধুজীর আশ্রমের দি'কে রওনা হ'লেন। (তখন সুড়ঙ্গ পথে এক সাধু আস্তানা গ'ড়ে তুলেছিলেন।)

* * * *

অমরবাবু ছিলেন সাব্‌জজ্‌। তাঁর বিনোদ ও বঙ্কু নামে দুই ছেলের সঙ্গে হ'ল শরৎচন্দ্রের আলাপ। সেই আলাপই শেষে পরিণত হ'ল বন্ধুত্বে। তাঁদের বাড়ীতেই বস্‌তো দাবা খেলার আসর। এই সময়ে একটি সাহিত্য-সভার সৃষ্টি হয়। এই সভার অধিবেশন ব'স্‌তো মাঠে-ঘাটে—অত্যন্ত গোপনে। কারণ অভিভাবকগণ এ-বস্তুটিকে মোটেই শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তেন না। সে সময়ে ভূপতিই ছিল শরৎচন্দ্রের একান্ত অনুগত ও অন্তরঙ্গ! এসময়ে একটি হাতে-লেখা পত্রিকাও বা'র করা হ'ল। নাম রাখা হ'ল "ছায়া"।

অমরবাবুর স্ত্রীকে শরৎচন্দ্র 'মাসীমা' ব'লে ডাক্‌তেন। তিনিও শরৎচন্দ্রকে নিজের ছেলের মত স্নেহ ক'র্‌তেন। যখন অমরবাবু তাঁকে

তৃতীয় পক্ষে বিয়ে ক'রে নিয়ে এলেন, তখন তাঁর সপত্নী পুত্রদের বয়স প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ। স্বামীর ঘরে পা দিয়েই প্রথমে তিনি সপত্নী পুত্রদের একে একে কোলে তুলে নিয়ে ব'ল্‌লেন, তোমাদের যা' যা' চাই কোন কিছু লুকিয়ো না বাবা—তোমরা আমার ছেলে! এমনই স্নেহময়ী ও পরমা প্রকৃতির রমণী ছিলেন তিনি।

তাঁর গর্ভে দুটি সন্তান জন্মেছিল! প্রথমটির নাম ভূপতি, দ্বিতীয়া হ'ল কন্যা—নাম পার্ব্বতী!

* * * *

পার্ব্বতী সাব্‌জজের মেয়ে। নানা জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছে বাবার সঙ্গে। বয়সও হ'য়েছে চোদ্দ কি পনেরো। মোটামুটি দেখ্‌তে সুশ্রীই বলা চলে। শরৎচন্দ্র প'ড়্‌লেন তার প্রেমে। আর ভূপতি বাহকের স্থান অধিকার ক'রে আদান-প্রদান ক'র্‌তে লাগ্‌লো উভয়ের চিঠিপত্তর।

শরৎচন্দ্রের প্রতি পার্ব্বতীর একমাত্র আকর্ষণ ছিল—তাঁর গান ও তাঁরই লেখা ছোট ছোট গল্প। শরৎচন্দ্রের প্রথম সাহিত্যিক জীবনের সেই ছিল প্রধান দরদী পাঠক ও পৃষ্ঠপোষক। সে নিজেও লিখ্‌তো চমৎকার কবিতা।

এই সময়ে ভুবনমোহিনী ইহজগতের মায়া কাটিয়ে পরলোক গমন ক'র্‌লেন। মতিলালবাবু শ্বশুরবাড়ী ত্যাগ ক'রে খঞ্জনপুরে একটা দোকানের পিছনের বাড়ী ভাড়া ক'রে উঠে এলেন। সেখান থেকে অমরবাবুর বাসা আরও কাছাকাছি।

পার্ব্বতীর বিয়ের প্রায় ঠিক্। পার্ব্বতীর চোখের জল আর থামে না। একদিন রাত্রে সমস্ত লজ্জা ত্যাগ ক'রে ব'ল্‌লো, আমার কি হবে শরৎদা?

বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করার সখ তাঁর ছিল প্রচুর, কিন্তু সামর্থ্যে—

তাঁদের সম্মুখীন হওয়ার মত অবস্থা তাঁর নেই। নিরুপায়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ল্‌লেন, এদের সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি যে নেই, তুমি তো' তা ভাল ক'রেই জান পারু!

পার্ব্বতী উত্তর দিল না। নীরবে চোখের পাতাগুলো মুছে, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল একা।

তারই কয়েক দিন পরে অমরবাবু বদ্‌লি হয়ে চ'লে গেলেন চুঁচ্‌ড়ায়। সেখানেই পার্ব্বতীর বিয়ে হ'য়ে গেল।

শরৎচন্দ্র ভেঙে প'ড়্‌লেন হতাশায়! জীবন তাঁর শেষ হ'য়ে গেছে ব'লে মনে হ'ল। ডুবে রইলেন মদে।

* * * *

কিছুদিন পরে অমরবাবু পুনরায় ভাগলপুরে ফিরে এলেন। পার্ব্বতীও এলো সঙ্গে।— আশা ক'রেছিল শরৎদা নিশ্চয় তার একবার খোঁজ নিতে আস্‌বে। কিন্তু একদিন নয়, এক সপ্তাহ কেটে গেল কোন খোঁজ নেই, খবরও নেই তার শরৎদার! পার্ব্বতী নিজেই ছুটে এলো শরৎচন্দ্রের বাসায়।

মুখে তাঁর সে লাবণ্য নেই, শরীরটাও গেছে ভেঙ্গে। ঘরের একটা কোণে ভাঙা একটা বাক্সের মধ্যে স্তূপাকার করা মদের বোতল। একটা ছেঁড়া চট টাঙিয়ে তার কৌলিন্য রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা চ'লেছে। ঘুর্‌ছেন ফির্‌ছেন আর একবার ক'রে চুমুক দিচ্ছেন বোতলে। পরমুহূর্ত্তে ফিরে এসে ব'স্‌ছেন সেই প্রিয় তেপায়া চেয়ারটায়। ডুবে যাচ্ছেন গভীর ভাবে খাতা ও কালিকলমের মধ্যে!

ঘরটির শ্রী গেছে মলিন হ'য়ে। জঞ্জাল ও ধূলোতে ভ'রে গেছে সব। পার্ব্বতী নিজেকে আর ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লো না। একেবারে সাম্‌না-সাম্‌নি এসে দাঁড়ালো। চোখে তার জল। ব'ল্‌লো—তুমি একি ক'র্‌ছো শরৎদা?

শরৎচন্দ্র সচকিত হ'য়ে মুখ তুলে তাকালেন। ঠোঁটের কোণে ফুটে

উঠ্‌লো হাসির ম্লান একটি ছায়া। ব'ল্‌লেন—এ ছাড়াও ত আমার কোন সম্বল নেই পারু!

পার্ব্বতী আবেগে তাঁর হাতখানা চেপে ধ'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, কেন?

শরৎচন্দ্র তেমনি ম্লান একটু হাসি হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—হয়ত প্রতারণার মধ্যে একটা তীব্র বন্য আনন্দ আছে, কিন্তু নিজেকে ফাঁকি কেমন ক'রে দেবো বলতো?

পার্ব্বতী কান্নায় ফেটে প'ড়্‌লো। ব'ল্‌লো—তাই ব'লে নিজের সর্ব্বনাশ এমনি ক'রে ডেকে আন্‌বে?

শরৎচন্দ্র পুনরায় হাস্‌লেন। সে হাসি ঝরা-ফুলের মতই সৌরভ ও শ্রীহীন। ব'ল্‌লেন—মানুষের বেঁচে থাকার পিছনে একটি আশা থাকে লুকিয়ে, কিন্তু যার সে আশাটুকুও গেছেচিরতরে মুছে—তার কাছে এ জগতের ভালমন্দের মূল্য কতটুকু পারু? বেঁচে থাকাটাই কি তার কাছে বেশী বিড়ম্বনা নয়?

শরৎচন্দ্রের বাহু দু'খানার মধ্যে মুখখানা চেপে ধ'রে পার্ব্বতী ব'ল্‌লো, তুমিই বল শরৎদা,—আমার অপরাধ কোথায়?

শরৎচন্দ্র উত্তর খুঁজে পেলেন না।

পার্ব্বতী ব'ল্‌লো—বিশ্বাস করো শরৎদা, তুমি দুঃখ পেলে, তোমার এতটুকু কষ্ট দেখ্‌লে যে আমার অন্তরটা ফেটে যায়! বল, তুমিই বল—আমি কি ক'র্‌তে পারি তোমার জন্যে?

শরৎচন্দ্র নির্ব্বাক। শুধু রইলেন পার্ব্বতীর মুখের দিকে তাকিয়ে। পার্ব্বতীও মুখ তুলে তাকালো। ব'ল্‌লো—আমার মুখ চেয়ে কি তুমি নিজেকে সবল ক'রে তুল্‌তে পারো না?

বুক ভেদ ক'রে নেমে এলো—আগুনের হল্কারমত জ্বালাময়ী চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস। ব'ল্‌লেন—চেষ্টা ক'র্‌বো পারু।

*   *   *   *

পার্ব্বতী সহ্য ক'র্‌তে পারে না তার শরৎদার এই দুঃসহ জীবনযাত্রা-প্রাণালী। ভুলে গেল লোকলজ্জা, ভুলে গেল সামাজিক আচার-ব্যবহার। গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে,—খিড়কীপথে সুরু ক'র্‌লো যাওয়া-আসা।

নিজের হাতে সাজিয়ে দিল টেবিল। পরিষ্কার ক'র্‌লো ঘরের জঞ্জাল। নিজের হাতের তৈরী খাবার, রাখলো সাজিয়ে।

শরৎচন্দ্র নিজেকে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা ক'র্‌লেন কিন্তু শৃঙ্খল-ভাঙ্গা চলার গতি তাঁর রোধ মানলো না! স্রোতের মুখে চ'ল্‌লেন তিনি ভেসে।

* * *

কয়েক মাসের মধ্যে পার্ব্বতীর স্বামীর মৃত্যু-খবর এসে পৌঁছ্‌লো। স্নান ক'রে সিঁদুর মুছে থান কাপড় পার্‌লো পার্ব্বতী।

শরৎচন্দ্র ও ভূপতি বাধা দিলেন—এইটুকু মেয়ে কি প'র্‌বে থান্? না, না ও শাড়ীই পরুক—গয়নাও থাক্ গায়ে!

আড়ালে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পার্ব্বতীর দেখা হ'ল। ব'ল্‌লো—তুমি কি, বলতো? লোকে কি ভাব্‌বে? কি ব'ল্‌বে?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—লোকের কথায় কি আসে-যায় বলতো? তুমি প'র্‌বে—আমার ভাল লাগে—বাস্, তার বেশী কিছু আমি বুঝিনে!

পার্ব্বতী কথাটা মনে-প্রাণে সমর্থন ক'র্‌লেও—আজন্মের সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত ক'র্‌তে পার্‌লো না। ব'ল্‌লো—অন্যায় আদেশ তুমি কারো না—রাখ্‌তে আমি পার্‌বো না।

* * * *

পার্ব্বতী স্বামীর শ্রাদ্ধে ব'স্‌লো। একটা বোল্‌তা এসে সহসা হাতে হুল্ ফুটিয়ে দিয়ে গেল। যন্ত্রণায় পার্ব্বতী ছট্‌ফট্ করে। পাশের লোকেরা ছুটে এলো। সহানুভূতি জানালো—আহা!

ভূপতি হাতখানা তুলে নিয়ে ব'লেন, দেখি, হুল্‌টা এখনও ফুটে আছে না কি?

পার্ব্বতী হাতখানা জোরে ছিনিয়ে নিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে ছুটে গেল। সযত্নে তিনি হুলটি বার ক'রে স্পিরিটে তুলো ভিজিয়ে ক্ষতস্থানটি বেঁধে দিলেন। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে চোখের পাতাগুলো তার মুছে দিতে দিতে সমবেদনার সুরে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—আর জ্বালা ক'র্‌ছে? পার্ব্বতীর মুখে হাসি ফুট্‌লো। মাথা দুলিয়ে উত্তর দিল—না!

* * * *

যত দিন যায়, বোতলের সংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বাড়ে। কলমও চলে দ্রুত। বিরহ-বেদনা-কাতর শরৎচন্দ্র শেষ ক'র্‌লেন—চন্দ্রনাথ, দেবদাস, অনুপমার প্রেম, অভিমান ইত্যাদি—আরও অনেক বই।...

পার্ব্বতী বিধবা হওয়ার পর—শরৎচন্দ্রের মনে নোতুন আশার সঞ্চার হ'ল। মনে মনে স্থির ক'রে ফেল্‌লেন—বিধবা বিবাহ ক'র্‌বেন। পার্ব্বতী কিন্তু সায় দিল না। ব'ল্‌লো—নির্ম্মাল্য ফুলে কি দেবতার পূজা করা চলে? না হ'য়েছে কোনদিন?

শরৎচন্দ্র কিন্তু তখনও আশা ছাড়্‌তে পার্‌লেন না। ব'ল্‌লেন—বাজে—ওসব বাজে।

* * * *

পার্ব্বতীর কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। সময়মত ঠিক আসে, ঠিক যায়, কোথাও কোন একটু ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। যা—যা প্রয়োজন, যা তিনি ভালবাসেন, যা পছন্দ করেন—সবই সাজিয়ে রেখে চ'লে যায় নীরবে।

এফ্. এ. পরীক্ষার দিন এগিয়ে এলো। পড়াশুনা শরৎচন্দ্রের কিছুই তৈরী হয়নি। ঠিক সেই সময় নোটিশ এলো—ছেলেদের "টেষ্ট" দিতে হবে। এতদিন এসবের বাঁধাধরা নিয়ম কিছু ছিল না। খুশীমত পরীক্ষা দেওয়াও চ'ল্‌তো—শরৎচন্দ্র প'ড়্‌লেন বিপদে।

ছেলেদের নিয়ে দল পাকাতে সুরু ক'র্‌লেন—পরীক্ষা দেবেন না কেউ!

কিন্তু পরীক্ষার দিনে দেখা গেল—একা শরৎচন্দ্র ছাড়া সবাই মাতৃপিতৃ ভক্তির চরম পরিচয় দিতে চ'লেছেন।

বন্ধুবান্ধব যাঁরা কথা দিয়েছিলেন—তাঁরা তাঁকে আশ্বাস দিলেন এ ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিল না—পাশ তারাও ক'র্‌তে পার্‌বে না—যদি না তিনি সাহায্য করেন। পরে অবশ্য তাঁরাই একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে—তাঁকেও টেষ্টে "এলাউ" করার ব্যবস্থা ক'র্‌বেন।

শরৎচন্দ্র হোষ্টেলে ব'সে পরীক্ষা-প্রশ্নের উত্তর লিখে দিতে সুরু ক'র্‌লেন। বন্ধুর দল সেইগুলো খাতায় নকল ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লো।

কথাটা যে কোন প্রকারেই হোক্ অধ্যক্ষের কানে গিয়ে উঠ্‌লো। তিনি ঘরের দরজা ফাঁক ক'রে দেখ্‌লেন—শরৎচন্দ্র গড়গড়ায় তামাক টান্‌ছেন আর বই দেখে প্রশ্নের উত্তর লিখ্‌ছেন।

ক্রোধে দিশেহারা হ'য়ে তিনি ভেতরে ঢুক্‌তেই শরৎচন্দ্র ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, আপনি এখানে কেন, স্যার?

অধ্যক্ষ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন—"নাউ আই সি!" এবং বেরিয়ে গেলেন সেই মুহূর্ত্তে।

পরীক্ষা বন্ধ হ'য়ে গেল। শরৎচন্দ্র ও মানিমামাকে "রাষ্টিকেট্" করা হ'লো। মনিমামা ক'ল্‌কাতায় এসে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ক'র্‌লেন। এপাশে অধ্যক্ষম'শায় শেষ পর্য্যন্ত সকল ছেলেকেই "সেণ্ট আপ্" ক'র্‌লেন। শরৎচন্দ্রকেও পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দিলেন কিন্তু সময় এতই সংক্ষেপ যে টাকা সংগ্রহ তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌লো না।

সংসারের অবস্থা তখন অতীব সঙ্গীন। শরৎচন্দ্র বাধ্য হ'য়েই বানেলি ষ্টেটে শিবশঙ্কর সাহুর অধীনে মুন্সির কাজ নিলেন। কাজটা ছিল বাইরে বাইরে শিবশঙ্করবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরা। তিনি সে কাজটা হাতছাড়া ক'র্‌লেন না। যদিও তখন তিনি পার্ব্বতীর ধ্যানে মগ্ন; তাকে একদিন চোখে না দেখ্‌লে স্থির থাক্‌তে পারেন না।

শরৎচন্দ্র কিন্তু কোন কাজেই পিছ্-পা ছিলেন না। কাজের অছিলায় প্রায়ই তিনি শিবশঙ্করবাবুর ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আস্‌তেন কাছারীতে। অসুস্থতার দোহাই দিয়ে কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে ফিরে যেতেন কর্ম্মস্থলে। অবশ্য তিনি কবে বা কখন আস্‌বেন—তা একমাত্র পার্ব্বতী ছাড়া আর অন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি সহসা জান্‌তে পার্‌তো না।

একদিন মিঃ সাহু একটি ফাইল সঙ্গে নিতে ভুলে গেলেন। সে ভুলটা তার নিজের কি শরৎচন্দ্রের ইচ্ছাকৃত সে কথা আলোচনা না করাই যুক্তিসঙ্গত। তবে এরূপ ভুল মিঃ সাহু নিশ্চয়ই ক'র্‌তেন। শরৎচন্দ্র সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'র্‌তেন।

সেখান থেকে সদর কাছারী প্রায় দশ-বারো মাইল দূর অথচ সে ফাইলটা না হ'লেও কাজ শেষ হয় না। ব'ল্‌লেন, এখন কি উপায় মিঃ চ্যাটার্জ্জী?

শরৎচন্দ্র ত এই সুযোগই খুঁজ্‌ছিলেন। ব'ল্‌লেন—ঘোড়াটা দিন, ফাইল এনে হাজির ক'রে দেবো।

মিঃ সাহুর ঘোড়া নিয়ে শরৎচন্দ্র সেই শীতের সন্ধ্যায় রওনা হ'লেন সদর কাছারীর দিকে।

অন্ধকার পথ। উত্তুরে হাওয়া একটু বেগে বইতে সুরু ক'রেছে। শরৎচন্দ্র নদীর ধার ধ'রে চ'লেছেন ধীরে ধীরে। ঘোড়া যদি না ছুটে, সহরে পৌঁছতে রাত প্রায় শেষ হ'য়ে যাবে। শরৎচন্দ্র জোরে চাবুক কষালেন। ফলটা ফ'ল্‌লো বিপরীত। ঘোড়াটা লাফিয়ে প'ড়্‌লো নদীর জলে।

এতখানির জন্য শরৎচন্দ্র প্রস্তুত ছিলেন না। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে জল থেকে উঠে পুনরায় ঘোড়ায় চ'ড়ে বস্‌লেন। এবার ঘোড়াটিও রীতিমত জব্দ হ'লো। বাইরের কন্‌কনে হাওয়ায় না ছুটেও আর উপায়

নেই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি পার্ব্বতীদের বাড়ীর সাম্‌নে এসে পৌছ্‌লেন।

পার্ব্বতী জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল। শরৎচন্দ্রকে দেখেই খুশী মনে নীচে নেমে এলো। তিনিও ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালেন।

সাম্‌নে এসেই পার্ব্বতী চম্‌কে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লে—একি? এত রাতে চান ক'রে এলে যে?

শরৎচন্দ্র খুশীভরা হাসি হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—সবই কপাল পারু! নইলে ঘোড়াটা প'ড়্‌লো জলে ঝাঁপিয়ে?

পার্ব্বতী চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। লোক-লজ্জার কথা ভুলে গেল। ব'ল্‌লো—আর একটি মিনিটও এখানে নয়। চলো ওপরে!

বাড়ীর দাস-দাসী থেকে আরম্ভ ক'রে সকলেই গভীর নিদ্রা-সুখে মগ্ন। শুধু দু'টি প্রাণী উঠে এলেন নিঃশব্দে। পার্ব্বতী নিজের হাতে পোষাক বদ্‌লে দিল। তারপর ধীর পদক্ষেপে উভয়েই নীচের খাবার ঘরে প্রবেশ ক'র্‌লেন।

মোমের বাতিটা জ্বালিয়ে আসন পেতে দিল পার্ব্বতী। ব'ল্‌লো—একটু বসো—খাবারগুলো গরম ক'রে দিই।

শরৎচন্দ্র বাধা দিয়ে ব'ল্‌লেন, আর মোটেই দেরী সইছে না। পেটের নাড়ীভুঁড়িগুলো জ্বলে যাচ্ছে,—কখন খেয়েছি সেই সকালে—দাও কিছু ত' অন্ততঃ পেটে দিই! একটু থেমে ব'ল্‌লেন, কিন্তু আমি যে আস্‌বো, তোমায় তা' কে জানিয়ে দিল পারু?

পার্ব্বতী হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—আমার মন!

শরৎচন্দ্র আর দ্বিতীয় প্রশ্ন ক'র্‌তে সাহসী হ'লেন না। কারণ ভালবাসার রীতিই ত' এই! নিঃশব্দে আহার শেষ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন।

পার্ব্বতী বাতিটা এগিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লো—সবই সাজিয়ে রেখে এসেছি। এবার শুয়ে পড়্‌গে যাও। অনেক রাত হ'লো!

শরৎচন্দ্র মৃদু হাসলেন। ব'ল্‌লেন—জানি পারু, তুমি থাক্‌তে কোন অভাবই হ'তে পারে না। সহসা তার মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ল্‌লেন—একি? এত শীতে গায়ে তোমার কোন গরমের কাপড় নেই কেন? ঠাণ্ডা লেগে অসুখ ক'র্‌বে যে!

পার্ব্বতী হাস্‌লো। ব'ল্‌লে—ভয় নেই, মেয়েরা এত শীগ্‌গির মরে না!

শরৎচন্দ্রও উত্তরে হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—তা যা' বলেছো? মেয়েরাই এ জগতে অমর—মরে কেবল আমাদের মত হতচ্ছাড়া পুরুষগুলো! গায়ের চাদরখানা ভাল ক'রে মুড়ি দিতে গিয়ে সচেতন হ'য়ে উঠ্‌লেন। মনে পড়ে গেল চাদরখানা ত' তখন সে নিজেই তাঁর গায়ে সযত্নে মুড়ে দিয়েছিল, লজ্জিত হ'য়ে পড়্‌লেন সেই মুহূর্ত্তে। ব'ল্‌লেন—কিছুই ত' বলা হ'লো না—একটু তাড়াতাড়ি যেয়ো কিন্তু কাল সকালে!

পার্ব্বতী উত্তর দিল না—হাস্‌লো একটু। শরৎচন্দ্র ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। পার্ব্বতী দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল নিঃশব্দে।

* * *

পার্ব্বতী এসেই ঘুম ভাঙ্‌লো। বেলা তখন ন'টা। চায়ের কাপটি সাম্‌নে ধরে ব'ল্‌লো—আচ্ছা ঘুমোতে পারো কিন্তু!

শরৎচন্দ্র লেপটা পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে ব'স্‌লেন। হাত থেকে কাপটি নিয়ে চুমুক দিয়ে ব'ল্‌লেন—ঘুম আর হ'ল কই? তোমার স্বপ্নে ত' রাতটা কেটে গেল জলের মত! তা যাক্—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চেয়ারটা টেনে বসো!

পার্ব্বতী চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো—অন্য সময়ে আসবো বরং।

শরৎচন্দ্র খপ্ করে তার আঁচলখানা চেপে ধ'র্লেন। ব'ল্লেন—যাবো ব'ল্লেই কি যাওয়া যায় ? যাও ত' এখন দেখি !

পার্ব্বতী কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ ক'র্লো, যাও—কি হ'চ্ছে ?

শরৎচন্দ্র নির্ব্বিকার। ব'ল্লেন—কোন কথা নয়—বসো চুপ ক'রে।

পার্ব্বতী ঠোঁট চেপে, ফিক্ ক'রে হেসেই মুখ ফিরিয়ে নিল। ভাল মানুষের মত চেয়ারটায় চেপে ব'স্লো।

নীরবে কেটে গেল অনেকক্ষণ। পার্ব্বতী চঞ্চল হ'য়ে উঠ্লো! ব'ল্লো—বেলা অনেক হ'ল, মা হয়ত খোঁজাখুঁজি ক'র্বেন !

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—খোঁজেন ব'লো—আমার কাছে এসেছিলে !

পার্ব্বতী উঠে দাঁড়ালো! ব'ল্লো—চান করো! আমি ততক্ষণ খাবারের ব্যবস্থা করিগে! কাল রাতে খাওয়া তোমার মোটেই ভাল হয়নি !

শরৎচন্দ্র মৃদু হাস্লেন। ব'ল্লেন—শাক দিয়ে আর মাছ ঢেকো না—তার চেয়ে বরং বলো ভয় ক'র্ছে !

পার্ব্বতী হেসে ফেল্লো। ব'ল্লো—ভারী ত বীরপুরুষ, তাকে আবার ভয়! চান ক'রে তৈরী হ'য়ে থাকো, এখুনি আস্ছি আমি ফিরে—বুঝ্লে !

পার্ব্বতী দাঁড়ালো না। বেরিয়ে গেল। শরৎচন্দ্র তার গমন পথের দিকে রইলেন তাকিয়ে।

* * * *

পার্ব্বতী সত্যই আধ-ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এলো। কড়া শাসনের সুরে ব'ল্লো—এখনও বসে আছো ? একটি মুহূর্ত্তও দেরী চ'ল্বে না—যাও !

শরৎচন্দ্র শান্ত শিশুর মত গঙ্গার জলে ডুব দিয়ে উঠে এলেন। মাথায়-গায়ে জল।

পার্ব্বতী কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ ক'র্‌লো—না তোমার জন্যে সত্যিই একটা লোক চাই শরৎদা,—নইলে—

পার্ব্বতীর কথা শেষ হ'ল না। মাঝ পথেই খেই হারিয়ে ফেল্‌লো। তোয়ালেটা নিয়ে নিজেই তাঁর মাথা মুছে দিল। ব'ল্‌লো—বলি, বরং একটা দেখে-শুনে বিয়ে করো।

শরৎচন্দ্র হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, কনে যে রাজী হয় না!"

* * * *

চাকরীর বাঁধন শরৎচন্দ্রের ভাল লাগে না। তবুও তাঁকে সে কাজে লেগে থাক্‌তে হয়—নইলে সংসার যে অচল! ছোট ভাই-বোনেরা যে উপবাসে শুকিয়ে মরে!

* * * *

যখন সহরে থাকেন ক্লাবে যোগ দেন—কখনও বা দু'চার কলম লেখেন।

আলিবাবার অভিনয় হবে ক্লাবে স্থির হ'য়ে গেল। শরৎচন্দ্র সময়ের অভাবে নিলেন মুস্তাফার পার্ট। অভিনয় তাঁর এত স্থন্দর হ'ল যে সকলেই প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো।

অভিনয় শেষ হ'ল, কিন্তু শরৎচন্দ্রের খোঁজ পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সন্ধান মিল্‌লো ড্রেনের পাশে অচৈতন্য অবস্থায় আছেন প'ড়ে।

ধরাধরি ক'রে অমরবাবুর বাড়ীতে নিয়ে আসা হ'ল গোপনে। নীরোদ ও ভূপতি ছাড়া আর কেউ জান্‌লো না। রাখা হ'ল তাঁকে পরিত্যক্ত একটা গোয়ালঘরে।

পার্ব্বতী সেই গোয়ালঘরকে দেবমন্দিরে পরিণত ক'রে ফেল্‌লো

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। তারপর সুরু হ'ল পরিচর্য্যা। সকলেই ভয়ে অস্থির—যদি জ্ঞান আর না ফিরে ?

পার্ব্বতী কিন্তু অচল ও অটল। তার আপ্রাণ সেবায়, তিন দিন পরে শরৎচন্দ্রের জ্ঞান ফিরে এলো।

সবাই খুশী হ'ল। ব'ল্‌লো—হ্যাঁ, সাধনা বটে তোর পারু !

* * * *

ভুবনমোহিনীদেবী একটি কন্যা-সন্তান প্রসবের পর মারা গিয়েছিলেন। সেই শিশু-মেয়েটিকে মানুষ ক'রে তোলার জন্যে একটি ওয়েট্ নার্স রাখা হ'ল।

মধ্যম প্রভাস যথেষ্ট বড় হ'য়েছে। ছোট প্রকাশ, তখনও ছেলে-মানুষ। সামান্য একটা বিষয় নিয়ে ওয়েট্ নার্স (মোতিয়া) একদিন তাকে রীতিমত শাসন ক'র্‌লো।

কথাটা শরৎচন্দ্রের কানে গিয়ে উঠ্‌লো। তিনি ক্ষুব্ধ হ'য়ে প্রতিবাদ ক'র্‌লেন মতিলালবাবুর কাছে,—আপনার প্রশ্রয়েই ব্যাপারটা এতখানি গড়িয়েছে, ওকে সাবধান ক'রে দিন।

মতিলালবাবু এ বিষয়টার ওপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ ক'র্‌লেন না। ব'ল্‌লেন—ছেলে দুষ্টুমি ক'র্‌লে শাসন ক'র্‌বে না ? তোর মা কি তোদের শাসন ক'র্‌তো না ?

শরৎচন্দ্র ক্রোধে দিশেহারা হ'য়ে প'ড়্‌লেন। ব'ল্‌লেন, মা আর ওয়েট নার্স কখনও এক হ'তে পারে না। যদি এর একটা বিহিত না করেন, আমার সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক থাক্‌তে পারে না।

মতিলালবাবু নীরব রইলেন। শরৎচন্দ্র গৃহত্যাগ ক'রে অমরবাবুর বাসায় এলেন। পার্ব্বতীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁর চোখ দুটো লাল, মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে।

পার্ব্বতী সভয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। ভূপতিও ঘরের ভেতরে ছিল। কি একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে গেল।

পার্ব্বতী ফিরে এলো। এক হাতে তার খাবারের ডিস্, অপর হাতে এক কাপ চা। ব'ল্‌লো—মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে, এগুলো মুখে দিয়ে নাও।

শরৎচন্দ্র পার্ব্বতীর অবমাননা ক'র্‌লেন না। নিঃশব্দে সবটুকু শেষ ক'রে ব'ল্‌লেন, তোমাদের কাছে বিদায় নিতে এলাম পারু!

কণ্ঠস্বরে হতাশা ও অবসাদ স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। পার্ব্বতী শঙ্কা বোধ ক'র্‌লো। অনেকরূপে শরৎচন্দ্রকে দেখেছে সে কিন্তু এমন বৈরাগী শরৎচন্দ্রকে কোনদিন দেখেনি। মুখে হাসি ফোটানোর একবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'র্‌লো। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, হ'ল কি?

শরৎচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। ব'ল্‌লেন "ভাগলপুর ইজ্ টু হট্ ফর্ মি।" এখানে থাকা আর আমার হয়ত সম্ভব হবে না, তাই তোমাদের সঙ্গে শেষ দেখা ক'র্‌তে এলাম।—শেষের কথাগুলো অস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। একটু থেমে ব'ল্‌লেন, ভাগ্য কোথায় টেনে নিয়ে যাবে জানি না—তবে তোমাদের আমি কোনদিন ভুল্‌তে পার্‌বো না!

ঝড়ের মত শরৎচন্দ্র বেরিয়ে প'ড়্‌লেন।

ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝ্‌তে না পার্‌লেও পার্ব্বতী অনুমান ক'রে নিল একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে, এর শেষ কোথায় কে জানে? চোখের পাতাগুলো তার একটা অজানা আশঙ্কায় সিক্ত হ'য়ে ওঠ্‌লো। মনে হ'ল পায়ের তলা থেকে বুঝি মাটিগুলো সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

পার্ব্বতী সশব্দে পড়ে গেল মেঝের ওপরে। হাতের পেয়ালাটা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল। মা ছুটে এলেন পাশের ঘর থেকে।

চোখে-মুখে জল ও কিছুক্ষণ বাতাস করার পর তার জ্ঞান ফিরে এলো। পাশে চেনা-অচেনার ভীড়। চোখ মেলে চাইলো। কিন্তু যাঁকে

সে খুঁজে—সন্ধান তার পাওয়া গেল না। চোখের পাতাগুলো পুনরায় রুদ্ধ হ'য়ে গেল। মা শঙ্কিতকণ্ঠে মৃদু স্বরে ডাক্‌লেন, পারু—ও পারু, কি হ'য়েছে মা?

পার্ব্বতী উত্তর দিল না। মা'র কোলে মুখখানা লুকিয়ে নিজেকে সংযত ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লো কিন্তু বাঁধন-হারা অশ্রু কোন বাঁধনই মান্‌তে চাইলো না, ঝরে প'ড়্‌লো আপন গতির ছন্দে!

* * * *

শরৎচন্দ্র নাগা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পাড়ি দিলেন মজঃফরপুর। হাতে সবুজ রঙের সার্লির সাইকোলজি!

ধর্ম্মশালার সাম্‌নের বাড়ী থেকে গভীর রাত্রে কে একজন বেহালা বাজাচ্ছিল। সে সুরে শরৎচন্দ্র তন্ময় হ'য়ে ছাদে উঠে গেলেন। মিহি গলায় ধীরে ধীরে গাইতে সুরু ক'র্‌লেন, "যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা······"

গান শেষ হ'ল। বেহালাও থেমে গেল।

পরদিন উভয়ের মধ্যে আলাপ হ'লো। বেহালা বাদকের নাম নিশানাথ। তিনি ছিলেন ঠিক্ তাঁরই মত ছন্নছাড়া, ভবঘুরে, পরপোকারী নিঃস্বার্থ যুবক। সম্বল তাঁর একমাত্র বেহালা। তারই সুর ও লয়ে তিনি মগ্ন! কয়েক মিনিটের মধ্যে মৌখিক আলাপ গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হ'লো। তিনিই চেষ্টা ক'রে তাঁর মামাতো ভাই শেখরবাবুর বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

শেখরবাবু অনুরূপা দেবীর স্বামী। তখন তিনি মজঃফরপুরে ওকালতি ক'র্‌ছিলেন। ছিলেন গানের পরম ভক্ত। যখন নিশানাথের মুখে শুন্‌লেন, ছেলেটি শুধু বাঙালীর ছেলে নয় একজন বিশিষ্ট গায়ক—বিশেষ ক'রে কণ্ঠটি তাঁর এমনই মধু ঢালা যে, সে সুর একবার

কানে গেলে সহসা ভোলা যায় না—তিনি সেই মুহূর্ত্তেই রাজি হ'য়ে গেলেন। পরিচয় অবশ্য যেটুকু পেলেন তাতেই তাঁকে তিনি পরিচিত ব'লে মেনে নিলেন। কারণ, ইতিপূর্ব্বে অনুরূপাদেবী ভাগলপুরের এক শরৎচন্দ্রের কথা তাঁকে ব'লেছিলেন—তিনি একজন উদীয়মান প্রথম শ্রেণীর লেখক।

নিশানাথ ব'ল্লেন—ইনি ভাল লিখ্‌তেও পারেন।

শেখরবাবুর কাছে এইটিই হ'ল বড় ট্রেডমার্ক। ব'ল্লেন, তুমি তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো নিশানাথ!

পরে তাঁর অনুমান সত্য হওয়ায় তিনি খুব খুশী হ'য়ে উঠ্‌লেন। নিশানাথ তাঁকে একটুকুও যে বাড়িয়ে বলেননি, তার পরিচয়ও তিনি পেলেন। সত্যই তাঁর কণ্ঠস্বরটি অপূর্ব্ব। তিনি প্রতি রবিবার তাঁর বৈঠকখানায় একটি গানের মজ্‌লিস্ বসাতে সুরু ক'র্‌লেন। সেখানে ক্রমে মজঃফরপুরের বিশিষ্ট লোকেরাও জমা হ'তে লাগ্‌লেন। সকলেই সেই নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ ক'রে ফিরে যেতেন দ্বিপ্রহরে। ফলে, শরৎচন্দ্র শীঘ্রই পরিচিত হ'য়ে উঠ্‌লেন সকলের কাছে। কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও গেল জুটে। তার মধ্যে প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য (মুখোপাধ্যায়) ম'শায়ও ছিলেন একজন।

রসিক দত্তের স্ত্রী টায়্‌ফয়েডে আক্রান্ত হ'লেন। সেবা-শুশ্রূষার লোকের একান্ত অভাব। কথাটি শরৎচন্দ্র ও নিশানাথের কানে এলো। উভয়েই ছুট্‌লেন সেবা ক'র্‌তে।

অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে বাঁচানো গেল না। মৃতদেহ তাঁদেরই সৎকার ক'র্‌তে যেতে হ'ল।

ভাগলপুর ত্যাগের পর শরৎচন্দ্র নেশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। কারণ, তখন তাঁর যা অবস্থা তা'তে কোন রকমে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া বিলাসিতা কিংবা নেশার অবসর সেদিন ছিল না। কিন্তু

শ্মশানঘাটে গিয়ে সহসা সেই সুযোগ মিলে গেল। অন্যান্য শববাহকদের নেশার রসদ যোগাতে হ'ল রসিকবাবুকে। শরৎচন্দ্র সেই সুযোগে একটি বোতল রাখ্‌লেন সরিয়ে।

যে দিন তাঁর মন-মেজাজ ভাল না থাক্‌তো, সেইদিন সকলের অজ্ঞাতে একটু-আধটু নেশা সুরু ক'র্‌লেন পুনরায়। একদিন একটু মাত্রা বেশী হ'য়ে গেল। শরৎচন্দ্র উঠানে বসে বাল্‌তির জলে মাথা ধুচ্ছেন। ঠিক সেই সময়েই শেখরবাবুর বাবা ঘরে ফিরে এলেন। তিনি ব'ল্‌লেন—সত্যই বড় গরম প'ড়েছে, তুমি স্বচ্ছন্দে গা' ধুয়ে ফেল্‌তে পারো শরৎ!

তিনি তখন এ-বাড়ীর একজন ছেলের মত হ'য়ে গেছেন। উত্তর দিতে গিয়ে কথা তাঁর গেল জড়িয়ে।

কারণটা ঠিক্ স্পষ্ট না হ'লেও তিনি অনুমান ক'রে নিলেন—শরৎচন্দ্র নিশ্চয় নেশা ক'রে থাক্‌বে, নইলে তাঁর মত লাজুকে ছেলে সহসা মুখের ওপর কথা কইতে সাহসী হ'তো না। তিনি ক্ষুব্ধ হ'লেন। ব'ল্‌লেন, তুমি আমাদের বাড়ীর ছেলেদের মত হ'য়ে গেছ শরৎ, একটু বুঝে চলা তোমার উচিত!

শরৎচন্দ্র ছেলেবেলা থেকে অবহেলা ও অসচ্ছলতার মধ্যে মানুষ হ'য়ে উঠ্‌লেও আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল তাঁর প্রচুর। বিবেক ছিল জাগ্রত। তিনি পরক্ষণেই বুঝ্‌তে পার্‌লেন আপন ভুল। লজ্জায় পরমুহূর্ত্তেই ম্লান হ'য়ে প'ড়্‌লেন। তার কয়েক মিনিট পরে নিঃশব্দে তিনি সে-বাড়ীর মায়া ত্যাগ ক'র্‌লেন চিরদিনের মত।

*   *   *   *

আশ্রয় নিলেন মহাদেব সাহুর বাড়ীতে। তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রের গানের পরম ভক্ত। পরে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গভীর হ'য়ে উঠ্‌লো। তাঁর

জমিদারীর অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল অসম্ভব। রাতারাতি সেই পরিবেশের মধ্যে মেজাজ ও পোষাক গেল বদলে।

* * * *

এপাশে শেখরবাবুর পিশিমা খাবারের থালা সাজিয়ে ব'সে আছেন। শরৎচন্দ্রের কোন খবর নেই। রাত একটা বাজলো। তিনি চঞ্চল হ য়ে উঠ্‌লেন। হাঁক্‌ডাক্ সুরু ক'র্‌লেন—তোরা ত দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে গেলি, এপাশে ছেলেটা গেল কোথায়? যা তোরা খোঁজ ক'রে দেখ্ একবার !

শেখরবাবুর কানেও কথাটা গেল। তিনি বুঝ্‌লেন, ব্যাপারটা ঘটেছে কি! অনুমান ক'রে নিলেন—বেচারী লজ্জায় হয়ত কোথাও লুকিয়ে আছে। ব'ল্‌লেন, ভয় নেই, নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে র'য়েছে! বাবা সন্ধ্যায় তাকে একটু ধমক দিয়েছিলেন, হয়ত লজ্জায় বেরুতে সাহস করেনি। তুমি বরং খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে, শুয়ে পড়ো—সে নিজেই এসে খেয়ে যাবে'খন।

পরদিন সকালে দেখা গেল—খাবার তেমনই ঢাকা পড়ে র'য়েছে। রাত্রে বাড়ীতেও ফিরে আসেননি। সকলে চিন্তিত হ'য়ে প'ড়্‌লেন। ডাক্ প'ড়্‌লো নিশানাথের।

অনেক অনুসন্ধানের পর নিশানাথ তাঁকে আবিষ্কার ক'র্‌লেন মহাদেব সাহুর কুঠীতে। শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, তোমাদের বাড়ীমুখো হওয়ার সাহস আমার নেই, নিশানাথ! আমাকে তাঁদের ক্ষমা ক'র্‌তে ব'লো।

নিশানাথ ফিরে এলেন। ব'ল্‌লেন—আপনাদের ভয় নেই! শরৎ ভালই আছে। মহাদেব সাহুর আখ্‌ড়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

* * * *

মহাদেব সাহুর শিকারের সখ ছিল। শরৎচন্দ্রও ছিলেন একজন ভাল শিকারী। মনের আনন্দে গান ও শীকার নিয়েই রইলেন মেতে। সেই সঙ্গে আনুসঙ্গিক সব কিছুই জুটতে লাগ্‌লো পূরোদমে।

মাঝপথে সহসা বাধা এসে দাঁড়ালো। সে কালিদাসী। সেই ক'র্‌লো শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার। লোক দিয়ে ডাকিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। নিজের হাতে তামাক সেজে এনে একেবারে পাশের ফরাসের উপর বসে প্রশ্ন ক'র্‌তে সুরু ক'র্‌লো—এখানে কবে এলে? মা মারা গেছেন শুনেছি,—বাবা এখন কোথায়? ভাগলপুর ছেড়ে সহসা এ স্বপ্নরাজ্যে এসে জুট্‌লে কেমন করে?

শরৎচন্দ্র হতবাক্ হ'লেন। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটি কিন্তু সত্যই অসামান্যা সুন্দরী! চোখে, মুখে, দেহে যৌবন উপ্‌ছে উঠ্‌ছে। চোখ দু'টো তার সম্মোহনীতে ভরা। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। কণ্ঠস্বর মধুমাখা, অথচ যে কয়টি বাক্যবাণ সে হান্‌লো—তার মধ্যে লুকিয়ে র'য়েছে শ্লেষ, ঈর্ষা ও স্নেহের শীতল ছায়া। শরৎচন্দ্র অভিভূত হ'য়ে প'ড়্‌লেন। সহসা উত্তর দিতে পার্‌লেন না।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে অতিবাহিত হ'য়ে গেল। শরৎচন্দ্র নিজের সম্বিত ফিরে পেলেন। একটু কঠোর হ'তে চেষ্টা ক'র্‌লেন—কিন্তু একটা অজ্ঞাত দুর্ব্বলতা তাঁকে পেয়ে ব'স্‌লো। ধীর কণ্ঠে প্রথম কথা কইলেন, আমায় ত' তুমি বিলক্ষণ চেন দেখ্‌ছি, কিন্তু তোমায় ত' ঠিক চিনে উঠ্‌তে পার্‌লাম না!

কালিদাসী হেসে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লে, তা' পার্‌বে কেন? বিশেষ ক'রে পদমর্য্যাদায় যখন জমিদারের মোসাহেব হ'য়েছো! খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে ব'ল্‌লো, আমি কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই চিন্‌তে পেরেছি। বুঝ্‌লে ত মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষে পার্থক্য কোথায়?

শরৎচন্দ্র নিরুত্তর। কালিদাসী ব'ল্‌লো—অবশ্য তোমার মনের কথাই

টেনে ব'ল্‌ছি আমি, এমনও ত অনেক মেয়ে দেখা যায় যারা বিশেষ পরিচিত হ'য়েও নীরবে গা ঢাকা দেয়। সেটা কিন্তু নারী চরিত্রের বিশেষত্ব নয়, নিছক আত্মপ্রতারণার ছলনা মাত্র! এই চেনার মধ্যে একটা অজানার দম্ভ তার নারীত্বকে শুধু ম্লান ক'রে দেয় না, তাকেও প্রতি পলে দগ্ধে মারে। কিন্তু এসব বাজে আলোচনা আপাততঃ বন্ধ থাক্—এখন যা ব'ল্‌ছিলাম—তা' সাহেব, এ রোগে তোমায় ধ'র্‌লো কেন? শুনেছি মামাদের জমিদারীটা না কি পেশা—বাবার ছিল কাব্যের নেশা—তোমার বুঝি শেষ সম্বল হ'ল মোসাহেবিগিরী?

ক্রোধে ও অপমানে শরৎচন্দ্রের সারা দেহটা রি-রি ক'র্‌তে লাগ্‌লো। এইটুকু জীবনের চলার পথে তিনি কত বিচিত্র নারীর সংস্পর্শে এসেছেন কিন্তু কাউকে ঘরে ডাকিয়ে, কোন অচেনা ভদ্রলোককে অকারণে এমন রূঢ় ভাষায় অপমান ক'র্‌তে কোনদিন যে কেউ সাহসী হ'তে পারে, এ ধারণাটা ছিল তাঁর স্বপ্নেরও অতীত! ব'ল্‌লেন—আমার খুশী!

কালিদাসীর রহস্য-মাখা বাঁকা ঠোঁটের হাসি চকিতে খসে গেল। ব'ল্‌লো, নিজেকে নষ্ট করার স্বাধীনতা যে তোমার আছে তা' অবশ্যই স্বীকার করি—কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রেখো, যতদিন পর্য্যন্ত এখানে আমি আছি, যা খুশী তা' করার অধিকার তোমার নেই! শিকার ত' ছাই···হয় বক না হয় চিল—তার আবার সাজ সরঞ্জাম দেখোনা! তবুও যদি বীরপুরুষের দল বাঘ শিকারে বেরুতেন—উৎসাহের দাপাদাপি, আয়োজনের প্রাচুর্য্যে, হয়ত সারা সুন্দরবনটাই সাগরের অতল তলে তলিয়ে যেতো! খুলে ফেল সব। কালিদাসী স্পর্দ্ধিত ফণিনীর মত যেন সহসা দুলে উঠ্‌লো। কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠ্‌লো নির্লিপ্ত আদেশের দৃঢ়তা। ব'ল্‌লো—চুপ ক'রে শুয়ে থাকো। একটি পাও কোথাও নড়্‌তে পার্‌বে না!

বাইরে ডাক প'ড়্‌লো—কুমারসাহেব রেডি, বাবুজী!

কালিদাসী শরৎচন্দ্রের হ'য়ে উত্তর দিল,—সাহেবকে ব'লে দাও রূপলাল, বাবুজীর শরীর হঠাৎ খারাপ হ'য়েছে, এখন কোথাও তাঁর যাওয়া সম্ভব নয়!

শরৎচন্দ্র বাধা দিয়ে কি যেন ব'লতে গেলেন, কালিদাসী চকিতে বন্দুকটা তুলে নিয়ে নিজের দিকে বাগিয়ে ধ'রে ব'ল্‌লো, চুপ! একটি কথা ক'য়েছো কি, গুলি ক'রে মরে যাবো—তখন কেউ বাঁচাতে পারবে না—এমন কি তোমার কুমারসাহেবও না!

শরৎচন্দ্র হতভম্ব হ'য়ে প'ড়্‌লেন। নীরবে সে আদেশ পালন ছাড়া উপায় নেই। তাকিয়াটায় হেলান দিয়ে কাৎ হ'য়ে শুয়ে কি যেন ব'সে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

কালিদাসী বন্দুকটা পাশের ঘরে লুকিয়ে রেখে, হাসিমুখে ফিরে এসে সাম্‌নে দাঁড়ালো। হেসে উঠে ব'ল্‌লো—এখনও চিন্‌তে পার্‌লে না? এত বয়ে গেছো যে, পার্‌লেও সহসা স্বীকার ক'র্‌বে—সে ভরসাও আমার নেই! কিন্তু তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বড় হাসি পাচ্ছে! আহা যেন, কতই শান্ত-শিষ্ট অবোধ শিশু ছেলে!

কালিদাসী হাসিতে ফেটে প'ড়্‌লো। কয়েক সেকেণ্ড পরে পুনরায় মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো—একদিন অনেক শাসন ক'রেছিলে—সে দিন ছিলাম অসহায় শিশু, আজ তার প্রতিশোধ নেবো—অবশ্য লগুড়াঘাতে নয়,—সেবা-যত্নে—আদর-আপ্যায়িত ক'রে।

চকিতে কালিদাসীর কণ্ঠস্বর গেল ব'দ্‌লে। স্নেহমাখা আন্তরিকতাপূর্ণ স্বরে ব'ল্‌লো—মা মারা গেছেন কত দিন? শুনেছি ত প্রায় চার বছর। যত্ন নেওয়ার লোক নেই, শরীরটা সত্যই তোমার খুব খারাপ হ'য়ে গেছে! কোন অত্যাচার না ক'রে চুপ্‌চাপ্ দিন কয় থাকো তো দেখি, কেমন না শরীর ভালো হয়!

শরৎচন্দ্র নীরব শ্রোতা।

কালিদাসী চেয়ার টেনে পাশে ব'সলো ! ব'ল্‌লো—আচ্ছা, দেশে কতদিন যাওনি ? সেই বৈঁইচিফলের বনটা তেমনি আছে ত' ? না সব শেষ হ'য়ে গেছে ? তামাক ত' তখনই খেতে—মাঝে মাঝে লুকিয়ে-চুরিয়ে দু'এক ছিলিম সেজে এনেও দিতে হ'তো, আবার মদ ধ'র্‌লে কেন ? লিভারটা যে ও-তে নষ্ট হ'য়ে যায় !

অতীতের স্মৃতিটা স্পষ্টতর হ'য়ে উঠ্‌লো। শরৎচন্দ্র বুঝ্‌তে পারলেন কে এই কালিদাসী ! ছোটবেলার একান্ত অনুগত সাথী—হারানো সেই রোগা এতটুকু মেয়ে কালিদাসী ওরফে রাজলক্ষ্মী ! সেই অতীতের সঙ্গে এর কোথাও এতটুকু মিল নেই। আছে শুধু মনের।

শরৎচন্দ্রের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুট্‌লো। ব'ল্‌লেন—জাতটা ত' নিলে, দাও তো এবার দক্ষিণা !

কালিদাসীও হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—নিশ্চয় দেবো—অবশ্য যদি কথা আমার শোন !

* * *

কালিদাসী উঠে গেল। পরক্ষণেই ফিরে এলো—হাতে এক ডিস্‌ খাবার। ব'ল্‌লো—মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে, এগুলো মুখে দিয়ে নাও ! বলেই, নিজে সাম্‌নের টেবিলের উপর সেটি রেখে, শরৎচন্দ্রের গায়ের কোট্‌টা খুলে নিয়ে একটা হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখ্‌লো !

শরৎচন্দ্রের মন তখন কুমারসাহেবের আখ্‌ড়ার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ সবে তাঁর মন বসে না—ভালও লাগ্‌ছে না—অথচ মুখ ফুটে কিছু ব'ল্‌তেও সাহসে কুলালো না—কালিদাসী ত' আর সেই শিশু-কালিদাসী নেই, খুশীমত শাসন ক'র্‌বেন ! এখন পদমর্য্যাদা লাভ ক'রে ব'সে আছে সে নিজেই !

* * *

শরৎচন্দ্র কালিদাসীকে এড়িয়ে চ'ল্‌তে চেষ্টা ক'র্‌লেও তিনি কালিদাসীর চোখ এড়িয়ে কোনদিন চ'ল্‌তে পার্‌লেন না। সেদিন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত হৈ-চৈ গান-বাজনা সেরে নেশায় বেহুঁস হ'য়ে নিজের ঘরের দিকে টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে চ'লেছেন। হঠাৎ কিসে হোঁচট্‌ খেয়ে প'ড়ে যাওয়ার উপক্রম হ'তেই, দু'টি কোমল বহু তাঁকে সযত্নে তুলে ধ'র্‌লো।

শরৎচন্দ্র মুখ তুলে সেই জ্যোৎস্না-স্নাত রাতে দেখ্‌লেন, সারা অঙ্গে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে তাঁরই সাম্‌নে দাঁড়িয়ে র'য়েছে কালিদাসী। জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, এখানেও তুমি?

কালিদাসী কোন উত্তর দিল না। নীরবে তাঁকে ধীরে ধীরে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে ব'ল্‌লো, বুঝ্‌লে নারী মরে সেইদিন—যেদিন সে ভালবাসে কোন পুরুষকে। ছেলেবেলায় মেরে মেরেই বোধ করি অন্তরটাকে এতখানি দখল ক'রে বসেছো যে, মরেও আমার শান্তি হবে না! তাই ত' লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে ছুটে আসি বার বার। কিন্তু আর একটিও কথা না—ব'লেই নিজের আলোয়ানটি তাঁর সারা অঙ্গে চাপা দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল সে।

অন্ধকারে দেখা না গেলেও শরৎচন্দ্র অনুমান ক'রে নিলেন, ইচ্ছা ক'রেই সে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল, বাঁধন-হারা অশ্রুকে সংযত করার উদ্দেশ্যে!

* * *

কুমারসাহেবের সঙ্গীর অভাব ছিল না। তবুও কুমারসাহেবের ছিল শরৎচন্দ্র-অন্ত প্রাণ। সঙ্গে তাঁকে না নিলে কুমারসাহেবের কোন কাজেই বস্‌তো না মন।

তাঁরা ক'লকাতায় প্রায়ই আস্তেন। শরৎচন্দ্রও এলেন এবারে। উঠ্‌লেন, বর্ত্তমান "ইলাইট্" সিনেমার পাশের একটি বাড়ীতে। ওখানে চতুর একদল উড়িষ্যাবাসী বাস ক'র্‌তো। তাদের পেশা ছিল, ও পথে যে সব মেয়ে চলাফেরা করে, তাদের ইচ্ছামত দেখিয়ে দিলেই রাত্রে বাসায় এনে পৌঁছে দিয়ে যাওয়া।

একদিন সন্ধ্যা প্রায় আট্‌টায়, একটি ইহুদী মেয়েকে তারা পৌঁছে দিয়ে গেল! বয়স তার পনেরো কি ষোল। স্কুলে পড়ে। দু'শো টাকা দক্ষিণার বিনিময়ে মেয়ের মার কাছ থেকে আনা হ'ল মেয়েটিকে।

সাঙ্গোপাঙ্গো, কুমারসাহেব, সবাই নেশায় অচেতন। মেয়েটি শঙ্কিতভাবে একটা পাশে চেয়ার টেনে বস্‌লো। শরৎচন্দ্র একা তখনও সজাগ। চেয়ে দেখ্‌লেন, মেয়েটির গঠন সত্যই অপূর্ব্ব। সব চেয়ে আকর্ষণীয় তার মায়াবী দু'টি চোখ। প্রাণের প্রাচুর্য্য যেন প্রতিটি মুহূর্ত্তে উপ্‌ছে উঠ্‌তে চায়!

মেয়েটিকে বোধ হয় ভুলিয়েই আনা হ'য়েছিল। এখানে পা দিয়েই অবস্থাটা অনুমান ক'রে নিয়ে ভয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল। চোখে তার জল থামে না।

কুমারসাহেবের কোন জ্ঞান নেই। একজন সঙ্গী ঝিমোচ্ছিল। মেয়েটিকে দেখে খাড়া হ'য়ে ব'স্‌লো। টল্‌তে টল্‌তে মেয়েটির কাছে এগিয়ে এসে, হাতখানা তার চেপে ধ'র্‌লো। সভয়ে মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো—এক্‌স্‌কিউজ্ মী প্লীজ্—এক্‌স্‌কিউজ্ মী।

কে কার কথা শুনে। সে জোর ক'রে তাকে আকর্ষণ ক'র্‌তে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। সোহাগ জানালো—মাইরী ব'ল্‌ছি সুন্দরী—ভালবাসি—তোমায় ভালবাসি!

মেয়েটি হাত দু'টো ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ক'র্‌লো বার বার! অনুনয় জানালো—প্লীজ্—প্লীজ্—প্লীজ্—

শরৎচন্দ্র একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এলেন। ভয়ার্ত্ত করুণ কণ্ঠস্বর শুনে সচকিত হ'য়ে ফিরে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটা তাঁর মমতায় ভরপুর হ'য়ে উঠ্‌লো। তিনি নেশা করেন সত্য—মেয়েদের সঙ্গে প্রাণখুলে আলাপও করেন অবসরমত, কিন্তু অযাচিতভাবে আত্মসমর্পণ না ক'র্‌লে, কখনও তিনি কারও অঙ্গস্পর্শ ক'র্‌তেন না।

কোন বিদেশিনীর আচরণে, তিনি কখনও বাঙালীমেয়ের মত আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা দেখেননি! এই ঘরে ব'সেই ইতিপূর্ব্বে অন্ততঃ পাঁচ-সাতবার বিদেশিনীদের সঙ্গে মেলামেশার অবাধ সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন। তারা কামনার ইন্ধনই যুগিয়েছে, অকারণে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা ক'রেছে, কিন্তু এ মেয়েটি যেন এদেশের প্রকৃতির সঙ্গে একান্তভাবে মিশে গিয়ে এদেশীয় সতীত্বপ্রথার মর্য্যাদা দিতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে! মনটা তাঁর ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌লো। সাম্‌নে এগিয়ে এলেন। তাকে সে-বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে নিজের কাছে বসালেন। পেট পূরে খাওয়ালেন। রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে দিলেন। ব'ল্‌লেন, নো ফিয়ার মিস্—আই ষ্ট্যাণ্ড ফর্ ইউ! (তোমার ভয় নেই, আমি তোমার পাশে আছি।)

খাওয়া শেষ হ'লে পর, তাকে বাসায় পৌঁছে দিতে রওনা হ'লেন। তার মা মেয়েকে ফিরে আস্‌তে দেখে ত' হতবাক্! রাগও ধ'র্‌লো যথেষ্ট। বাবুকে হয়ত টাকাটা এখুনি ফেরৎ দিতে হবে। মেয়েকে ধমক দিলেন—সিলি, অবস্‌টিনেট্‌ গার্ল! (অবাধ্য বেয়াদপ্‌ মেয়ে!)

···মা জাতিতে ইহুদী হ'লেও ভাল বাংলা ব'ল্‌তে পারে। শরৎচন্দ্রকে ব'ল্‌লো—বাবু রাগ ক'র্‌বে না—এখুনি আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি!

শরৎচন্দ্র মৃদু হাস্যে বাধা দিয়ে ব'ল্‌লেন—তোমার মেয়ে সত্যই খুব ভাল মেম-সাহেব! ঠিক আমার দেশের মেয়ের মত! বোধ হয় এ দেশের

জল-হাওয়ায় ও মানুষ—তাই, এ দেশের প্রকৃতিই ও পেয়েছে। বিশ্বাস ক'র্‌বে কিনা জানি না, কিন্তু সত্য ব'ল্‌তে কি খুশী হ'য়ে নিজেই ফিরিয়ে দিতে এসেছি!

মেম-সাহেব হতবাক্ হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

শরৎচন্দ্র বেরিয়ে আসার উদ্দেশ্যে দু'পা এগিয়েই পিছন ফিরে থম্‌কে একবার দাঁড়ালেন। ব'ল্‌লেন—একটা কথা তোমায় ব'লে যাই মেম-সাহেব, টাকার লোভে এ জাতের মেয়েকে তুমি আর কখনও বিক্রী ক'রো না!···পরমুহূর্ত্তেই হন্ হন্ ক'রে তিনি হাঁট্‌তে সুরু ক'রে দিলেন।

*　　　*　　　*

ক'লকাতা থেকে ফিরে সবে উঠানে গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন —দাসী এসে খবর দিল—মা'র সঙ্গে একটিবার দেখা ক'রে তবে উপরে যাবেন বাবু।

মনে মনে বিরক্ত বোধ ক'র্‌লেও শরৎচন্দ্র কালিদাসীকে যথেষ্ট ভয় ও শ্রদ্ধা ক'র্‌তেন। কুমারসাহেবের মেজাজটা সব সময়েই হাসি-খুশীতে ভরা। তিনি জান্‌তেন, কালিদাসী শরৎচন্দ্রের শুধু পরিচিত নয়, বাল্যের খেলাঘরের সাথী। ব'ল্‌লেন—তাড়াতাড়ি একটু বিশ্রাম নিয়ে ফিরে এসো মিঃ চ্যাটার্জ্জি, ইচ্ছে আছে বৈকালে একটু শিকারে বেরুনো যাবে।

কুমারসাহেব উঠে গেলেন ওপরে। শরৎচন্দ্র সোজা কালিদাসীর ওখানে ফিরে গেলেন। কালিদাসী পূর্ব্ব থেকেই অপেক্ষা ক'র্‌ছিল। সাদরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। ব'ল্‌লো, ক'দিন তোমার পথ চেয়েই ব'সে আছি। যা' হোক্ দু'টো মুখে দিয়ে, একটু বিশ্রাম নেবে চলো।

কালিদাসীর ব্যবহারের মধ্যে শরৎচন্দ্র লক্ষ্য ক'র্‌লেন কৃত্রিমতা নেই—

বরং আছে একটা আতিশয্যের প্রাচুর্য্য। সে যেন ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে, তাঁকে খুশী করার উদ্দেশ্যেই।

কালিদাসী চ'লে গেল। শরৎচন্দ্র কুতূহল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন তার গমনপথের দিকে। ঘরের দরজাটুকু অতিক্রম করা মাত্র তাকে আর দেখা গেল না। কিন্তু চিন্তাধারা তারই আবর্ত্তে ঘুর্‌পাক্ খেয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো: এমন একটি রহস্যময়ী নারী-চরিত্র ইতিপূর্ব্বে তিনি দেখেননি কোনদিন! কখনও করে সে শাসন, কখনও করে সোহাগ, আবার কখনও বা ঘৃণায় মুখখানা নেয় ফিরিয়ে! তার কাছ থেকে মুক্তিও পাওয়া যায় না—আবার কাছে এলেও স্বস্তি নেই,—শান্তি নেই—কেমন একটা যেন অধীর চঞ্চলতা—যার আকর্ষণ আছে, উচ্ছ্বাস আছে, আবেগ আছে, স্বচ্ছল প্রাণের বহিঃপ্রকাশও আছে, নেই শুধু সেই মাদকতা, যা' মানুষকে রাখে ভুলিয়ে—তার নিজেরই অস্তিত্ব।

আজ তার আচরণে এমন একটা কোমলতা প্রকাশ পেল, যা' তিনি কোনদিন লক্ষ্য করেননি, অথবা লক্ষ্য করার অবসর তিনি পান্‌নি। তাই চোখের পাতায় জাগ্‌লো তার নূতনত্ব—ফুটে উঠ্‌লো তার মাধুর্য্য! আরও একটা জিনিষ তিনি লক্ষ্য ক'র্‌লেন, প্রাণে সেই হুল-ফোঁটানো হাসির তীক্ষ্ণ ছুরি আজ অকারণে তার ঠোঁটের কোণ থেকে গেছে ঝরে—পরিবর্ত্তে স্থান পেয়েছে কেমন যেন একটা অকৃত্রিম স্নেহ, যাকে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করা চলে,—যার আশ্রয় নিশ্চিন্ত নির্ভরযোগ্য ব'লে প্রাণমন সহজেই মেনে নিতে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। ব'সে ব'সে ভাবেন, সত্যই এমন মধুর মূর্ত্তি তিনি এর পূর্ব্বে দেখেননি কোন সময়ে!

কালিদাসী ফিরে এলো। দাঁড়ালো—দূরত্বের কোন ব্যবধান না রেখেই। খুলে নিল গায়ের জামা,—নতজানু হ'য়ে নিজেই খুলে দিল পায়ের মোজা। সেই স্নেহমাখা সুর ভেসে উঠ্‌লো, দেরী নয়—চলো!

নির্ব্বিকার চিত্তে শরৎচন্দ্র কালিদাসীর হুকুম তামিল ক'র্‌লেন। এ'টা তাঁর স্বভাবের বাইরে। কেন কি জানি তাঁর আজ কালিদাসীকে বড় ভাল লাগ্‌ছে—বার বার দেখ্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে! অন্য সময়েও যে তাঁর ভাল লাগেনি—তা নয়, বরং নিজের দুর্ব্বলতা পাছে ধরা প'ড়ে যায়, তাই সকল সময়ে থাকেন সতর্ক, কিন্তু আজ তার হ'ল ব্যতিক্রম।

শরৎচন্দ্র আহার শেষ ক'রে ফিরে এলেন। কালিদাসী গড়্‌গড়ায় ক'ল্‌কেটা বসিয়ে নলটা হাতে তুলে দিল। গায়ে তাঁর শালটা টেনে দিয়ে ব'ল্‌লো—একটু ঘুমিয়ে নাও। হাতের কাজগুলো সেরে নিই ততক্ষণ!

* * *

কালিদাসী যখন ফিরে এলো, বেলা তখন প্রায় তিন্‌টে। আজ তার বেশের পারিপাট্য নেই, মুখে একটা বিমর্ষের ছায়া। সাম্‌নে এসে দাঁড়াতেই শরৎচন্দ্র চোখের পাতা খুলে তাকালেন।

কালিদাসী জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, ঘুমোওনি বুঝি?

শরৎচন্দ্র আলস্য ভেঙে উঠে ব'স্‌লেন। ব'ল্‌লেন—হ'য়েছে, তবে খুব ভাল হ'ল না!

কালিদাসী পাশে চুপ ক'রে কয়েক সেকেণ্ড ব'স্‌লো। তখনও চ'লেছে তার অন্তর-দ্বন্দ্ব। ধীরে ধীরে চোখের পাতাগুলো তার ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠ্‌লো।

আরও কিছুক্ষণ মৌনতার মধ্যে কেটে গেল। সহসা কালিদাসী ব'লে উঠ্‌লো, সুরেনমামার লেখা একখানা চিঠি নিশানাথবাবু দিয়ে গেছেন প্রায় চার-পাঁচ দিন আগে। বাবা মারা গেছেন। তাঁর শেষ কাজের আর বেশী দেরী নেই। ভাগলপুরে ফিরে যাওয়া তোমার একান্ত প্রয়োজন।

বাবা মারা গেছেন? সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু সে দুর্ব্বলতা তাঁর কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে। ব'ল্‌লেন, কোন কিছুই যখন পালন করা হ'ল না, তখন প্রকাশ কিংবা প্রভাস যে হোক্ ক'র্‌বে'খন! আমার আর প্রয়োজন কি?

কালিদাসী বাধা দিল, তা হয় না শরৎদা! তুমি যে বড় ছেলে, তোমায় যেতেই হবে!

শরৎচন্দ্র ব'সে ব'সে কি যেন ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। কালিদাসী ব'লে চ'ল্‌লো, কোনদিন কোন অনুরোধ করিনি, ক'র্‌লেও কোনদিন সেকথা রাখনি। আজ কিন্তু কোন কথাই আমি শুন্‌বো না—যেতেই হ'বে তোমাকে। নইলে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে কেন? তুমি না বুঝ্‌লেও আমি ত জানি, কত স্নেহই না তোমায় ক'র্‌তেন তিনি! তাঁর শেষ কাজে—তোমায় যেতে হবেই!

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, কুমারসাহেবকে খবর দিতে হবে। শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে দেখ্‌বো সব কাজ শেষ হ'য়ে গেছে! তার চেয়ে না যাওয়াই ভাল! লোকে জানুক্, শরৎ ব'য়ে গেছে, সে মরে গেছে, কোন অস্তিত্বই তার আর নেই এ-জগতে!

কালিদাসী তাঁর মুখে হাতচাপা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো, বালাই, যাট্! তুমি মর্‌বে কেন? কুমারসাহেবকে আমি খবর পাঠাচ্ছি। তুমি বরং তৈরী হ'য়ে নাও! রাত্রের গাড়ীতেই তোমায় ফিরে যেতে হবে।

*　　　*　　　*

কুমারসাহেবও এ সংবাদে মর্ম্মাহত হ'লেন! তিনিও তাঁকে ভাগলপুরে ফিরে যাওয়ার উপদেশ দিলেন।

কালিদাসী সমস্তই গুছিয়ে দিল। যাওয়ার সময় হ'লে ব'ললো—এ

অবস্থায় পায়ের ধূলো নেওয়া সম্ভব হ'লো না। যদি কোনদিন ফিরে আসো—অবশ্য এটা মনেপ্রাণে আমি চাইনে—বরং বলি এদের কাছ থেকে চিরদিন তুমি দূরে সরে থেকো—এটা তোমার প্রকৃতির অবমাননা—

একটু থেমে পুনরায় ব'ল্‌লো—বাবার কাজ হ'য়ে গেলে—কেমন আছ শুধু একখানা পত্র দিও,—তার বেশী আমি আর কিছু চাইনে। তবে মা'র রচনা ও রটনার মূলে যত কিছুই মিথ্যে থাক্—সেইটাই মনে-প্রাণে বিশ্বাস ক'রো, কারণ তোমার কালিদাসীর অপমৃত্যু হ'য়েছে, সে তো নিজের চোখেই দেখে যাচ্ছো!

কালিদাসী দাঁড়ালো না। ভেতরে চ'লে গেল।

বহুক্ষণ শরৎচন্দ্র তার আশাপথ চেয়ে অপেক্ষা ক'র্‌লেন। কিন্তু কালিদাসী আর তাঁর সম্মুখীন হ'তে পার্‌লো না। তার সমস্ত ধৈর্য্য ও মনের বাঁধন হয়ত ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেছে একেবারে!

দাসী এসে খবর দিয়ে গেল, সময় আর বেশী নেই, বাবু। মা'র শরীরটা অসুস্থ ব'লে দেখা ক'র্‌তে পার্‌লেন না। ফিরে গিয়ে একখানা চিঠি দেবেন—এই অনুরোধটি শুধু জানিয়েছেন তিনি।

অকারণেই বুক ভেদ ক'রে একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস নেমে এলো। নারীচরিত্র এমনি জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণই বটে! যে, কয়েক ঘণ্টা পুর্ব্বে এত উপদেশ দিল, যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ ক'র্‌লো নিজের হাতে—সে-ই বিদায়ের সময় রইলো দূরে সরে। এর বেশী আশা করা শুধু সময়ের অপব্যয় নয়, বাতুলতাও বটে! শরৎচন্দ্র একটু ক্ষুণ্ণমনেই বেরিয়ে প'ড়্‌লেন রেলষ্টেশনের পথে।

* * *

শ্রাদ্ধের আয়োজন তখনও চ'লেছে। বেলা তখন প্রায় দশটা।

জমিদারপুত্র-বেশে শরৎচন্দ্র উপস্থিত হ'লেন ভাগলপুরে। গায়ে দামী শাল, পায়ে মোজা, কোঁচানো ধুতি, হাতে ঘড়ি, চোখে চশমা, সঙ্গে একটা সাইকেল।

নির্ব্বিবাদে শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেল। শরৎচন্দ্র নিজের ঘরে ফিরে এলেন। সেই ভাঙ্গা তক্তপোষ, ধূলোবালিতে ভর্ত্তি। চারপাশে মাকড়সার জাল। ব'স্‌বার মত জায়গা নেই এতটুকুও।

ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণ পরে, পার্ব্বতী পাশে এসে দাঁড়ালো। ঘরের দুরবস্থা ও জঞ্জাল দেখে, তারও চোখে জল দেখা দিল! কিন্তু ক্লান্ত শরৎচন্দ্রের ধৈর্য্যের বাঁধ গিয়েছিল ভেঙে। তিনি সেই দামী শালখানা ধূলোবালির ওপর অনায়াসে পেতে নিজে ব'স্‌লেন। ব'ল্‌লেন, দাঁড়িয়ে কেন পারু? বসো!

পার্ব্বতী বাধা দিল, একটু দাঁড়াও।

শরৎচন্দ্র ম্লান হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, এর বেশী সৌভাগ্যলাভের বরাত ত আর ক'রে আসিনি! যাক্ ওসব সুখ-দুঃখের কথা—পেটে একটা ব্যথা বোধ ক'র্‌ছি, সার্টের পকেটে একটা ওষুধ আছে, দাও তো আন্দাজ ক'রে এনে। সাবধানে কিন্তু! এক চামচের বেশী হ'লেই জ্ঞান আর ফির্‌বে না কোনদিন—

পার্ব্বতী চকিতে ছুটে জল ও চামচ নিয়ে ফিরে এলো। নিজের হাতেই খাইয়ে দিল ওষুধ। ধীরে ধীরে সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌লেন শরৎচন্দ্র।

* * * *

কান্তি-পণ্ডিত রাজা শিবচন্দ্রের শ্যালক। বিলেত যাওয়ার অপরাধে সমাজ তাঁদের একঘরে ক'রে রেখেছিল। তিনি ছিলেন স্কুলের পণ্ডিত-ম'শাই। শরৎচন্দ্র ছিলেন ছাত্র। হঠাৎ তিনি মারা গেলেন—কিন্তু

একটা বিরাট হৈ-চৈ-এর সৃষ্টি হ'ল তাঁর মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা নিয়ে। যাঁকে একঘরে করা হ'য়েছে, তাঁর শব দাহ ক'রবে কে ?

শরৎচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুবান্ধব সে বাধা-নিষেধ মানলেন না। পণ্ডিত-ম'শায়ের মৃতদেহ সৎকার ক'রে ফিরে এলেন। সমাজ-কর্ত্তারা এই বিরোধী যুবকদের আচরণে রুষ্ট হ'লেন কিন্তু মুখফুটে কিছু ব'ললেন না, শুধু সুযোগের অপেক্ষা ক'রতে লাগলেন।

গাঙুলী বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা হ'তো খুব ঘটা ক'রে। সে বছরও হ'লো। বাড়ীর কর্ত্তারা ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন ক'রলেন।

পাতা ক'রে সবাই ব'সে গেছেন। শরৎচন্দ্র লুচি পরিবেশন ক'রতে যাবেন, সমাজ-কর্ত্তারা সুযোগের অপব্যবহার ক'রলেন না। সমস্বরে প্রতিবাদ ক'রলেন, আমরা কেউ শরতের হাতে খাবো না। শুধু তাই নয়, ওর ছোঁয়া কোন জিনিষ আমরা স্পর্শ পর্য্যন্ত ক'রবো না ! গাঙুলীম'শায় যদি আমাদের নির্দ্দেশ না মানেন, আমরা উঠে যেতে বাধ্য হ'বো।

গাঙুলীম'শায় বিব্রত হ'য়ে প'ড়লেন। নিরুপায়ে সকলের সামনে শরৎচন্দ্রকে বার ক'রে দিলেন। আড়ালে ডেকে ফিস্‌ফিস্ ক'রে ব'ললেন, রাগ করিস্‌নে ভাই, মানটুকু আজ বাঁচা।

শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন। মনটা তাঁর ক্ষোভে-দুঃখে ফেটে প'ড়লো। এ অপমান ত তাঁর নিজের অপমান নয়, এ যে মৃত পণ্ডিত-ম'শায়ের আত্মার অপমান ! শুধু কি তাই ? শত শত নিরপরাধ মানুষকে অসহ্য ক্লেশ ও যন্ত্রণা দেওয়ার অধিকারই বা এরা পেল কেমন ক'রে ? যারা শত অপরাধী হ'য়েও সমাজের সেরা মানুষ ও দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা—তাদের মানুষই বা শ্রদ্ধা করে কিসের জন্যে? কেনই বা তাদের নির্দ্দেশ পালন ক'রে চলে অবহেলে ? এই দুর্ব্বলতাকে তারা প্রশ্রয় দেয় ব'লেই পৃথিবীতে বাঁধনটাই হ'য়েছে সত্য, আর মানুষের মনের মানুষ, অপমানে-

অবিচারে শুধু হাহাকার ক'রে বেড়ায় না—নিজের অজ্ঞাতে দেবতারূপী অমর আত্মাকে বারে বারে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত করে সেইসঙ্গে। এর প্রতিকার কি মানুষ কোনদিন ক'র্‌তে সাহসী হবে না?

*　　*　　*　　*

শরৎচন্দ্রের নতুন সংসার পার্ব্বতী নিজের হাতে গুছিয়ে দিল। দু'দিন আগে যা' ছিল পরিত্যজ্য, আজ তা' হ'য়ে উঠ্‌লো পূত ও পবিত্র। সকলের প্রলোভনের বস্তু।

এ পাশে সমস্ত কাজ তিনি গুছিয়ে এনেছেন। ছোট্‌দাদুর কাছে প্রভাসের চাকুরীর ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে, প্রকাশ থাক্‌বে সুরেনমামাদের কাছে, আর ছোট বোন মনিয়া রইলো ওয়েটনার্সের কাছে। বাকী শুধু নিজের ব্যবস্থা।

পার্ব্বতীর সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ হ'লেই তাঁর চলার পথ নির্ণীত হ'য়ে যায়। কিন্তু বলি বলি ক'রেও বলা আর তাঁর হ'য়ে ওঠে না। কেমন যেন একটা অজ্ঞাত দুর্ব্বলতা বারে বারে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ ক'রে দিয়ে যায়।

দিন যতই অতিবাহিত হ'তে লাগ্‌লো, চিত্ত তাঁর ততই অধীর হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সারাদিন ব'সে ব'সে কতই না কল্পনা করেন, অথচ যে সমস্ত কল্পনার কেন্দ্রবস্তু,—তার সম্মুখীন হ'লেই ভুলে যান আপনাকে। অপ্রয়োজনীয় কথায় মুখর হ'য়ে ওঠেন। আবার যখন সে চলে যায়, মনটা তখনই তাঁর অপরাধী হ'য়ে নিজের দুর্ব্বলতাকেই দোষারোপ করে।

একদিন সহসা তিনি আত্মপ্রকাশ ক'রে ব'স্‌লেন। ব'ল্‌লেন, ব'সে থাক। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

পার্ব্বতী তক্তপোষটার ওপর ব’স্‌লো। শরৎচন্দ্র তেপায়া চেয়ারটায় ব’সে নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগারেট শেষ ক’রে খাড়া হ’য়ে ব’স্‌লেন। ব’ল্‌লেন, সবই ত শেষ হ’ল, বাকী র’য়েছো তুমি। সেই বোঝাপড়াটাই শেষ ক’র্‌তে চাই। প্রতিদিনই মনে করি—বলি, কিন্তু তোমায় দেখ্‌লেই সব কথা যাই ভুলে—

পার্ব্বতী হাস্‌লো। শরৎচন্দ্র মাঝপথে থেমে গেলেন কয়েক সেকেণ্ড। কি যেন ভেবে নিলেন। তারপর মুখর হ’য়ে উঠ্‌লেন—বুঝ্‌লে পারু, তুনিয়ায় যার উপর সবচেয়ে বেশী নির্ভর করা যায়, তার কাছে হাত পেতে, মুখ ফুটে কিছু চাইতে সত্যই বড় লজ্জা করে। কিন্তু তোমাদের মেয়েজাতটার এমনই রীতি যে, না চাইলে পাওয়াও যায় না কোন কিছু!

পার্ব্বতী তেমনি হাস্‌তে লাগ্‌লো। ব’ল্‌লো—তারপর? থাম্‌লে যে—

শরৎচন্দ্র এইবার গম্ভীর হ’য়ে উঠ্‌লেন। ব’ল্‌লেন, সত্য বলতো পারু—তোমাদের কাছে কি সংস্কারটাই সব চেয়ে বড়? তার চেয়ে কি প্রিয় বস্তু তোমাদের নেই এ-জগতে?

পার্ব্বতী ইঙ্গিতটা বুঝ্‌তে পার্‌লো। তেমনি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, বহুবার ত তোমায় ব’লেছি শরৎদা, উচ্ছিষ্ট ফুলে পূজা হয় না। তুমি আমায় মাপ করো!—পার্ব্বতীর চোখে জল উপ্‌ছে উঠ্‌লো। শরৎচন্দ্র তার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বার কয়েক নাড়াচাড়া ক’র্‌লেন। ব’ল্‌লেন, তুমি আমায় ভুল বুঝো না পারু—তুমি যে আমার কতখানি—তা মুখের ভাষায় হয়ত বোঝাতে পার্‌বো না—শুধু শুনে রাখো: তোমাকে সুখী করার বাসনা ছাড়া অন্ত কোন বাসনাই আমার নেই!

পার্ব্বতী নীরব। শরৎচন্দ্র ব’লে চ’ল্‌লেন—যদিও মানি, আমার এ স্বপ্ন অলীক, তাকে সফল করার শক্তি ও সামর্থ্যও আমার নেই, তবুও

কেন জানি না, নিশ্চেষ্ট থাক্‌তে পারি না! তুমি চোখের জল মুছে ফেলো পারু—ও বস্তুটা আমি সহ্য ক'র্‌তে পারি না। তুমি সুখে থাকো—সুখী হও—তার বেশী কামনা আমার নেই!

শরৎচন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পার্ব্বতী তাঁর শয্যার উপর আছাড় খেয়ে পড়ে ফোঁপাতে লাগ্‌লো। তার হৃদয়ের শঙ্কা যে কত, বেদনা যে কত গভীর—তা' সে বোঝাবে কেমন ক'রে? খেয়ালী মানুষটা হয়ত আবার কোথায় উধাও হবে, কে জানে? হয়ত নিজের জীবনের প্রতি নির্ম্মম অত্যাচার চালাবে—কোন প্রতিকারই কেউ ক'র্‌তে পার্‌বে না—অথচ সেই একা পারে তাঁকে সংযমের দৃঢ় আবেষ্টনীর মধ্যে বেঁধে রাখ্‌তে—কিন্তু তাও কি সে পার্‌লো? আজন্মের সংস্কার, নারী জীবনের চরম দুর্ব্বলতা—তাকে আত্মহত্যার পথ প্রদর্শন ক'র্‌লো, অথচ—এ ছাড়া তার জীবনের দ্বিতীয় চলার পথ আজ আর নেই খোলা!

* * * *

অমরবাবু সহসা মারা গেলেন। পার্ব্বতী ভাগলপুর ত্যাগ ক'রে চলে গেল কাশী। শরৎচন্দ্র একা পড়ে রইলেন ভাগলপুরে। তাঁর মনে জেগেছে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব। দুনিয়ায় কে বড়? প্রেম না অর্থ? পার্ব্বতী যে তাকে ভালবাস্‌তো তার প্রমাণের অভাব নেই—অথচ ধরাই বা দিল না কেন? তবে কি তিনি অসহায় দরিদ্র ব'লেই পার্ব্বতী গেল পিছিয়ে?

শরৎচন্দ্রের চোখে সামাজিক আচার-ব্যবহারের নির্ম্মম চিত্র ফুটে উঠ্‌লো। তারা মানুষকে বাঁচার পাথেয়ের সন্ধান দিতে পারে না—নিশ্চিন্ত বাঁচার সুযোগও দেয় না। লোকাচার ও ঘৃণার তুষানলে অন্তরকে প্রতি পলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবে অথচ প্রতিকারের কোন পথই রাখে না খোলা। তাই মানুষ আজ আর মানুষ নেই, হ'য়ে গেছে পাষাণ!

শরৎচন্দ্রের মনে জ্বলে উঠ্‌লো বিপ্লবের অগ্নিশিখা। কিন্তু পথের কোন দিশাই তাঁর চোখে ভাস্‌লো না! একে একে শেষ অবলম্বনটুকুও নিঃশেষ হ'য়ে গেল। জীবন-ধারণের মত কোন অবলম্বনই তিনি খুঁজে পেলেন না। কোনদিন দু'মুঠো জোটে, কখনও-বা তাও জোটে না। আস্তানাটা তখনও আছে কিন্তু সেখানে তিনি বিশ্রাম লাভ ক'র্‌তে পারেন না—মনটা কাত্‌রে ওঠে একটা অব্যক্ত বেদনায়। তাই গাছতলাই হ'লো তাঁর পরম আশ্রয়। এর বেশী হয়ত একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন—আজ তাঁর সে মোহনিদ্রা টুটে গেছে—জীবনটা জীবন নয়—রূপান্বিত হ'য়েছে দুর্ব্বিসহ একটা বোঝায়!

* * * *

পূজোর ছুটি। সুরেনমামা, উপেনমামা, গিরীনমামা সকলেই ভাগলপুরে ফিরে এসেছেন। অনেক কষ্টে তাঁরা খুঁজে বার ক'র্‌লেন শরৎচন্দ্রকে। বোঝাতে চেষ্টা ক'র্‌লেন, ক'ল্‌কাতায় চলো। যা' হোক্ ব্যবস্থা একটা হ'য়ে যাবে! কাঁসারীপাড়ার বাসাটা এখনও খালি আছে—তুমি স্বচ্ছন্দে সেখানে গিয়ে উঠ্‌তে পারো, তারপর আমরা ত সব র'য়েইছি!

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, কিন্তু ক'লকাতায় যাওয়ার মত সঞ্চয় যে আমার নেই!

তিন মামা উৎসাহ দিলেন, সে ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে, তুমি ভেবো না শরৎ!

* * * *

ক'ল্‌কাতায় এসে লালমোহন গাঙ্গুলীর (বোমা মামা) তত্ত্বাবধানে, হাইকোর্টের Appeal Case-এর নথিপত্র (Paper Book) ইংরেজী থেকে হিন্দী অনুবাদ সুরু ক'র্‌লেন। প্রথম মাসে উপায় ক'র্‌লেন—প্রায়

নব্বুই টাকা। সকলের ঋণ তিনি শোধ ক'রে নিজেকে একটু স্বচ্ছল ক'রে তুল্‌লেন।

এই সময় সাহিত্য-সেবার ইচ্ছা তাঁর পুনরায় দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক'রে, ভবিষ্যৎ কর্ম্মপথ স্থির ক'রে নেওয়ার আশায় ঠাকুর-বাড়ীর আশেপাশে ঘোরা-ফেরা সুরু ক'র্‌লেন।

কিন্তু সে অতি দুর্ভেদ্য দুর্গ! সেখানে প্রবেশের অধিকার সকলের ছিল না। বাছা বাছা রথী মহারথী ছাড়া প্রবেশ সেস্থানে নিষিদ্ধ। কয়েক দিন ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে বুঝ্‌লেন—রবীন্দ্রনাথের সম্মুখীন হ'তে হ'লে, যে শিক্ষা ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, সে শিক্ষা ও সামর্থ্য তাঁর নেই! মনে ক্ষোভ জাগ্‌লো অথচ অপরাধ ত' রবীন্দ্রনাথের নয়—অপরাধ দুর্গ-প্রহরীর! তাঁরা শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরাই দুরতিক্রম্য। চাই পরিচয়-পত্র, বংশের কৌলিন্য—তার চেয়েও প্রয়োজন অর্থের প্রাচুর্য্য! কোন কিছুই নেই শরৎচন্দ্রের। সুতরাং পশ্চাৎ অপসরণ ক'র্‌তে বাধ্য হ'লেন তিনি। তবে একেবারে নিরাশ হ'লেন না—প্রবেশের অনুমতি পেলেন সৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের আখ্‌ড়ায়।

সেখানে বহু লোকের সমাগম। বহু গাইয়ে বাজিয়ে আসেন আর সে রসের রসিক যাঁরা—তাঁরা কিছু কিছু সুধা পান ক'রে যান—এতে আপত্তি ছিল না কারও।...

ঠিক সেই সময়ে বর্ম্মা থেকে এলেন অঘোরবাবু। উপেনবাবুর ভগ্নি-পতি—অনুদির স্বামী। সম্পর্কে তিনি হ'লেন শরৎচন্দ্রের মেশোম'শায়। এই ক'দিনের মধ্যে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হ'লেন এবং আলাপও জমে উঠ্‌লো গভীরতর ক'রে। তাঁর মুখে বর্ম্মাদেশের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনে তিনি বর্ম্মায় পাড়ি দেবেন স্থির ক'রে ফেল্‌লেন।

মতিলালবাবু বেঁচে থাকার সময়েই, একবার বর্ম্মা গিয়ে ওকালতি পড়ার কথা উঠেছিল। তখন তিনি সে সুযোগ গ্রহণ ক'র্‌তে রাজি

হননি—যার আকর্ষণে, আজ সে—তার শেষ জবাব দিয়ে চ'লে গেছে দূরে। শুধু তাই নয়, প্রমাণ ক'রে দিয়েছে মানুষের চেয়েও বড় তার জন্মগত সংস্কার। তার ওপরে ওঠার সাধ্য তার নেই!

অঘোরবাবু বর্ম্মায় ফিরে যাওয়ার অল্পদিন পরেই, গোপনে তিনি বর্ম্মা যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে ফেল্‌লেন। এ-পাশে কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় সুরেনমামা, উপেনমামা, গিরীনমামা লেখা পাঠালেন। তিনিই তাঁদের সাহিত্যগুরু। সবগুলি পড়ে দেখ্‌লেন। শেষে "মন্দির" গল্পটি নিজে লিখে সুরেনমামার নামে পাঠিয়ে দিলেন।

যাওয়ার দিন আসন্ন। সুরেনমামাকে নির্জ্জন পথে ডেকে এনে সমস্ত গল্পটা শুনিয়ে দিলেন। ব'ল্‌লেন—মনে হয়, এই গল্পটাই প্রথম পুরস্কার পেতে পারে—তাই তোমায় সব শুনিয়ে রাখ্‌লাম।

তখনও কেউ জানেন না শরৎচন্দ্র দেশ ত্যাগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ক'রে ব'সে আছেন।

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ১৪৭]

* * * *

অঘোরবাবুর চরিত্রে মহৎ একটা গুণ ছিল—বড়কে বড় ক'রে দেখা আবার ছোটকে ছোট ক'রে দেখা। ব'ল্‌তেন, ও বড়-ছোটর বাদ-বিচার আমি করিনে। তবে আত্ম-প্রকাশকেও দম্ভ ব'লে মনে করিনে। এর পরিচয় শরৎচন্দ্রও পেয়েছিলেন ক'ল্‌কাতার বাসায়।

লিউইস্ ষ্ট্রীট ধ'রে প্রতি ঘরের নম্বর লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে চ'লেছেন শরৎচন্দ্র। দূর থেকেই একটা বড় হরপের নেমপ্লেট দেখ্‌তে পেলেন। একটু এগিয়েই দেখ্‌লেন তাঁর অনুমান মিথ্যা নয়। হ্যাঁ, ৫৬ ও ৫৬।এ, লিউইস্ ষ্ট্রীটই বটে! সোজা ঢুকে গেলেন ভেতরে। বাড়ীটা তিনতলা—বেশ সাজানো গুছানো। মনে হয় বুঝি কোন রাজা-উজীরের বাড়ী।

বৈঠকখানা ভেবে ভেতরে ঢুকতেই অঘোরবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেল। তিনি তখন স্তূপাকার আইনের বইয়ের আড়ালে ঢাকা প'ড়ে গেছেন—শুধু দেখা যাচ্ছে মুখ—আর সেই উজ্জ্বল দু'টি চোখ। প্রথমে প্রশ্ন ক'র্‌লেন, কে? পরক্ষণেই ভুল সংশোধন ক'রে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লেন, আরে শরৎ যে! এসো, এসো—বসো। বইগুলো সরাতে সরাতে ব'ল্‌লেন, তা' হ'লে সত্যই তুমি চলে এলে! ভালই ক'রেছো। বার্ম্মিজ্‌টা পরীক্ষা দিয়ে দিলে—আট্‌কায় তোমায় কে! পরমুহূর্ত্তেই হাঁক্ দিলেন, ভজুয়া—এই ভজুয়া—

উত্তর এলো না। ব'ল্‌লেন, বোধ হয় বাজারে গিয়ে থাক্‌বে! চলো, চলো, ওপরে চলো! হাত-মুখ ধুয়ে ততক্ষণ একটু বিশ্রাম ক'রে নাওগে!

সন্ধ্যায় অঘোরবাবু তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু গিরীনবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি আমার এক নিকটতম আত্মীয়। মগের মুলুকে পা দিয়েছে—ভাগ্যের সন্ধানে! অবশ্য এবারে ক'লকাতায় গিয়ে, আমিই এ যুক্তিটা বাত্‌লে দিয়ে এসেছিলাম। আর বুঝ্‌লে হে শরৎ,—ইনি হ'লেন আমার বিশিষ্ট একটি বন্ধু। নাম গিরীন সরকার। গভর্ণমেণ্টের কন্‌ট্রাক্টর! এ ছোক্‌রার জন্যে একটু চেষ্টা-চরিত্র ক'র্‌তে যেন ভুল না হে সরকার! অঘোরবাবুর মুখে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি ও সেই উচ্চ কণ্ঠস্বর। সারা ঘরটা প্রতিধ্বনিত হ'য়ে গম্ গম্ ক'র্‌তে লাগ্‌লো!

গিরীনবাবু উত্তর দিলেন, নিশ্চয়—নিশ্চয়,—আমরা যখন আছি—ওঁর ভাব্‌নার আর প্রয়োজন তেমন কি? ওকালতিই ক'র্‌বেন ত ঠিক্ ক'র্‌ছেন?

শরৎচন্দ্রের হ'য়ে অঘোরবাবু উত্তর দিলেন, নিশ্চয়! এ মগের মুলুকে

যে যত পারো শুধু লুট্ ক'রে নাও! হাসিতে ফেটে প'ড়্লেন। ব'ল্লেন, বুঝ্লে হে সরকার, ছোক্‌রাও বেশ চালাক-চতুর আছে! শুধু বর্ম্মী ভাষাটায় দখল ক'র্‌তে পার্‌লে কাজ ও চালিয়ে নেবে—এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই!

* * * *

কয়েক দিনের মধ্যেই গিরীনবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আলাপ জমে উঠ্‌লো। একদিন বৈকালে, একা ব'সে তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েক কলি গান ধ'রেছেন, "যে ফুল না ফুটিতে ঝ'রেছে ধরণীতে, জানিহে জানি তাও হয়নি হারা…"

গিরীনবাবু সহসা পিছন থেকে তাঁর কাঁধের উপর হাত দু'খানা রাখ্‌লেন। ব'ল্লেন, গলাটি তোমার তো খাসা, শরৎদা! কিন্তু ব'সে ব'সে কি এত ভাবো বলতো? কণ্ঠে একটা হতাশার সুর। মনে হয় যেন একটা গভীর ব্যথা অন্তরে তোমার বাসা বেঁধে আছে! ব'লো না শরৎদা—সে ব্যথা কিসের?

শরৎচন্দ্র উত্তরে ম্লান হাস্‌লেন। ব'ল্লেন, ব্যথী নইলে কি ভাই ব্যথার মূল্য কেউ বোঝে কোনকালে?

* * * *

তিন মাসের মধ্যে অঘোরবাবু বর্ম্মা রেলের হিসাব পরীক্ষক মিঃ কে. বসুকে ধ'রে এবং তাঁরই (মিঃ বসুর) সুপারিশে এজেণ্ট জন্ সাহেব ৭৫৲ টাকার একটা চাক্‌রী যোগাড় ক'রে দিলেন। এ-পাশে বর্ম্মী ভাষা শেখার কাজও নিয়মিত চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু ভাগ্যাকাশে তাঁর সুখ বেশীদিন স্থায়ী হ'ল না। অঘোরবাবু সহসা শয্যাশায়ী হ'লেন। ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে ব'লে গেলেন, নিউমোনিয়া।

শরৎচন্দ্র প্রাণপণে সেবা ক'র্লেন। গিরীনবাবুও তাঁকে সাহায্য ক'র্তে লাগ্লেন। কিন্তু তাঁকে বাঁচান গেল না। তার কিছুদিন পরে সাহেবের সঙ্গে ঝগ্ড়া ক'রে চাকরীতেও ইস্তফা দিলেন।

[শরৎ-পরিচয়, ব্র. না. ব., পৃঃ ২১-২২]

* * * *

অঘোরবাবু যখন মারা গেলেন তখন তাঁর মাসীমা ছিলেন না রেঙ্গুনে। তিনি মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা ক'র্তে ক'ল্কাতায় এসেছিলেন —এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে প্রায় দেড় মাস পরে তিনি রেঙ্গুনে ফিরে এলেন।

অঘোরবাবুর হাত ছিল ভীষণ দরাজ। যা' আয় ক'র্তেন, খরচ ক'র্তেন তার চেয়েও বেশী। ফলে, মারা যাওয়ার সময় রেখে গেলেন প্রচুর দেনা। পাওনাদারেরা ঘিরে ব'স্লো তাঁর মাসীমাকে।

শরৎচন্দ্র কয়েকটি বিশিষ্ট বন্ধুর সহায়তায় তাঁদের জাহাজে তুলে দিতে সমর্থ হ'লেন বটে কিন্তু নিজেকে হ'তে হ'ল আশ্রয়হীন।

নিঃসম্বল অবস্থায় রেঙ্গুন থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে পোজানডং-এ মিস্ত্রী-পল্লীর মধ্যে অল্প ভাড়ায় দোতালায় একটি কাঠের বাড়ী ভাড়া নিলেন। সেখানে বাস ক'র্তো ধানকল, পাটকল, ডক্-ইয়ার্ড ও ঢালাইয়ের কারখানার যত ফিটার, বাইশম্যান ও ঢালায়ের মিস্ত্রী। তাদের অনেকেই ছিল দেশত্যাগী, অল্পশিক্ষিত কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ।

শরৎচন্দ্র ছিলেন সকলের চেয়ে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। অবাধে তাদের সঙ্গে মেলামেশা ক'র্তেন। লিখে দিতেন চাকরীর দরখাস্ত, অসুখ-বিসুখে দিতেন হোমিওপ্যাথি ওষুধ। যারা অসহায় নিজেই ক'র্তেন তাদের সেবা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই বাঁধ্তো বিরোধ—ক'র্তেন সালিশী।

ফলে, সকলেই তাঁকে দেখ্‌তেন শ্রদ্ধার চোখে। ডাকতো "বামুনদা" ব'লে।

* * * *

পুরুষের জীবনের ধর্ম্মই হ'ল—তারা নির্ব্বিকারে ঘরের মধ্যে চুপ্‌চাপ্‌ ব'সে থাক্‌তে পারে না। শরৎচন্দ্র বেকার—সম্বলহীন, তাই ব'লে ত চুপ্‌চাপ্‌ ব'সে থাকা সম্ভবপর নয়! সকালে বেরিয়ে যান চাক্‌রীর সন্ধানে, ফিরে এসে একটু বিশ্রাম যে নেবেন তারও উপায় নেই! একটা না একটা কিছু সে বস্তিতে ঘ'ট্‌বেই ঘ'ট্‌বে। হয় অসুখ, না হয় দাম্পত্য কলহ, নিদেন দু'একটা চাকরীর দরখাস্ত। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্যে মাথা তাঁকেই ঘামাতে হ'তো—নইলে নিজেও স্থির থাক্‌তে পারেন না।

সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত শরৎচন্দ্র সবে শয্যার আশ্রয় নিয়েছেন। রামকমলের স্ত্রী অরুণা, দরজার কড়া নাড়াতে সুরু ক'র্‌লো, দেখ বামুনদা, দেখো—পোড়ারমুখো অবস্থা আমার কি ক'রেছে?

শরৎচন্দ্র শয্যা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। রাত তখন বারোটা।

অরুণা চোখের জলে আবেদন জানালো—ব'লো, তুমিই বলো বামুনদা, দোষ আমার কোথায়? প্রতিদিন মদ খেয়ে জ্বালাতন ক'র্‌বে, এ-পাশে ছেলে-মেয়েগুলো যে না খেয়ে মর্‌ছে, ভুলেও সেদিকে একটিবার তাকাবে না! ব'ল্‌লেই যত ঝাল ঝাড়্‌বে আমার ওপরে। বলতো কেন সহ্য ক'র্‌বো আমি? বিয়ে-করা বউ যে মুখবুজে শুধু লাথি-ঝাঁটা খেয়ে যাবো, একটি কথাও মুখ ফুটে ব'ল্‌বো না? সত্যি ব'ল্‌ছি বামুনদা, তোমার পা' ছুঁয়ে শপথ ক'রে ব'ল্‌তে পারি, শুধু ছেলে-মেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে যত সহ্য ক'রে যাই, পোড়ারমুখোর অত্যাচার ততই বেড়ে চ'লেছে দিনের পর দিন। যদি একটি বিহিত না ক'রে দাও ত গলায় দড়ি দিয়ে মরি!

শরৎচন্দ্র চোখের নিমিষে, সমস্ত ঘটনাটাই অনুমান ক'রে নিলেন। এটা কোন নতুন ঘটনা নয়, নিত্য-নিয়মিতই চ'লেছে। শুধু পাল্টায় ওপর আর নীচো—না হয়, এ ঘর ও ঘর। ব্যথিত কণ্ঠে ব'ল্লেন, না, না, আত্মহত্যা ক'র্তে নেই দিদি, মহাপাপ হয়! চ'ল দেখি, কি ক'র্তে পারি আমি!

ঘুম মাথায় উঠ্লো। শরৎচন্দ্র চ'ল্লেন মধ্যস্থতা ক'র্তে।

শরৎচন্দ্রকে দেখেই রামকমলের নেশা গেল চটে। সচকিত হ'য়ে খাতির ক'রে একটা ভাঙা চৌকি এগিয়ে দিয়ে ব'ল্লো, বসো দা'ঠাকুর!

বিনা ভূমিকায় শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন, তা' না হয় ব'স্লাম—কিন্তু ব্যাপারটা কি বলতো? রাত দুপুরে বৌটাকে মেরে রাস্তায় বার ক'রে দিয়েছো? অপরাধ ত' তার দেখলাম, বার বার তোমায় ছেলে-মেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকাতে বলে। কয়েক মুহূর্ত্ত থেমে ব'ল্লেন—দিনরাত তুমি আছো নেশায় ডুবে! আর ও বেচারা ম'র্ছে খেটে খেটে—তার উপর মার্‌ধোরটা কি ভাল কমল?

রামকমল বিনা দ্বিধায় তার অপরাধ স্বীকার ক'রে নিল। ব'ল্লো, সত্যই দোষ হ'য়ে গেছে বামুনদা! সারাদিন অমানুষের মত খাটি, একটু-আধটু নেশা-ভাঙ্ না ক'র্‌লে শরীরটার বেদ্‌না যে ভাঙে না! এ কথাটা ও শালী কিছুতেই বুঝ্‌বে না! কানের কাছে বার বার ভ্যান্ ভ্যান্ ক'র্‌বে—আচ্ছা, বলতো দা'ঠাকুর, মেজাজ্‌টা কি সব সময়ে ঠিক্ থাকে?

শরৎচন্দ্র ক্ষোভ প্রকাশ ক'র্‌লেন—তা ব'লে তুমি স্ত্রীর গায়ে হাত তুল্‌বে?

রামকমল হাত দু'টো জড় ক'রে ব'ল্লো—অন্যায় হ'য়ে গেছে দা'ঠাকুর, আর কোনদিন ওর গায়ে হাত তুল্‌বো না!

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন, শুধু তাই নয়—যখন রাগ সাম্লাতে না পারবে, আমাদের কীর্ত্তনের আখ্ড়ায় চ'লে এসো। ঠাকুরের নামও হ'বে, মনেও একটু শান্তি পাবে। নাও, এবার তোমরা পরস্পর বোঝাপড়া ক'রে নাও!

রামকমল শরৎচন্দ্রের গতিরোধ ক'রে সাম্নে এসে দাঁড়ালো। অরুণার হাতখানা নিজের হাতে টেনে নিয়ে ব'ল্লো, তুমি সাক্ষী রইলে বামুনদা, আমি বউয়ের গা' ছুঁয়ে শপথ ক'রছি, আর কোনদিন এমন ভুল হ'বে না। তুমি ত বোঝ দা'ঠাকুর, নেশা ক'রলে মানুষের জ্ঞান-গম্যি থাকে না—যদি একটু-আধ্টু ভুল ক'রে বসি—ও তোমায় কথা দিক্, আমাকে তোমাদের আখ্ড়ায় পৌছে দিয়ে আস্বে?

অরুণার রাগ বহু পূর্ব্বেই জল হ'য়ে গিয়েছিল। ব'ল্লো, বেশ তুমি সাক্ষী রইলে দা'ঠাকুর—যদি এতটুকু নড়্চড়্ হয়, ব'লে রাখছি, হাত দুটো ওর প'চে গ'লে খ'সে যাবে!

শরৎচন্দ্র ম্লান হাস্লেন। ব'ল্লেন, ছিঃ দিদি! অমন কথা মুখে আন্তে নেই, তাতে তোমারই দুঃখ বাড়্বে বই কি কম্বে না!

অরুণা চকিতে শরৎচন্দ্রের পায়ের ধূলো মাথায় তুলে নিয়ে ব'ল্লো, তুমি আমায় ঠিকই চিনেছো দা'ঠাকুর। ও পোড়ারমুখো কোন দিনই তা' বুঝ্লে না!

রামকমল তার মুখে হাতখানা চাপা দিয়ে ব'ল্লো—ছিঃ বউ, ভুল জীবনে কে না করে বল্তো? আদর ক'রে তাকে কাছে টেনে নিল।

শরৎচন্দ্র বেরিয়ে প'ড়্লেন। সশব্দে দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেল। ফিরে এলেন নিজের আশ্রয়ে। শয্যাও গ্রহণ ক'রলেন কিন্তু চোখের পাতাগুলো কোন মতেই আর বুজ্তে চায় না। লোকে এদের কতই না ঘৃণার চোখে দেখে, অথচ সাধারণ সংসারীর প্রেম ও প্রীতির চেয়ে

এদের জীবনের মাধুর্য্য কারও চেয়ে এতটুকু কম ত নয়ই বরং বেশীই বলা চলে নিঃসন্দেহে !

এদের দুঃখ ও বেদনাকে তিনি মর্ম্ম দিয়ে উপলব্ধি করেন। সমস্ত সহানুভূতি এদের পাশে গিয়ে বাসা বাঁধে, কিন্তু সেই রুদ্ধ পথের মুক্তির সন্ধান তিনি পান না। অসহায়তার আবর্ত্তে তিনিও ওদের মতই একান্ত অসহায়। মনে শুধু প্রশ্ন জাগে—এর সমাধান কি কোনদিনই সম্ভব হ'বে না ?

* * *

নায়ায়ুনগ্যেবিনের চালের ব্যবসাদার মিঃ পি. কে. মিত্রের অধীনে একটি কাজ যোগাড় ক'র্‌লেন কিন্তু চালের আড়তে তাঁর পক্ষে বেশী দিন কাজ করা সম্ভবপর হ'ল না। কিছুদিন রেল-ষ্টেশনের ধারে শ্রীকৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বসবাস ক'র্‌লেন—তারপর পাত্‌ভাড়ি গুটিয়ে পূর্ব্বের বাসায় ফিরে এলেন।···

তখনও আলোটা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি। আলো-আঁধারের ছায়ার কোলে পাখীর কোলাহল ও জাগরণের উচ্ছ্বাস বার বার কানের পর্দ্দায় এসে ধাক্কা দিচ্ছে। দরজায় কে যেন মৃদু ধাক্কা দিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে ডেকে উঠ্‌লো, দা'ঠাকুর !

শরৎচন্দ্র চেয়েছিলেন নিয়মের শৃঙ্খল ভেঙ্গে শয্যার মায়াকে আরও কিছুক্ষণ আঁকড়ে ধ'রে, বিনিদ্র রজনীর সুখ-পরশকে মধুময় ক'রে তুল্‌বেন! কিন্তু সে তৃপ্তি-বোধের নেশা, কর্ত্তব্যের আহ্বানে ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, কে ? নবীন ?

নবীন হাতদুটো কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে উত্তর দিলে—হ্যাঁ, দা'ঠাকুর !

শরৎচন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন তুল্‌লেন, এত ভোরে যে ?

আজ্ঞে—নবীন একটু টেনে উত্তর দিল, সাহেব কাল রাগ ক'রে বরখাস্ত ক'রে দিয়েছে। একটু ভোর ভোর গিয়ে ধ'র্‌তে না পার্‌লে—কাজ ত' আর পাবো না! এতগুলো কাচ্ছাবাচ্চা নিয়ে খাবো কি?

শরৎচন্দ্র সমস্তই বুঝে নিলেন। এর বৈশিষ্ট্যও নেই, বৈচিত্র্যও নেই। কথায় কথায় এদের চাকুরী যায়, আবার একটু বিনিয়ে বিনিয়ে দরখাস্ত দিলেই কাজও হয়, সুতরাং দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রয়োজন বোধ তিনি ক'র্‌লেন না। ঘরের মধ্যে তাকে বসিয়ে মোমের বাতিটা জেলে ব'সে গেলেন দরখাস্ত লিখ্‌তে। মাঝপথে একটু থেমে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, অপরাধটা ক'রেছিলে কি?

নবীন উত্তর দিল, একটু ঢুলেছিলাম।

বাকীটুকু শেষ ক'রে ব'ল্‌লেন, যাও মেমসাহেবকে ধরগে যাও—চাক্‌রীর নড়চড়্‌ আর হবে না!

নবীন পায়ের ধূলো মাথায় তুলে নিয়ে ব'ল্‌লো, সবই তোমার দয়া দা'ঠাকুর!

শরৎচন্দ্র বাধা দিলেন, দূর পাগোল! আমি কে? সবই তাঁর ইচ্ছে! যাও যাও, বেলা হ'য়ে গেল, সাহেব আবার বেরিয়ে প'ড়্‌বে।

* * *

সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহে শরৎচন্দ্র সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠ্‌ছেন, সামনে এসে দাঁড়ালো একটি মেয়ে। ব'ল্‌লো—বাবার আজ দু'দিন অসুখ, মা'র জ্বর, একটিবার দেখে আস্‌বে চল না দা'ঠাকুর!

শরৎচন্দ্র এত ক্লান্তি বোধ ক'র্‌ছিলেন যে, পূর্ব্বেই স্থির ক'রে রেখে-ছিলেন বাসায় ফিরেই শয্যার আশ্রয় নেবেন। কিন্তু দুঃস্থ পীড়িতের

সংবাদে তাঁর সেই দৃঢ়তা চকিতে ম্লান হ'য়ে গেল। তিনি চাবি খুলে ওষুধের ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে প'ড়লেন পরমুহূর্ত্তে।

* * * *

রোগীর অবস্থা ভাল নয়। পরীক্ষার পর ওষুধ দিলেন। রোগী যন্ত্রণায় কাতর। তবুও বলে, আর কিছু চাইনি দা'ঠাকুর! তোমার পায়ের ধূলো একটু দাও, যেন সেরে উঠ্‌তে পারি তাড়াতাড়ি!

স্ত্রী অনুভার অবস্থা আরও শোচনীয়। কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, ওকে কেমন দেখ্‌লে বামুনদা'? বাঁচ্‌বে ত?

শরৎচন্দ্র তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হ'লেন। যে মৃত্যু-পথের যাত্রী, তার নিজের জন্যে এতটুকুও চিন্তা নেই, শত চিন্তা তার স্বামীকে কেন্দ্রীভূত হ'য়ে আছে। অথচ এই অনুভার নামে কত কুৎসাই না শুনেছেন তিনি। সে না কি স্বামী ছেড়ে অভয় চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে পালিয়ে এসে—ঘর বেঁধেছে এই বর্ম্মামুলুকে। তার চরিত্র নাকি মোটেই সুবিধে গোছের নয়। শরৎচন্দ্র দূরে বসে সব শোনেন—লক্ষ্য ও করেন। অথচ যারা তার সমালোচনায় মুখর, তারাও কিন্তু কেউ সতী সাবিত্রী নয়—তাদের পিছনেও আছে এই ধরণের একটা না একটা প্রচ্ছন্ন ইতিহাস। তারাও স্বেচ্ছায় পাড়ি দিয়েছে বর্ম্মামুলুকে, মনে-প্রাণে যাকে চেয়েছিল তাদের নিয়ে সুখে ঘর সংসার বাঁধ্‌তে। তবুও তারা অপরের নিন্দা করে, কাল্পনিক কুৎসা রটিয়ে আনন্দ উপভোগ করে। হয়ত এটা আত্মপ্রতারণার একটি প্রকৃষ্ট পথ ও পন্থা—নিজেকে ভুলিয়ে রাখার সুযোগ ও সুবিধা। তাই তারা নিজের বিগত জীবনের ইতিহাস, অপরের কুৎসার আবর্জ্জনায় ঢেকে আনন্দে বিগলিত হ'য়ে ওঠে!—তাই ত তারা এই ভুলে-ভরা পৃথিবীকে ভুলের আবর্ত্তে নিমজ্জিত ক'রে আত্মপ্রশংসায় মুখরিত হ'য়ে ওঠে!

ঘৃণাটা তাদের আত্মপ্রতারণার আবরণ মাত্র—তার বেশী মূল্য যারা দেয়—তারা নিজেরাও ঠকে—অপরকেও ঠকায়।

শরৎচন্দ্র আশ্বাস দিলেন,—কোন ভয় নেই! দু'দিনেই সেরে উঠ্‌বে।

বিশ্বাসের জোরেই অনুভা সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌লো। অভয়ও কাজে পুনরায় যোগ দিল। ব'ল্‌লো—তুমিই আমাদের প্রাণ দিলে ঠাকুর!

শরৎচন্দ্র লজ্জায় ম্লান হ'য়ে গেলেন। ব'ল্‌লেন—ওরে পাগলের দল এ-কথা কেন বারে বারে ভুল করো?—আমি কেউ নই—বরং যাঁর কাজ—তাঁরই উপলক্ষ্য মাত্র! দেখেছ ত যন্ত্র—নানা অংশের সমাবেশ—মানুষও ঠিক তাই। সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকে পূর্ণতর ক'র্‌তে পাঠিয়েছেন আমাদের একে একে—তার বেশী আমরা কেউ নই, সে শক্তিও আমাদের নেই। তাই বলি—কৃতজ্ঞতা যদি সত্যই প্রকাশ ক'র্‌তে চাও—তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থেকো—তাঁর সৃষ্টিকে ভালবেসো—পথ তিনিই দেখিয়ে দেবেন।

*　　　*　　　*

যতীনমিস্ত্রীর মেয়ের বিয়ে। এসে ধ'র্‌লো—তোমায় যেতে হ'বে দা'ঠাকুর!

শরৎচন্দ্র হাসিমুখে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'র্‌লেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নিমন্ত্রিতদের খাওয়ালেন, নিজেও আহার ক'র্‌লেন। তার মেয়ে-জামাইকে একটা রূপোর সিঁদুর কৌটো উপহার দিয়ে ব'ল্‌লেন—আশীর্ব্বাদ করার অধিকার যদি সত্যই কোন মানুষের থাকে, আমি সেই আশীর্ব্বাদই ক'র্‌ছি তোমাদের—যেন এইটুকুর মর্য্যাদা তোমরা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হও!

*　　　*　　　*

বার্ম্মার পাব্‌লিক ওয়ার্কস একাউণ্টস্‌ অফিসের সহকারী ও অধুনা পেগুর এড্‌ভোকেট্‌ মিঃ এন. কে. মিত্রের বাড়ীতে কিছুদিন বসবাস

ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেন শরৎচন্দ্র। এই সময়েই এম্, কে. মিত্র ম'শায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় ঘটে। তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতে মুগ্ধ হ'য়ে একান্ত অনুরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন; এবং তাঁর টম্‌সন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বসবাস করার অনুরোধ জানালেন। তাঁরই সুপারিশে ও একান্ত অনুরোধে গঙ্গারাম কাউলার, একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ার অফিসে (পেগু), একটি চাকরী ক'রে দিলেন। সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার সি. কে. সরকারম'শায় পি. ডবলিউ. ডি. অফিসে এ্যাসিষ্টান্ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। একই বিল্ডিংএর দুই প্রান্তে দুইটি অফিস। আলাপ-আলোচনার সুবিধা হওয়ায় পরস্পরের যথেষ্ট প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হ'য়েছিল।

একদিন বিলিয়ার্ড খেলা চ'ল্‌ছে। বেয়ারা এসে একজন বাবুকে এক পেগ হুইস্কি দিয়ে গেল। তাই দেখে শরৎচন্দ্র মিঃ সরকারকে ব'ল্‌লেন—সরকার, আমাকেও এক পেগ দিতে বলো!

মিঃ সরকারের নির্দ্দেশমত বেয়ারা এক পেগ শরৎচন্দ্রের হাতে দিয়ে গেল। শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে গলধঃকরণ ক'রে বিলিয়ার্ড খেলায় মন দিলেন।

খেলা কিছুক্ষণ চলার পর মিঃ সরকার ব'ল্‌লেন, চল শরৎ—এবার বাসায় ফেরা যাক্!

শরৎচন্দ্র ব'ললেন, এরই মধ্যে কি বাড়ী ফেরা যায়? শরৎচন্দ্র খেল্‌তে লাগ্‌লেন। মিঃ সরকার বাড়ী ফেরার জন্যে গাড়ীর তৈরী ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। হঠাৎ তাঁর চোখ প'ড়্‌লো, গাড়ীর মধ্যে যে একটি বোতল জিন্ ছিল তা' উধাও হ'য়েছে। বিস্মিত হ'য়ে তিনি গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন—শরৎচন্দ্র সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, গাড়ী থেকে নাম্‌লে যে সরকার?

মিঃ সরকার ব'ল্‌লেন—গাড়ীতে একটা জিনের বোতল রেখেছিলাম খুঁজে পাচ্ছি না!

ওঃ! ওটা জিনের বোতল? আমি জলের বোতল ভেবে এক বোতল হুইস্কির সঙ্গে খেয়ে ফেলেছি!

বল কি?

হ্যাঁ—বেমালুম খেয়ে ফেলেছি!

সভয়ে মিঃ সরকার ব'ল্লেন—ক'রেছো কি? জিনের সঙ্গে হুইস্কি? মারা প'ড়্বে যে! চলো, চলো—বাড়ী ফিরে চলো!

শরৎচন্দ্র বাধা দিলেন না। গাড়ীতে উঠে ব'স্লেন। ব'ল্লেন, আরে মিছে ভয় পেও না—এতে আমার কিছু হ'বে না!

গাড়ী শরৎচন্দ্রের বাসার সাম্নে থাম্লো। মিঃ সরকারের তখনও ভয় দূর হয়নি! কি ব'ল্তে কি হবে কে জানে?

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাসার ভেতরে গিয়ে ঢুক্লেন। শরৎচন্দ্র তেমনি নির্ব্বিকার। চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে ব'ল্লেন, বসো! তারপর টেবিলের উপর থেকে একটা কৌটো বের ক'রে দুটো মটর দানার মত একটা ঢেলা আফিং মুখে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে গলধঃকরণ ক'র্লেন।

সভয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ সরকার। বাধা দিয়ে উঠ্লেন, আরে করো কি?

শরৎচন্দ্র অভয়-হাসি হাস্লেন—এতেও নেশা আমার হয় না!

[বাতায়ন, শরৎ-সংখ্যা—১৩৪৮, ব্রহ্মপ্রদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—বিচারপতি মিঃ এ. এন. সেনের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। অনুবাদক সুধাংশু গুপ্ত ও মিঃ সি. কে. সরকারের অভিমত।]

* * * *

১৯০৫ সাল। নবীনচন্দ্র এলেন রেঙ্গুনে। প্রবাসী বাঙালীদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান রেঙ্গুন সোসিয়্যাল ক্লাব তাঁকে অভিনন্দন পত্রে অভিনন্দিত ক'র্বে স্থির ক'র্লো।

শরৎচন্দ্রের উপর ভার প'ড়্‌লো—অভ্যর্থনা সঙ্গীত গাইবার। তিনি ভাবাকুলতার সঙ্গে মধুর কণ্ঠে গাইলেন—

ব্রহ্ম ভূমি সুশোভিত বঙ্গ রতন আজি হে,
এস কবিবর এস হে!
সমবেত যত দেশবাসী—
দর্শন তব অভিলাষী
এস কাব্য বিলাসী শশী হে!
এস বঙ্গ হৃদয় ভূষণ—
এস সুন্দর প্রিয় দর্শন
প্রীতি পুষ্পডালি লহ হে।
এস কবিবর এস হে। [ব্রঃ দেঃ শঃ হইতে গৃহীত]

গায়কের মধুর কণ্ঠস্বরে নবীনচন্দ্র মুগ্ধ হ'লেন। গান শেষ হ'লেই, গায়কের ডাক প'ড়্‌লো। কিন্তু সকলে সবিস্ময়ে দেখ্‌লেন—গায়ক পালিয়েছেন সকলের অজ্ঞাতে।

* * * *

কবিবরের বার বার অনুরোধে শরৎচন্দ্র দেখা ক'র্‌তে রাজি হ'লেন—কিন্তু সিঁড়ির পাশে ড্রয়িংরুমে কবিকে জজ মিঃ যতীশ দাসের সঙ্গে কথা কইতে দেখেই সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে ছুট্ দিলেন। কেউ সিঁড়িতে প'ড়ে গেছে ভেবে কবির বাড়ীর সকলে বেরিয়ে এলেন। দেখ্‌লেন—শরৎচন্দ্র ছুটে পালাচ্ছেন, সিঁড়িতে প'ড়ে র'য়েছে তাঁর এক পাটি জুতো।

[ব্রঃ দেঃ শঃ—গি. না. স.]

* * * *

রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মমহোৎসবের ব্যবস্থা হ'ল। বার বার ভাগ্য বিড়ম্বনায় শরৎচন্দ্রের মনে একটা বৈরাগ্য-ভাব সে সময়ে দেখা দিয়েছিল এবং স্পেন্সারের সোস্তিওলজী পাঠেও তখন ভীষণ ব্যস্ত। যোগ দিলেন সে উৎসবে। নিজের আখ্ড়া থেকে কীর্ত্তনের দল আনালেন। দরিদ্র ভোজন শেষ হ'লে পর কীর্ত্তন সুরু ক'র্লেন।

শরৎচন্দ্র নিজে গাইলেন—

তেমনি ক'রে আবার এসে ডাকাও ঠাকুর প্রেমের বান!
তাতে ভেসে যাবে ডুবে যাবে জীবের দারুণ অভিমান!!
সেদিন যেমন জীবের লাগি' "কথামৃত" ক'র্লে দান!
প্রেম পিয়াসী, বিশ্ববাসী, প্রেমের সুধা ক'র্ছে পান!!
যাতে মৃণ্ময়ী চিন্ময়ী হ'ল, শেখাও সেই প্রাণের টান!
তেমনি প্রাণ মাতানো "মা"-"মা" রবে আকুল করো সবার প্রাণ!
(আমার) হয়নি জনম এলে যখন, নবরূপী ভগবান!
(সেই) অপূর্ণ সাধ পুরাইতে হৃদে তোমায় দিব স্থান!!
তাতে সরস হ'বে হৃদয় মরু, ছুটবে হৃদে প্রেমের বান!
প্রাণ ভ'রে সবাই মিলে গাইব "জয় রামকৃষ্ণ" গান!!

[ব্রঃ দেঃ শঃ হইতে গৃহীত]

শরৎচন্দ্রের এই মধুর কণ্ঠস্বরে সকলেই মোহিত হ'য়ে প'ড়্লেন।

* * *

সোয়েডাগন প্যাগোডা দর্শন ক'রে পাশের একটি নির্জ্জন স্থানে ব'সে স্বামি রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র আলাপ-আলোচনা সুরু ক'র্লেন—আচ্ছা স্বামিজী, আমরা ঈশ্বরকে দেখ্তে পাইনে কেন?

স্বামিজী ব'ল্লেন—ঠাকুর ব'ল্তেন সমুদ্রে রত্ন আছে, যত্ন চাই। সংসারে ঈশ্বর আছেন, সাধনা চাই। পানায় ঢাকা পুকুরের সাম্নে দাঁড়িয়ে যদি জল দেখ্তে চাও, পানা তোমায় সরাতেই হ'বে। তেমনি মায়ায় ঢাকা চোখ নিয়ে ঈশ্বরকে দেখা যায় না—মায়াকে সরিয়ে ফেল্তে হ'বে।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্লেন—মায়া বস্তুটা কি?

স্বামিজী ব'ল্লেন—বিষয়বস্তু ও কামিনীকাঞ্চনে ডুবে থাকাটাই মায়া। এদের মোহ ছিন্ন ক'রে সরল প্রাণে তাঁকে ডাক্তে পার্লেই মন শুদ্ধ হবে, তাঁর দয়াও হ'বে।

শরৎচন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন ক'র্লেন,—শুনেছি, তিনি মঙ্গলময়, তা'হলে এ পৃথিবীতে এত দুঃখ কেন?

স্বামিজী উত্তরে মৃদু হাস্লেন। ব'ল্লেন—এ সংসারে যাকে আমরা দুঃখ বলি—সেটা আসলে দুঃখ নয়, ওটা হ'ল তাঁর দীক্ষা। সুখ পেলেই মানুষ তাঁকে ভুলে যায়, নিজেকে নিয়ে মাতামাতি করে, ব্যথারূপী দুঃখ পেলেই তাঁকে মনে পড়ে। দুঃখটাই সবচেয়ে এ পৃথিবীর প্রিয় বস্তু, নইলে তাঁকে স্মরণ ক'র্বো কেন? তাঁর মহিমা উপলব্ধির অবসর পাবো কেমন ক'রে?

শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনা হ'য়ে প'ড়্লেন। ব'ল্লেন—আচ্ছা, অদৃষ্ট, দৈব ও পুরুষাকার কথাগুলোর অর্থ কি স্বামিজী?

স্বামিজী ব'ল্লেন—পূর্ব্বজন্মের অর্জিত ফসলটার নামই অদৃষ্ট; অবশ্য বর্ত্তমান-জীবনের খানিকটা অংশও তার সঙ্গে জড়িত র'য়েছে; যাকে আমরা চল্তি কথায় বলি কর্ম্মফল। আর দৈব ও পুরুষাকার দুটোই এক। এক ছাড়া অন্যের গতি নেই। তাই দৈবের সাধনায় পুরুষাকারের আবশ্যক হয়, আবার পুরুষাকার দ্বারা কর্ম্মসাধনায় দৈব বা ভগবৎ কৃপার আবশ্যক হ'য়ে থাকে।

শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থেকে কি যেন ভেবে নিয়ে পুনরায় মুখর হ'য়ে উঠ্লেন, গেরুয়া না প'রে সন্ন্যাসী হওয়া যায় কি ?

স্বামিজী ব'ল্লেন—ধর্ম্ম হ'চ্ছে, মনের। গেরুয়া না প'রেও মুক্ত হওয়া যায়। মানুষ মনেই বদ্ধ—মনেই মুক্ত। তাই আগে চাই মন, পরে চাই বাইরের সাহায্য। মন যদি ভাল হয়, এই বাইরের গেরুয়া তোমার সাহায্য ক'র্বে—নইলে ভণ্ডামীর সহায়তা ক'র্বে।

শরৎচন্দ্র ও স্বামিজী উভয়েই উঠে দাঁড়ালেন। চ'ল্তে চ'ল্তে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্লেন—মেয়েদের সেবা কি আদর্শনীয় নয় ?

স্বামিজী থম্‌কে দাঁড়ালেন। ব'ল্লেন—দেখ শরৎ, সতীর পতিসেবার মধ্যেও একটু স্বার্থগন্ধ থাকে, নিঃস্বার্থ সেবা তাই মেয়েদের দ্বারা সম্ভব নয়। হাসপাতালে অনেক মেয়েকে নার্সের কাজ ক'র্তে দেখ্বে, কিন্তু তারা কি সত্যই নিজের স্বামী-পুত্রের মত সেবা ক'র্তে পারে ? না, পেরেছে কোনদিন ? মুখোস প'র্লে আকৃতিটা হয়ত মেলানো সম্ভব, কিন্তু আন্তরিকতা কোনদিন সম্ভব নয়। তাই মঠের ছেলেরা পথ থেকে কুড়িয়ে এনে "পীড়িত নারায়ণ" ভেবেই নিঃস্বার্থ সেবা ক'র্তে সক্ষম হয়।

শরৎচন্দ্র এতক্ষণে যেন তাঁর প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেলেন। সানন্দে ব'লে উঠ্লেন—কেন জানি না স্বামিজী, আপনার কথাটাই আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস ক'র্তাম—আজ তা মিলিয়ে নেওয়ার সুযোগ হ'য়ে গেল।

স্বামিজীও খুশী হ'লেন। ব'ল্লেন—মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন। প্রাণে যে প্রশ্ন ওঠে—তিনিই তার সকল সময়ে উত্তর দিয়ে থাকেন—চাই শুধু সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি।

[ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র, গী. না. স.]

* * *

১৯০৬ সালের মার্চ্চ মাসে চাকরী খুইয়ে পুনরায় বেকার হ'লেন শরৎচন্দ্র। সময় আর কিছুতেই কাটে না ! মাঝে মাঝে তাই চঞ্চল হ'য়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ছুটতেন শীকারে। কখনও ধ'র্তেন মাছ, কখনও বা বন্দুক নিয়ে ছুটতেন পেগুতে।

একদিন সকলে রসুল বক্সের পুকুরে (পেগু) মাছ ধ'রতে গেলেন। নিজে নিলেন ছিপ আর বন্ধুরা নিলেন হুইল। বন্ধুদের হুইলে মাছ ঠোকর দেয় না, আর তিনি প্রতিটি টোপে ধ'রে চ'লেছেন পুঁটিমাছ।

হঠাৎ এক বন্ধুর হুইলে একটা বড় মাছ গেঁথে গেল। মাছটা খেলতে লাগ্‌লো। শরৎচন্দ্র আনন্দে অধীর হ'য়ে চীৎকার সুরু ক'রে দিলেন, ভ্যালারে মোর ভাইসাহেব !

মাছটা একেবারে ধারে এসে হুইলের সুতো ছিঁড়ে সশব্দে পালালো। শরৎচন্দ্র সখেদে ব'লে উঠ্‌লেন, ঘোচালে ব্যাটা আহাম্মক !

সবাই হেসে উঠ্‌লো। একটি বন্ধু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, এর মানে কি শরৎ-দা ?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, এটা আমার দেখে শেখা ভাই ! লালদিঘীতে একটা বুড়ো চাটগেঁয়ে মুসলমানকে প্রায়ই মাছ ধ'র্‌তে দেখ্‌তাম। যখন মাছ গাঁথ্‌তো তার ছিপে, সে আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠ্‌তো "ভ্যালারে মোর ভাইসাহেব" আর পালিয়ে গেলেই কপাল চাপ্‌ড়াতো আর ব'ল্‌তো—"ঘোচালে ব্যাটা আহাম্মক !"

সকলে হাসিতে ফেটে প'ড়্‌লো। ব'ল্‌লো, তোমার আবিষ্কার বটে একটা শরৎ-দা !

[ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র, গী. না. স.]

* * *

মাছ-ধরা পর্ব্ব শেষ ক'রে বেরুলেন জঙ্গলে শীকারের আশায়। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, ছোট কিছু শীকারে সম্ভ্রম নষ্ট

ক'রতে তিনি রাজী নন। হয় বাঘ, না হয় বড় মোটাসোটা একটা হরিণ বধই তাঁর কাম্য!

হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলে ঢুকলেন। বহুক্ষণ ব'সে ব'সে মশার কামড় খেলেন। কোন কিছুই চোখে প'ড়্লো না।

হঠাৎ হাত কয়েক দূরে পিছনের ঝোপের পাশে দুটো পাথরের মাঝখানে একটা গোখ্‌রো সাপ ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে ফণা তুলে দুল্‌তে লাগ্‌লো। শব্দ শুনে পিছনের দিকে তাকিয়েই সকলের অন্তরাত্মা খাঁচা। কে কোন্ দিকে পালাবে সেই পথ নির্ণয়ে সবাই ব্যস্ত।

সাপটা দুল্‌ছে আর গর্জ্জাচ্ছে। শরৎচন্দ্র অনুমান ক'রে নিলেন, যে কোন মুহূর্ত্তেই সাপটা ছোবল্ মারতে পারে। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সবলে পাথরটির উপর আঘাত ক'রে ছুট্ দিলেন ঝোপের মধ্য দিয়ে।

বাইরে যখন সব বেরিয়ে এলেন, তখন গা-হাত-পা ছোড়ে গেছে। পোষাক-পরিচ্ছদ কারও বা ছিঁড়ে গেছে, কারও বা ধূলো-বালিতে মলিন হ'য়ে গেছে। রক্ত চারপাশ থেকে ঝরে প'ড়্‌ছে।

শরৎচন্দ্র সহসা ঘুরে দাঁড়ালেন। ব'ল্‌লেন, দূর! ভীতুর মত সব পালিয়ে এলাম! কি জাতের, একটিবার ভাল ক'রে দেখে এলেই হ'তো।

এতবড় বিপদের মধ্যেও বন্ধুদের মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌লো। তাঁদের মধ্য থেকে একজন ব'লে উঠ্‌লেন, দূর থেকে দেখেই প্রায় ধাতছাড়া—কাছে গিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লে যে প্রাণ নিয়ে আর পালাতে হ'তো না—সে কথা আমি হলপ্ ক'রে ব'ল্‌তে পারি!

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, যে ভয় তোমরা দেখালে! নইলে নিশ্চয় আমি পরীক্ষা ক'রে একবার দেখ্‌তাম্, কোন্ জাতের—কিং কোব্‌রা, না শঙ্খচূড়া?

ঠিক সেই সময়ে একটা বার্ম্মিজ্ ছেলেকে একটা দা নিয়ে বনের

দিকে রওনা হ'তে দেখা গেল। শরৎচন্দ্র বাধা দিলেন—যেয়ো না খোকা, একটা সাপ আমাদের একটু আগেই তাড়া ক'রেছিল !

ছেলেটি হাসিতে ফেটে প'ড়্লো। ব'ল্লো, ওদের আমরা ভয় করি না ! এক্ষুনি ধরে নিয়ে আস্তে পারি।

শরৎচন্দ্র বিস্ময়ে ফেটে প'ড়্লেন। ব'ল্লেন, বলো কি ?

ছেলেটি সগর্ব্বে জবাব দিল—পাঁচ্টা টাকা দাও, এক্ষুনি ধ'রে নিয়ে আস্ছি !

শরৎচন্দ্র রাজী হ'য়ে গেলেন। ছেলেটাও কয়েক মিনিট পরে সেই প্রকাণ্ড গোখ্রো সাপটাকে ধ'রে নিয়ে হাজির হ'লো।

সকলেই হতবাক্। শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্লেন, ধ'র্লে কেমন ক'রে ?

ছেলেটা তার বাঁ হাতের কব্জির মধ্যে একটা সেলাইয়ের দাগ দেখিয়ে ব'ল্লো, গাছের শিকড় আছে ওর ভেতরে, তাই ত ধ'র্তে পারি ! মুখখানা তার হাসিখুশীতে ভ'রে উঠ্লো। এক হাতে তার সাপ—অন্য হাতে দা। তিনটে আঙুল বাড়িয়ে ব'ল্লো, টাকা দাও—

শরৎচন্দ্রের কাছে তখন পাঁচটাকা ছিল না। সে খেয়ালও তাঁর ছিল না। অবশেষে দু'টাকায় রফা ক'রে সদলবলে রওনা হ'লেন সহরের দিকে।

* * *

১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে রেঙ্গুনের পাব্লিক ওয়ার্কস একাউন্টস অফিসে মিঃ এম. কে. মিত্রের (একজামিনার অফ্ একাউন্টস) সুপারিশে পুনরায় চাকরীতে বাহাল হ'লেন। একদিন ছুটি উপভোগ ক'রে মিঃ চ্যাটার্জ্জির (ইনি ছিলেন শরৎচন্দ্রের গানের একজন পরম ভক্ত, এবং পেগুতে অবস্থানকালীন চাকুরে জীবনের ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মী)

সঙ্গে শরৎচন্দ্র পেগু থেকে রেঙ্গুনে ফির্‌ছেন। সে-সময়ে পুনরায় তিনি সাহিত্য-সেবায় মন দিয়েছেন। গল্পের প্লট তৈরীর চিন্তায় তখন তিনি তন্ময়। সেই চিন্তার জটিল আবর্ত্তে তিনি একটু অন্যমনা হ'য়ে পড়েছিলেন। ষ্টেশনে পৌছেই মিঃ চ্যাটার্জ্জী টিকিট কাট্‌তে গেলেন। শরৎচন্দ্র সাম্‌নের ট্রেণে উঠে একটা কোণ বেছে নিয়ে নিশ্চিন্তে ধপ্‌ ক'রে ব'সে প'ড়্‌লেন। জানলার ফাঁক দিয়ে নীল স্বচ্ছ আকাশ দেখা যাচ্ছে। সেইদিকে তাকিয়ে তিনি তাঁর হারানো খেই খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌লেন।

ট্রেণখানা কিছুক্ষণ পরেই হুইসিল দিয়ে ছেড়ে দিল। মিঃ চ্যাটার্জ্জী তখনও ফিরে আসেননি।

শরৎচন্দ্রের কোন খেয়ালই ছিল না। ট্রেণ চ'ল্‌লো এগিয়ে।

পরের ষ্টেশনে ট্রেণ থাম্‌লো। কোলাহলে সহসা চমক ভেঙে গেল। চেয়ে দেখ্‌লেন, তিনি চলেছেন বিপরীত দিকে। চট্‌ ক'রে নেমে প'ড়লেন সেইখানে। প্রায় ঘণ্টা দুই অপেক্ষার পর ফির্‌তি ট্রেণে পুনরায় ফিরে এলেন রেঙ্গুন সহরে। রাত তখন প্রায় দুটো। সবিস্ময়ে মিঃ চ্যাটার্জ্জী জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, ব্যাপার কি শরৎ-দা ? তোমাকে যে খুঁজে খুঁজে আমি সারা হ'য়ে গেলুম !

শরৎচন্দ্র সহাস্যে সমস্ত ঘটনাটি বিবৃতি ক'র্‌লেন। সবাই হাসিতে ফেটে প'ড়্‌লেন। ব'ল্‌লেন—না শরৎ-দা, দেখ্‌ছি তোমার মাথায় একটু ছিট্‌ আছে !

[শরৎ-পরিচয়, ব্র. না. ব., পৃঃ ৬৮ ও বাতায়ন, শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা, ১৩৪৮]

* * *

মিঃ প্যাথম্ নামে এক মাদ্রাজী খৃষ্টান সাহেবের শীকারের খুব সখ ছিল। তিনি প্রায় শরৎচন্দ্রকে তাঁর শীকারের সঙ্গী ক'র্তেন। একদিন বাঘ শীকারের আশায় বহুক্ষণ এ ঝোপ ও ঝোপ ক'র্লেন: বাঘ ত দূরের কথা, একটা পাখীর সন্ধানও পেলেন না। শেষে অধৈর্য্য হ'য়ে এক ঝাঁক উড়ন্ত বকের দিকে লক্ষ্য ক'রে শরৎচন্দ্র একটা গুলি ছুঁড়্লেন। পরক্ষণে একটা গোদা চিলকে ঝপ্ ক'রে মাটিতে প'ড়্তে দেখা গেল। উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হ'লেন। গুলি ছোড়া হ'ল বকের ঝাঁক লক্ষ্য ক'রে, চিল এলো কোথা থেকে? শরৎচন্দ্রের লক্ষ্য কোনদিন ত ভ্রষ্ট হয় না!

শরৎচন্দ্র কিন্তু এই নিরীহ জীব হত্যায় লজ্জায় ম্লান হ'য়ে প'ড়্লেন। যাদের তিনি লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়েছিলেন—তারাও নিরীহ, কিন্তু তাদের বধের একটা উপলক্ষ্য আছে, মানুষের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ খাদ্য ও খাদক, আর এটা একটা চিল—যার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই মানুষের।

শরৎচন্দ্র বালকের মত মরা চিলটা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'র্তে লাগ্লেন। অবশেষে আবিষ্কার ক'র্লেন, গুলির দাগ তার অঙ্গে যখন নেই, তখন নিশ্চয় বেটা "হার্ট্ফেল" ক'রেছে!

বন্ধুর দল মুচ্কি হাস্লেন। শরৎচন্দ্র তা' দেখেও দেখ্লেন না। অপরাধটা তাঁর বুকে বার বার খচ্খচ্ ক'রে বিঁধ্তে লাগ্লো। ঠিক সেই সময়েই দূরে একটা হরিণশিশুকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। শরৎচন্দ্র অন্যদিন নিজেই উপযাচক হ'য়ে শীকারীদের বাধা দেন, আজ কিন্তু এতখানি অপ্রস্তুত হ'য়ে প'ড়েছিলেন যে, বিচার-বিবেচনার ধারই তিনি ধার্লেন না। বন্দুক নিয়ে ছুট্লেন তার পিছু পিছু।

কিছুক্ষণ পরে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলেন। ব'ল্লেন—বরাতটাই আজ খারাপ হে! শেষে দেখ্লাম ওটা একটা শেয়াল-বাচ্চা।

হাসির বেগ কেউ সংযত ক'র্তে পার্লেন না। কারণ ও-বস্তুটা

বর্ম্মামুলুকে প্রায় ছুষ্প্রাপ্যই বলা চলে! যাদুঘরে তাই একটি শেয়ালকে সযত্নে পুষে রাখা হ'য়েছে।

শরৎচন্দ্র কিন্তু এতটুকুও লজ্জা বোধ ক'র্‌লেন না। তিনিও সে হাসিতে অবলীলাক্রমে যোগ দিয়ে কলহাস্যে সেই নির্জ্জন স্থানটাকে মুখর ক'রে তুল্‌লেন।

* * *

"হাইড্রসিল্‌" রোগে আক্রান্ত হ'য়ে ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি ক'ল্‌কাতায় পাড়ি দিলেন। কারমাইকেল কলেজে ভর্ত্তি হ'লেন কিন্তু একটা অপারেশন্‌ রোগীর পেটে ফ'র্‌সেপ দেখে, কলেজ থেকে পালিয়ে গেলেন। পরে পুনরায় অপারেশন্‌ করিয়ে ফেব্রুয়ারী মাসে ফিরে গেলেন বর্ম্মায়।...

সেদিন তিনি অফিস থেকে ফিরে, জামা-কাপড় ছেড়ে গড়গড়ায় মৌজে সবে ছু'এক টান দিয়েছেন, একটা লোক সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। সেলাম দিয়ে মোড়া একটা কাগজ তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ব'ল্‌লো—গিরীনবাবু ভেজ্‌ দিয়া।

শরৎচন্দ্র চিঠিখানা খুলে দেখ্‌লেন, কুঞ্জবাবুর স্ত্রী গিরীনবাবুর মারফৎ একটি নবাগত স্বামী-স্ত্রীর বাসের উপযুক্ত বাসা দেখে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। ইনি নবাগত বাঙালীমহলে 'দিদি' নামে পরিচিত। তা'ছাড়া তিনিও তাঁদের বাড়ীতে কাজকর্ম্মে বহুবার আমন্ত্রিত হ'য়েছেন। উৎসবে যোগ দিয়ে তাঁদের গানও শুনিয়ে এসেছেন। কাজেই অনুরোধটা এড়াতে পার্‌লেন না। সেই পোষাকেই তিনি বেরিয়ে প'ড়্‌লেন বাড়ীর সন্ধানে।

বেয়ারাটাকে বসিয়ে রেখে গেলেন। মনে একটা ক্ষীণ আশা যদি সন্ধান পাওয়া পাওয়া যায়—! কিছুক্ষণ পরে খুশী মনে ফিরে

এলেন। চিঠি একখানা লিখে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে—'তাঁরই বাসার কিছু দূরে একটি বাড়ী খালি আছে। ছাপোষা মধ্যবিত্তের বাসের উপযুক্ত। ভাড়া যৎকিঞ্চিৎ ব'ল্‌লে অত্যুক্তি হ'বে না।'

পরদিন অফিস যাওয়ার পথে গিরীনবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। ব'ল্‌লেন, বাসাটা ঠিক ক'রে ফেলো শরদা! দিদি ওদের নিয়ে বড় বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছেন।

শরৎচন্দ্র সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই গিরীনবাবু ব'ল্‌লেন, শুন্‌লাম মেয়েটার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, দুই বন্ধু এ মুলুকে ওকে নিয়ে হাজির হ'য়েছে। একটু থেমে সখেদে ব'ল্‌লেন—মেয়েটি রূপেগুণে সত্যই যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা—ভাগ্য ব'লে একেই! তবে বন্ধুলোকটি ভাল ব'লেই মনে হ'ল—বিশেষ ক'রে বেচারা অভাবী, তা' তার চেহারা ও পোষাকই প্রমাণ দিয়ে যায়।

অফিসের সময় হ'য়ে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে গল্প করার অবসর নেই। শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—পরে কথা হ'বে গিরীন। আলাপও নিশ্চয় হ'বে মিঃ হাস্‌ব্যাণ্ড ও মিঃ ক্রেণ্ডের সঙ্গে।

* * *

লাইব্রেরীতে চলেছেন পড়াশুনার উদ্দেশ্যে। মাঝপথে নিবারণ মুখুজ্জ্যের সঙ্গে দেখা। ব'ল্‌লেন, তোমাকে আজ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন শরৎ-দা, লাইব্রেরীতে বরং কাল যেয়ো, আজ চলো একটু কুঞ্জবাবুর বাসা ঘুরে আসা যাক্।

নিবারণচন্দ্র ছিলেন শরৎচন্দ্রের বিশেষ অনুগত। সুতরাং তাঁর অনুরোধ এড়ানো সম্ভব হ'ল না। উভয়েই রওনা হ'লেন কুঞ্জবাবুর বাড়ীর পথে।

উপস্থিত সেখানে অনেকেই ছিলেন। প্রত্যেকেই চিন্তিত। একটা

গুরুতর ব্যাপার যে ঘ'টেছে তা সহজেই অনুমান করা চলে। কিন্তু সমস্যা দাঁড়িয়েছে ঘণ্টাটা বাঁধ্‌বে কে?

শরৎচন্দ্রকে দেখে তাঁরা অনেকটা আশ্বস্ত হ'লেন। একটা চিঠি তাঁর হাতে দেওয়া হ'ল। তিনি নিঃশব্দে সেখানা আদ্যপ্রান্ত পড়া শেষ ক'রে মুখ তুলে তাকালেন। দিদি লোক মারফৎ জানালেন, গায়ত্রীর কথাই ঠিক। নন্দবাবুর মা-ও প্রায় সেই একই কথা লিখেছেন।

যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই প্রবাসী বাঙ্গালী। তাঁদেরই মধ্য থেকে একজন ব'লে উঠ্‌লেন, এখন কি করা কর্ত্তব্য—আমাদের ঠিক ক'রে নেওয়া উচিত!

গিরীনবাবুও হন্তদন্ত হ'য়ে সেখানে উপস্থিত হ'লেন। ব'ল্‌লেন—আমি ত' ওঁর বাবার কাছে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ে এলাম। মুস্কিল হ'য়েছে যে কুঞ্জদা'ও বাড়ীতে নেই!

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—তাতে ক্ষতি হ'য়েছেই বা কি? চল নিবারণ দেখা যাক্, আমরা এখন কতদূর কি ক'র্‌তে পারি!

* * *

শরৎচন্দ্র, নিবারণচন্দ্র ও একটা দারোয়ান সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌ছেন—অস্পষ্ট কথাগুলো ভেসে আস্‌তে শোনা গেল—"অবুঝ হ'য়ো না গায়ত্রী, তোমার জন্যই এ মগের মুলুকে পা দিয়েছি। বিশ্বাস করো, আমার কথা শোন…"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও ভেসে এলো, "তা' হয় না নন্দবাবু! আমি নারী। সে নারীত্বের অমর্য্যাদা আমার দ্বারা কোনদিন সম্ভব হ'বে না!"

ততক্ষণ এঁরা দ্বারের সম্মুখবর্ত্তী হ'য়ে পড়েছেন। শরৎচন্দ্র একটু কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে ব'ল্‌লেন—একটা প্রবাদ আছে

নন্দবাবু, 'পাপ ষোল কলায় পূর্ণ হ'লেই পতন একেবারে অনিবার্য্য ' এখন তৈরী হ'য়ে নিন। যাত্রাটা অবশ্য নির্ণয়ের ভার আপনার উপরেই নির্ভর ক'র্ছে। হয় ক'ল্কাতা, না হয় শ্রীঘর! একটু থেমে ব'ল্লেন—আর এই নিন্ আপনার মা'র চিঠি—সেই সঙ্গে আরও একটি শুভ সংবাদ দিচ্ছি, গায়ত্রীদেবীর বাবার কাছেও টেলিগ্রাম চ'লে গেছে।

বাঘের কাছ থেকে শীকার কেড়ে নিলে অবস্থাটা যেরূপ দাঁড়ায় নন্দদুলালের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। মা'র চিঠির সংবাদে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে হতভম্ভ হ'য়ে প'ড়েছিল, কিন্তু গায়ত্রীদেবীর বাবার নাম শুনেই লাফিয়ে উঠ্লো—**Who the devil you are to enter in my affair?**

শরৎচন্দ্রও পিছ্‌পা হ'লেন না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—**We have come to teach you good lesson, Damn Scoundrel!**

নন্দদুলাল ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছিল। চোখের পলকে শরৎচন্দ্রের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নাকে-মুখে দু'টো ঘুষি বসিয়ে দিলে।

নিবারণচন্দ্র শরৎচন্দ্রের পিছু দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি অবশ্য এতখানি আশা করেননি। কিন্তু স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকাও তাঁর ধৈর্য্যের বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে নন্দদুলালের জামার কলারটা ধ'রে, শূন্যে তুলে একটি আছাড়্ দিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।

বেচারা ভয়েই জ্ঞান হারিয়ে ফেল্লো। গায়ত্রীদেবী সভয়ে বাইরে ছুটে এলেন। নিবারণচন্দ্র আশ্বাস দিয়ে ব'ল্লেন, কোন ভয় নেই মা—জ্ঞান এখুনি ফিরে আস্বে। পাখার বাতাস ও নাকেমুখে জল ছিটিয়ে ফার্ষ্ট এডের ব্যবস্থা হ'ল। শরৎচন্দ্র সেই মুহূর্ত্তেই তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা ক'রে সেবা-শুশ্রূষায় মন দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে নন্দদুলালের জ্ঞান ফিরে এলো। শরৎচন্দ্র নিজের

হাতে চা-রুটি খাওয়ালেন। একটু সুস্থ হ'লে ব'ল্‌লেন, দু'তিন ঘণ্টা পরে ক'ল্‌কাতার মেল ছাড়্‌বে, এতে বরং আপনার ফিরে যাওয়া ভাল, নইলে হাতকড়া পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ পুলিশেও খবর দেওয়া হ'য়েছে।

নন্দদুলালের চেহারাটা নধর ও জাঁকজমকপূর্ণ বলিষ্ঠ হ'লে কি হ'বে, হাতকড়ার নামেই শুকিয়ে আধখানা হ'য়ে গেল। ব'ল্‌লো, যাত্রা করায় আমার বিশেষ কোন আপত্তি নেই।

নিবারণচন্দ্র টিকিট কিনে আন্‌লেন। যাত্রার আয়োজনও সব ঠিক্। নন্দদুলাল গায়ে বলও ফিরে পেয়েছে। ব'ল্‌লো, গায়ত্রীকে একবার ডাকুন, তার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যেতে চাই!

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—এরই মধ্যে সমস্ত কাহিনী ভুলে গেলে বাছাধন! পুরুষ মানুষ যে এত বেহায়া হয়, পূর্ব্বে আমার তা' জানা ছিল না!

বাধ্য হ'য়েই নন্দদুলালকে গায়ত্রীর আশা ছাড়্‌তে হ'লো। গাড়ী বাইরে তৈরী, হাতে সময়ও খুব অল্প। ফিরে যেতে তার মন চাইছে না, কিন্তু না পালিয়েও ত' মুক্তির কোন আশা নেই! নন্দদুলাল গায়ের রাগ গায়ে চেপে, ভাল মানুষের মত বেরিয়ে প'ড়্‌লো।

* * * *

জাহাজ ছেড়ে দিল। কিন্তু বিপদ দেখা গেল—গায়ত্রীদেবীকে নিয়ে ও রূপ ও যৌবনের কাছে মিঃ ফ্রেণ্ড নিজেকে নিঃসহায় মনে ক'র্‌তে লাগ্‌লো। অগত্যা শরৎচন্দ্রের উপরেই দেখাশুনার ভার গিয়ে প'ড়্‌লো!

গায়ত্রী পূজা-পাঠ নিয়েই মেতে থাকে। এমন কি ভাবের আবেগে নিজের জ্ঞানও হারিয়ে ফেলে।

কথাটা শরৎচন্দ্রের কানে গিয়ে ভাস্‌লো। তিনি একেবারে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। মেয়েটি সত্যসত্যই কি চায়—যাচাই করার জন্যে, তাকে ষ্টাডি ক'র্‌তে শুরু ক'র্‌লেন। কিন্তু ফলে ফল্‌লো ঠিক বিপরীত। তিনি নিজেও সেই ভাবের বন্যায় গেলেন ভেসে।

গায়ত্রী করে জপ্‌, ধ্যান। আর শরৎচন্দ্র সেই সাধনার পথকে মুক্ত ক'র্‌তে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন। গান্‌ঃ

"কোথা ভবদারা! দুর্গতি হারা
কত দিনে তোর করুণা হবে!
কবে দেখা দিবি, কোলে তুলে নিবি,
সকল যাতনা জুড়াবে।
মায়ার সংসারে কর্ম্ম কোলাহলে
শ্রীপদ দু'খানি র'য়েছি গো ভুলে—
বিবেক বৈরাগ্য তুমি নাহি দিলে
মোহ ভ্রান্তি কিসে ছুটিবে?
আয়ু সূর্য্য (মোর) বসিতেছে পাটে
কোথা ব্রহ্মময়ী, এসো তুমি ছুটে—
তনয়ে তর মা এ ঘোর সঙ্কটে
তুমি বিনা কে আর তরিবে?

[ব্রঃ দেঃ শঃ হইতে গৃহীত]

গায়ত্রী মুগ্ধ হ'য়ে সে গান শোনে। কখনও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, মা, মা, ক'রে ভাবের আবেগে চীৎকার ক'রে ওঠে।

গান শেষ হয়। তার চৈতন্য ফিরে আসে। অশান্ত হৃদয়টা তার এক অপূর্ব্ব প্রীতি ও ভক্তিতে পূর্ণ হ'য়ে যায়।

* * * *

মিঃ ফ্রেঙের চাকরী হয় না। গায়ত্রীর গায়ে যা ছিল একে একে সবই শেষ হ'য়ে গেল। শরৎচন্দ্র তাঁদের এই অসহায় অবস্থায় নানা উপায়ে সাহায্য ক'র্‌তে সুরু ক'র্‌লেন—কখনও বাজার, কখনও বা দু'পাঁচ টাকা দিয়ে সংসারের দিন গুজরানের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

শরৎচন্দ্রের আয়ও তখন সামান্য। কখনও হোটেলে খান, কখনও নিজেই রান্না করেন, কখনও বা একবেলা জোটে—কখনও বা তাও না।...ইতিমধ্যে গায়ত্রীর সঙ্গে মিস্ত্রীপল্লীর মেয়েদের খুব আলাপ জমে উঠেছিল। তাদের কাছে একদিন গায়ত্রী শুন্‌লো—শরৎচন্দ্রের জীবনের এই চরম দুরবস্থার কথা।

শরৎচন্দ্রের দুঃখে তার মনটা দুলে উঠ্‌লো। নিজেই উপযাচক হ'য়ে ব'ল্‌লেন, আমি আপনার সব কথাই শুনেছি। আজ থেকে দু'বেলা এখানেই খেতে হ'বে, নইলে এতটুকুও আমি শান্তি পাব না! যদি কথা না রাখেন, আমরাও শুকিয়ে মর্‌বো, আপনার কোনও সাহায্যই আমি গ্রহণ ক'র্‌বো না।

শরৎচন্দ্র রাজী হ'য়ে প'ড়্‌লেন। কারণ, এ সমস্ত কাজে মন তাঁর সত্যই বস্‌তো না। এতদিন যা কিছু ক'রে এসেছেন—সে শুধু দিনগত পাপক্ষয়ম্!

* * * *

কিছুদিন পরে এক কাঠের ব্যবসায়ীর কাছে মিঃ ফ্রেঙের একটি চাক্‌রী হ'ল। বাড়ী তার ঢাকা জেলায়—শশাঙ্কমোহন নামে পরিচিত।

একদিন ফ্রেঙের কাজের অনুপস্থিতির সুযোগে শশাঙ্কমোহন নিজেই সে বাসায় এসে উপস্থিত হ'ল। বাড়ীতে তখন কেউ নেই। গায়ত্রী বারান্দায় আন্‌মনে রোদে চুল শুকোচ্ছিল।

রূপ যেন ঠিক্‌রে প'ড়্‌তে চায়! শশাঙ্কমোহনের চিত্ত সেই মুহূর্ত্তেই প্রলুব্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো।

কতক্ষণ যে সে এমনিভাবে সতৃষ্ণ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে ছিল— তা' গায়ত্রী জান্‌তো না! সহসা একটা মৌমাছির গুন্ গুন্ শব্দে সচকিত হ'য়ে পাশের দিকে তাকাতেই শশাঙ্কমোহনকে দেখ্‌তে পেল। তার চোখমুখের চেহারা দেখেই সভয়ে ঘরের ভেতর আত্মগোপন ক'র্‌লো গায়ত্রী।

শশাঙ্কমোহন জড়িতকণ্ঠে ব'ল্‌লো—ভয় পাবেন না—আমারই নাম শশাঙ্কবাবু, মিঃ ফ্রেণ্ডকে খুঁজ্‌তে এসেছিলাম। তার কি শরীর খারাপ?

গায়ত্রী ঘরের ভেতর থেকে উত্তর দিল— বাসায় ফিরলেই তাঁকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো।

শশাঙ্কমোহন ফিরে গেল। কিন্তু বুকে গেঁথে নিয়ে গেল একটা অতৃপ্ত বেদনা! কিছুতেই তার তৃপ্তি নেই! ব'সে ব'সে ষড়যন্ত্র আঁট্‌তে লাগ্‌লো আর ভাব্‌তে সুরু ক'র্‌লো—'একান্তে আপনার ক'রে গায়ত্রীকে পাওয়া যাবে কেমন ক'রে!

পরদিন থেকে ফ্রেণ্ডের প্রতি খুবই সহানুভূতি প্রকাশ ক'র্‌তে লাগ্‌লো শশাঙ্কমোহন। মাইনে বাড়িয়ে প্রায় দেড়া ক'রে দিল। ওবাসা ছেড়ে অন্য একটা বাসা ভাড়া করার উপদেশও দিল সেইসঙ্গে। উপযাচক হ'য়ে পাঠাতে লাগ্‌লো—কখনও ফল—কখনও বা মিষ্টি!—কখনও লেংড়া আম, লিচু, সরু চাল—এমনি আরও অনেক কিছু!

গায়ত্রী এ সবের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতা হ'চ্ছে অনুভব ক'র্‌তে লাগ্‌লো। একদিন মিঃ ফ্রেণ্ডকে ব'ল্‌লো—মনিবকে এসব পাঠাতে বারণ ক'রে দেবে! এসব আমার ভাল লাগে না!

মিঃ ফ্রেণ্ড গায়ত্রীর সঙ্গে "ধরম-মা" সম্বন্ধ পাতিয়েছিল। কারণ, এ রূপ ও যৌবনের সম্মুখীন হওয়ার সাহস তার ছিল না। সে ব'ল্‌লো—

মনিব আমার খুব ভাল লোক মা! আমাদের দুরবস্থার কথা ত তিনি সবই জানেন—তা'ছাড়া মনিবের দান প্রত্যাখ্যানই বা করা যায় কি ক'রে? শেষে চাকরীটাই হয়ত চ'লে যেতে পারে!

গায়ত্রী সহসা উত্তর খুঁজে পেল না। গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইলো শুধু।

* * *

শরৎচন্দ্র গায়ত্রীর মনের ইচ্ছাটা ষ্টাডি করার উদ্দেশ্যেই পা দিয়েছিলেন প্রথম দিন। কিন্তু তার রূপে ও গুণে তিনি শুধু মুগ্ধ হ'লেন না, গোপনে এ নিরপরাধা মেয়েটিকে ভালও বেসে ফেল্‌লেন একান্ত আপন ক'রে! তাই তার মানসিক শান্তির উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে এসে তাকে শুনিয়ে যেতেন গান।

গায়ত্রীরও ভাল লেগেছিল এই আত্মভোলা মানুষটিকে! মুখফুটে যে কোন কিছুই চাইতে পারে না—অথচ নীরবে মানবতার শুধু সেবা ক'রে যায় আর দরদ দিয়ে অনুভব করে প্রতিটি মানুষের দুঃখ ও বেদনা বোধকে—তাঁকে কি শ্রদ্ধা না ক'রে থাকা যায়? তাই নির্ভয়ে তাঁর আশ্রয়কে আপন ব'লে মেনে নিতে কুণ্ঠা বোধ ক'র্‌লো না গায়ত্রী দেবী।

* * *

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, কিছু মিষ্টি ও আম নিয়ে একটি আধা-বয়সী মেয়ে গায়ত্রীর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো।

গায়ত্রী বিস্মিত হ'লো। মেয়েটি কিন্তু মুচ্‌কি হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—এমন ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখ্‌ছো গো?—তোমাদের শশাঙ্কবাবু এগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে!

গায়ত্রী কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মেয়েটি নিজেই সব গুছিয়ে রাখ্‌লো। ব'ললো, বাবু ত আমাদের যে-সে বাবু নন্‌—তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা, দশ-বিশটা দাসদাসী, মনটাই বা তাঁর কেন ছোট হ'তে যাবে? জিনিসপত্তরগুলোর দিকে চেয়ে দেখ না—বুঝ্‌তে পার্‌বে নজর তাঁর কত উঁচু!

গায়ত্রী উত্তর দিল না। প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো শুধু।

মেয়েটি একেবারে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো! ব'ল্‌লো—আহা, এমন যার রূপ—তার এখানে প'চে মরা কেন?

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। এ ধ্বনি তার পরিচিত। চকিতে অবলম্বন খুঁজে পে'ল গায়ত্রী। অসাড় প্রাণে তার আবার নতুন স্পন্দন দেখা দিল।

শরৎচন্দ্র অফিসের ফেরৎ প্রতিদিনই একবার ক'রে এই সংসারের খোঁজ-খবর নিয়ে যেতেন। পড়াশোনা শেষ ক'রে সাধারণতঃ রাত ক'রেই আবার ফিরে আস্‌তেন। তখন মিঃ ফ্রেণ্ডও ফিরে আস্‌তো। উভয়ে ব'সে কিছুক্ষণ গল্প-গুজব ক'র্‌তেন। তারপর একত্রে ব'সে আহার শেষ ক'রে একই ঘরে পাশাপাশি শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তেন।

মেয়েটিকে শরৎচন্দ্র পূর্ব্বেই চিনতেন! তাকে দেখেই শরৎচন্দ্রের শরীরটা রি রি ক'রে উঠ্‌লো। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, এ এখানে কেন গায়ত্রীদেবী?

শশাঙ্কমোহন পাঠিয়েছেন! সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে গায়ত্রী চেয়ারটা এগিয়ে দিল। ব'ল্‌লো, বসুন!

শরৎচন্দ্র শশাঙ্কমোহনের নাম শুনেই ক্রোধান্ধ হ'য়ে প'ড়্‌লেন। লোকটিকে তিনি ভাল ক'রে না চিন্‌লেও তার চালচলন ও কথাবার্ত্তার মধ্যে এমন একটা কপটতা ও মোহান্ধতা লক্ষ্য

ক'রেছিলেন যে, যার সংস্পর্শে গায়ত্রীর মঙ্গল কোনদিনই সম্ভব হ'তে পারে না!

মেয়েটি সেই ফাঁকে আত্মগোপনের চেষ্টা ক'রলো।

শরৎচন্দ্র বা গায়ত্রী কেউ তাকে বাধা দিলেন না। বরং একটা স্বাস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, উভয়েই খানিক্‌টা হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন।

গায়ত্রী ফিরে এলো এক কাপ চা হাতে নিয়ে। ব'ল্‌লো, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন!

শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে তার হাত থেকে চায়ের কাপ্‌টি নিয়ে চেয়ারে শান্ত শিশুর মত বসে প'ড়্‌লেন। গায়ত্রী সন্ধ্যা-প্রদীপটা জেলে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে ফিরে এলো। চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে একটা ক্লান্তি ও বিষাদের ছায়া।

শরৎচন্দ্র গায়ত্রীর সমস্ত খবর পেয়েছিলেন নন্দদুলালের মা'র চিঠি মার্‌ফৎ। গায়ত্রীও অকপটে ব'লেছে তার জীবনের সমস্ত দুঃখের কাহিনী। এতটুকু গোপনতা সে রাখেনি। ফলে, শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও প্রীতি বেড়েছে বই তিলার্দ্ধও কমেনি। ব্যথিত স্বরে ব'ল্‌লেন—তোমায় এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন গায়ত্রীদেবী?

গায়ত্রী উত্তর দিল না। গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে প'ড়্‌লো ফোঁটা কয়েক জল। তার নারী-জীবন-সমুদ্রে যে রুদ্র কুজ্ঝটিকা দানা বেধে উঠ্‌ছে, তা' স্পষ্ট অনুভব ক'র্‌লেও, অবাধে প্রকাশ ক'রতে কণ্ঠস্বর তার বারে বারে রুদ্ধ হ'য়ে আসে! হৃৎপিণ্ড বেদনায় ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যায়, তবুও ত বহিঃপ্রকাশের পথ সে খুঁজে পায় না! সে যে নারী—তার আজন্মের সংস্কারের বেড়াজালে, গুম্‌রে মরা ছাড়া মুক্তির দ্বিতীয় পথ ত কোথাও আজ আর তার খোলা নেই!

শরৎচন্দ্র চিনেছিলেন তাঁকে। তাই তিনি বিমর্ষ ও শঙ্কিত গায়ত্রীকে প্রকৃতিস্থ করার উদ্দেশ্যে পাশের ঘর থেকে হারমোনিয়মটা বার ক'রে

নিয়ে এসে, সেই ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে গাইতে সুরু ক'র্‌লেন—

"আমার সাধ না মিটিল—আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা !
জনমের শোধ ডাকি গো "মা" তোরে
কোলে তুলে নিতে আয় মা !
পৃথিবীর কেউ ভাল ত বাসে না
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না
যেথা আছে শুধু ভাল বাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা !
বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় জ্বালা স'য়ে কামনা ভুলেছি,
অনেক কেঁদেছি, কাঁদিতে পারি না
বুক ফেটে ভেঙে যায় মা !
স্বরগ হইতে জ্বালার জগতে
(আমায়) কোলে তুলে নিতে আয় মা !

[ব্রঃ দেঃ শঃ হইতে গৃহীত]

ভাবে বিভোর গায়ত্রীর চোখ দু'টো জলে ভ'রে উঠ্‌লো। ছোট ঠাকুর ঘরের মধ্যে আলুথালু বেশে ছুটে গেল সে। বার বার কাতরতা প্রকাশ ক'র্‌লো—আমায় তুমি সেই পথই দেখাও মা !

*   *   *

সহসা ফ্রেণ্ড অসুস্থ হ'য়ে প'ড়্‌লো ! শরৎচন্দ্র তাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়ে অপারেশনের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। নিজেই তার সেবা-শুশ্রূষা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন।

একটু সুস্থ হ'য়ে ফ্রেণ্ড বাসায় ফিরে এলো। শরৎচন্দ্র ও গায়ত্রীর অক্লান্ত ঐকান্তিক সেবায় ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লো। কিন্তু শশাঙ্কমোহন সে সুযোগের অপব্যবহার ক'র্‌লো না। দয়ালু মনিবের মুখোস প'রে বার বার যাওয়া-আসা সুরু ক'র্‌লো। সেইসঙ্গে মনের কামনা পরিতৃপ্তির সুযোগও সন্ধান ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

একদিন শশাঙ্কমোহন ব'ল্‌লেন—এ অবস্থায় ওঁর কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়ার একান্ত প্রয়োজন! আমার ইচ্ছা উনি বরং কিছুদিন দেশে ঘুরে আসুন! স্ত্রী, মা ও আত্মীয়স্বজনের পরিবেশে শিগ্‌গীর সুস্থও হ'য়ে উঠ্‌তে পার্‌বেন।

কথাটার কেউ প্রতিবাদ ক'র্‌লেন না।

যাওয়া স্থির হ'য়ে গেল। ফ্রেণ্ড রোগমুক্তির শুভ আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাড়ি দিলেন ক'ল্‌কাতায়। শরৎচন্দ্র ও গায়ত্রী তাকে জাহাজে তুলে দিয়ে বাসায় ফিরে এলেন।

ফ্রেণ্ড যাওয়ার পরদিন একটি হিন্দুস্থানী দরোয়ান এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

গায়ত্রী চিঠিখানা খুলে দেখ্‌লো, শশাঙ্কমোহন লিখেছে: আপনার ধরম পুত্রের ইচ্ছা আমার বাসায় এসে থাকেন। কোন অসুবিধা হ'বে না, সমস্ত ব্যবস্থাই আমি ক'রে রেখেছি শুধু তৈরী থাকুন, আমার লোক যাচ্ছে আপনাকে নিয়ে আমার উদ্দেশ্যে।

গায়ত্রী মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়্‌লো মেঝের ওপর। এখন উপায়?

কয়েক মিনিট পরে কড়াটা পুনরায় নড়ে উঠ্‌লো। গায়ত্রী তখন অকূল সমুদ্রে একটা কুটোর আশায় হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছে। ভাব্‌লো, দুপুরে

পাশের মিস্ত্রীপল্লীর মেয়েরা যেমন প্রায়ই তার কাছে বেড়াতে আসে, সুখদুঃখের গল্প ক'রে, হয়তো-বা তাদেরই কেউ তেমনি এসে থাক্‌বে! আর কিছু না হোক্ এই হীন ষড়যন্ত্র ও অপমানের হাত থেকে ত মুক্তি পাবে কিছুক্ষণ!

গায়ত্রী দরজা খুলে দিল সরল বিশ্বাসে। ভেতরে এলো সেই মেয়েটি। মুখে তার বাঁকা হাসি—চোখের পাতাগুলোতে রহস্যের ছায়া মাখানো। হাতে এক থালা মিষ্টি। ব'ল্‌লো, আর দেরী কেন বাপু, সাজগোজ সেরে নাও। বাবু এলেন ব'লে!

গায়ত্রীর ক্রোধে, অপমানে সারা শরীরটা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। নিজেকে প্রকৃতিস্থ ক'র্‌তে তার বেশ কিছু সময় লাগ্‌লো। তারপর ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত রুখে দাঁড়ালো, যাও বেরিয়ে যাও—

মেয়েটিও নাছোড়-বান্দা। ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে ব'ল্‌লো—যাবো কিগো? বাবু যে জলখাবার পাঠিয়েছে—গাড়ী এলো ব'লে!

গায়ত্রী দম্‌লো না। ধমক দিল, যাও—এখান থেকে!

শরৎচন্দ্র ঠিক সেই সময়ে সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। সমস্ত চক্রান্তের খবর পূর্ব্বেই তিনি পেয়েছিলেন। তাই অফিস যাওয়া বন্ধ ক'রে তাঁর দলবল তিনি তৈরী রেখেছেন। একটা বোঝাপাড়া ক'রে নেওয়াই তাঁর শেষ উদ্দেশ্য।

শরৎচন্দ্রের উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে গায়ত্রী আরও ভীত ও সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, নিঃসহায় অবস্থায় তোমার আর এখানে থাকা উচিত হ'বে না গায়ত্রী! আমার সঙ্গে তুমি চলো।

গায়ত্রী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়েছিল। শরৎচন্দ্র তার এই অবস্থাটাকে সহজ ও সরল ক'রে নেওয়ার আশায় ব'ল্‌লেন, ভয় কি

গায়ত্রী ? •তুমি ত আমায় চেন ! তা'ছাড়া লোকলজ্জার কথা ভাব্‌ছো ? সে পথও ত মুক্ত আছে ! আজকাল বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে—তাতেও যদি সমাজে আমাদের স্থান না হয়—বৈষ্ণব ধর্ম্ম আমরা সহজেই গ্রহণ ক'র্‌তে পার্‌বো।

গায়ত্রী শরৎচন্দ্রের পায়ে প'ড়ে গেল। সাশ্রু নয়নে ব'ল্‌লো, কেন আমায় লজ্জা দাও শরৎদা—জানতো ঝরা ফুলে দেবতার পূজা হয় না !

শরৎচন্দ্র গায়ত্রীকে পায়ের কাছ থেকে তুলে সস্নেহে বেতের মোড়াবে বসালেন। নিজে নতজানু হ'য়ে ব'সে মাথার চুলগুলো ঠিক ক'রে দিতে দিতে ব'ল্‌লেন, আমায় ভুল বুঝো না গায়ত্রী ! যে ষড়যন্ত্র তোমার পিছনে চ'লেছে তার হাত থেকে তোমায় বাঁচাতে আমি চেয়েছিলাম। তুমি সুখী হও—সুখে ও সসম্মানে থাকো – এই আমার একমাত্র কামনা ! তার বেশী আমি চাইনি। চাইবোও না কোনদিন।

বাইরে ঘোড়ার গাড়ীর বেল বেজে উঠ্‌লো। শরৎচন্দ্র ভাব্‌লেন শশাঙ্কমোহন হয়ত উপস্থিত হ'য়েছে। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখ্‌লেন, গাড়ী থেকে নাম্‌ছে কুঞ্জবাবুর দরোয়ান, সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক।

অনুমান ক'রে নিলেন কোন হিতৈষী বন্ধু বোধ হয় কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে খবর দিয়েছে, তাই রক্তপাত এড়ানোর এই সুব্যবস্থা ! শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে নেমে গেলেন !

দূরে শশাঙ্কমোহনের গাড়ী দাঁড়িয়েছিল সুযোগের অপেক্ষায়। শরৎচন্দ্রের দলও তৈরী হ'য়ে অপেক্ষা ক'র্‌ছিল ঝোপের একটা পাশে।

কুঞ্জবাবুর স্ত্রী (দিদি)-র চিঠিখানা পেয়ে গায়ত্রী সেই আলুথালু বেশেই গাড়ীতে উঠে বসলো।

গাড়ীর দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। গাড়ী ছুট্‌লো।

শরৎচন্দ্র একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। গাড়ীটা সহসা তার পাশে গিয়ে

কয়েক মিনিট থাম্‌লো। গায়ত্রী গাড়ীর দরজা খুলে মুখখানা বাড়িয়ে ব'ল্‌লো, আমার জন্যে ভেবো না শরৎদা—যিনি সর্ব্বশক্তিমান্‌ তাঁর উপরেই নির্ভর ক'র্‌তে দাও!

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গায়ত্রীর গণ্ড বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে প'ড়্‌লো!

গাড়ী পুনরায় চ'ল্‌তে সুরু ক'র্‌লো। শরৎচন্দ্র গায়ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। গায়ত্রী মুখ বাড়িয়ে হাত দুটো তুলে নমস্কার জানালো।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই গাড়ীটা মোড় ঘুরে ছুটে বেরিয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র একটা স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চ'ল্‌লেন। ভাব্‌লেন—এটাই হ'ল বোধ হয় সকলের চেয়ে ভাল!···

* * *

পার্ব্বতীকে হারানোর ব্যথা প্রায় তিনি ভুলে এসেছিলেন গায়ত্রীর সন্নিধানে। কিন্তু সেই পুরানো ব্যথাটাই আজ তাঁকে নূতন ক'রে পেয়ে ব'স্‌লো। তিনি তাঁর সেই পূর্ব্বের জীর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন আস্তানার মধ্যে ফিরে এলেন। বহুদিনের অব্যবহৃত আরাম-কেদারটায় হেলান দিয়ে গুণ্‌ গুণ্‌ ক'রে গান ধ'র্‌লেন—

"এই ক'রেছো ভাল নিঠুর
এই ক'রেছো ভালো
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কভু নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কভু আলো
এই ক'রেছো ভালো।···"

ছবি আঁকার সখ তাঁর ছিল। এবার সেই নেশাই তাঁকে গভীর ক'রে পেয়ে ব'স্‌লো। গায়ত্রী কয়েক দিন পরেই এলাহাবাদে তাঁর মামার কাছে রওনা হ'য়ে গেল, কিন্তু তার বিচ্ছেদ-বেদনাটাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লেন না। সেই বিরহ-বেদনা-কাতর অন্তরের গভীরতা, তুলির প্রতিটি আঁচ্‌ড়ের মধ্যে এমন একটা গভীর ছায়াপাত ক'রে গেল যে, দর্শকমাত্রেই সেই চিত্রটির প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো।

চিত্রটি ছিল মহেশ্বেতার ছবি। পূত প্রেমের পরশ তার পবিত্রতাকে উজ্জ্বলই ক'রেছিল—ম্লান ক'রে দেয়নি।—তাই শরৎচন্দ্র সেটিকে বহুদিন সযত্নে বাঁধিয়ে রেখেছিলেন শয়নকক্ষের মধ্যে।

* * * *

মদের নেশা তিনি ধ'রেছিলেন ভাগলপুরে। রেঙ্গুনে পা দিয়ে তার মাত্রাটা বেড়েছিল। এক বিন্দুও কমেনি। একদিন সন্ধ্যায় ব'সে আন্‌মনে তামাক টান্‌ছেন, একটি বন্ধু এসে খবর দিলেন, কে এক গোয়ানিজ্‌ সাহেব,—সারা এশিয়াটাকে চ্যালেঞ্জ ক'রেছেন মদের নেশায়!

কথাটা ঠিক্‌মত বুঝ্‌তে না পেরে তিনি তাঁর মুখের দিকে তাকাতে তিনি পুনরাবৃত্তি ক'র্‌লেন—গোয়ানিজ্‌ সাহেব চ্যালেঞ্জ ক'রেছেন—সারা এশিয়ায় এমন কেউ নেই যে, তাঁর সঙ্গে মদের নেশায় প্রতিযোগিতা চালাতে পারে।

শরৎচন্দ্র খাড়া হ'য়ে ব'স্‌লেন। ব'ল্‌লেন—তুমি তাকে চেনো?

বন্ধুটি মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলেন—বাসাটা চিনি!

শরৎচন্দ্র নলটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ব'ল্‌লেন, চলো দেখে আসি—কেমন সাহেব সে!

মাইনে কয়েক দিন পূর্ব্বেই পেয়েছেন। সুতরাং টাকার অভাব

ছিল না সেদিন। সোজা সাহেবের বৈঠকখানায় ঢুকে ব'ল্‌লেন, তোমার কথা শুনে বাজি লড়্‌তে এলাম সাহেব। দেখি কে জেতে? এশিয়া না ইউরোপ?

সাহেব শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে প'ড়্‌লো—কালা আদ্‌মি বলে কি?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, সেই উত্তরই দিতে এসেছি সাহেব। চলো, একটা বারে গিয়ে বসা যাক্।

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে রাজী হ'য়ে গেল। ব'ল্‌লো—চলো—

পথে নেমে শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, একটা কিন্তু কথা আছে সাহেব—

সাহেব তখন মেজাজে আছে। ব'ল্‌লো, বোলো—

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, তোমার যশ আর টাকা অনেক সাহেব। তুমি খেয়ো বিলেতী—আমি দেশী লোক—খাবো কিন্তু দিশী!

সাহেব সানন্দে উত্তর দিল, বহুত্ আচ্ছা!

* * *

তিন তলার একটা হলঘরে ব'সে দু'জনের প্রতিযোগিতা সুরু হ'ল। নীচে নাচ, গান ও হল্লা চ'লেছে অবাধ গতিতে। উপরে দু'জনে শেষ ক'রে চ'লেছেন পেগের পর পেগ।

রাত তিনটে বেজে গেল। বেয়ারাগুলো ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছে! ঘুমে তাদের চোখ ঢুলু ঢুলু। কয়েক মিনিট অন্তর অর্ডার আস্‌ছে, আউর এক বোতল!

ঘুমের ঝোঁকে বোতল পাল্‌টা পালটি হ'য়ে গেল। শরৎচন্দ্রের ভাগে প'ড়্‌লো বিলীতি মদ আর সাহেবের ভাগে প'ড়্‌লো দিশী ধেনো। কোনদিন খাওয়া অভ্যাস নেই। দু'পেগ খাওয়ার পর "উকি"

উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তিন পেগ খাওয়ার পর বমি সুরু হ'ল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সাহেব গড়িয়ে প'ড়্‌লো মেঝের ওপর।

সবাই ছুটে এলো। দেখে তার প্রাণ নেই। একে সাহেব—তার উপর গেছে মারা—সশব্দে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে প্রাণভয়ে যে যেদিকে পার্‌লো ছুট্‌ দিল। শরৎচন্দ্র নিরুপায়ে জান্‌লার কাঁচ ভেঙ্গে পাশের দোতলার চালে লাফিয়ে প'ড়্‌লেন। নর্দ্দমার পাইপ্‌ বেয়ে নীচে নেমে ছুট্‌তে সুরু ক'র্‌লেন ষ্টেশনের দিকে।

গাড়ী একটা দাঁড়িয়েছিল। কোন কিছু বিবেচনার পূর্ব্বেই উঠে ব'স্‌লেন তিনি। কয়েক মিনিট পরেই গাড়ীটা ছেড়ে দিল। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় আরামে ঘুমিয়ে প'ড়্‌লেন কিছুক্ষণ।

কোলাহলে ঘুম ভেঙে গেল। দেখ্‌লেন, গাড়ী পেগু ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। বিন্দুমাত্র সময়ের অপব্যয় না ক'রে তিনি নিঃশব্দে নেমে এলেন প্ল্যাট্‌ফর্‌মে।

কয়েকদিন পরে পুনরায় তিনি রেঙ্গুনে ফিরে এলেন। তখন সবকিছু ধামা চাপা প'ড়ে গেছে। অনুসন্ধানে জান্‌লেন, মাতাল সাহেবের মৃত্যু নিয়ে কোন হৈ-চৈ হয়নি বরং সকলে এটাকে একটা ধর্ত্তব্যের বাইরে ফেলে নিজেদের কাজেই মন দিয়েছে।

* * * *

পাবলিক ওয়ার্কস একাউণ্টসের অফিস একাউণ্টটেণ্ট জেনারেল অফিসের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে গেল (১৯১১-১২)। মনি মিত্র ম'শায়ের সহায়তায় ফেব্রুয়ারী মাসে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন অফিসে বদ্‌লী হ'য়ে এলেন। এখানে এসে তিনি মন স্থির ক'রে কাজ ক'র্‌তে সুরু ক'র্‌লেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা লোকের কি চাকুরীতে পোষায়—না তা' সম্ভব কোনদিন ? একদিন সামান্য কারণে "উইলস" নামে এক সাহেবের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া বেঁধে

গেল। শরৎচন্দ্র মুখের লড়াই ছেড়ে পটাপট্ নাকে গুটিকয় ঘুষি বসিয়ে সোজা লম্বা দিলেন বাটাভিয়ায়।

সেখানে গিয়েও কি তাঁর স্থির হওয়ার অবকাশ এলো? ক্লান্তিতে দেহটা বোঝা হ'য়ে উঠেছে। সাম্‌নের বেঞ্চটায় ব'স্‌তে গেলেন—একটা মুসলমান সেপাই এসে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিল। ব'ল্‌লো—সাহেব লোগ্‌কো আরামকে লিয়ে—তোম্ লোগ্‌কো আস্‌তে নেই হ্যায়!

অপমানে ক্রোধে শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে দিশেহারা হ'য়ে প'ড়্‌লেন। রেঙ্গুন ছেড়ে পালিয়ে এলেও মনের ঝাল তাঁর এখনও মেটেনি—তার উপর এই বর্ণবৈষম্য! বিনা উত্তরে সশব্দে তার নাকে-মুখে-চোখে চোখের পলকে বসিয়ে দিলেন কয়েকটা ঘুষি!

সেপাইটা প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ আক্রমণের তাল সাম্‌লাতে না পেরে চিৎ হ'য়ে প'ড়ে গেল মাটিতে। শরৎচন্দ্র সেই অবসরে প্ল্যাটফর্মের বাইরে দিলেন ছুট্।

সাম্‌নে প'ড়্‌লো একটা খাবারের দোকান। চুপি চুপি সেখানে ঢুকে নিতান্ত ভাল মানুষের মত এক পেট খেয়ে নিলেন প্রথমে। তারপর বেরিয়ে এলেন বাইরে। গণ্ডগোল তখনও চুকেনি! আরও একদল সেপাই এসে গেছে সেখানে। উপরওয়ালা সাহেবের দলও যে যার আসন ছেড়ে নেমে এসেছে। কুলি থেকে টিকিট কলেক্‌টার পর্য্যন্ত সকলেই ব্যস্ত—জোর অনুসন্ধান চ'লেছে। শরৎচন্দ্র সেই সুযোগে একটা টিকিট কিনে, রেল লাইন ধ'রে পিছন থেকে একটা কাম্‌রায় উঠে আসন ক'রে নিলেন।

* * *

ভেবেছিলেন হয়ত চাকরীতে একটা গণ্ডগোল দেখা দেবে কিন্তু রেঙ্গুনে পা দিয়েই বুঝ্‌তে পার্‌লেন কালা আদমীর ঘুষিটা উইল্‌সসাহেব

হজম ক'রে নিতে বাধ্য হ'য়েছে—মিত্তির সাহেবের ভয়ে। কারণ, গালাগালি ক'রেছিল সে প্রথমেই—অতএব অপরাধী সে নিজেই। অবশ্য এই জুলুমবাজিটা তার পেশায় পরিণত হ'য়েছিল। কারণ সকলেই নীরবে ঐ অত্যাচার এসেছিল স'য়ে—সুতরাং কোন কালা আদমী যে তার গায়ে হাত তুলতে পারে সে বিশ্বাস তার ছিল না। তাই আপন সমাজে প্রতিপত্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই এই বিষয়টিকে আমলের মধ্যেই আনলো না। শরৎচন্দ্রও নিশ্চিন্ত মনে কাজে মনোযোগ দিলেন। দেখ্‌লেন—ব্যাপারটা এখানেই শেষ হ'য়ে যায়নি—সাহেব থেকে বেয়ারা পর্য্যন্ত সবাই যেন তাঁকে সমীহ ক'রে চ'ল্‌তে চেষ্টা ক'রছে। মনে মনে ভাব্‌লেন—সত্যই লাঠির মত ওষুধ—এ দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় আবিষ্কৃত হয়নি!

*　　*　　*　　*

মাসের মাহিনা হাতে পেলেই বন্ধুদের সঙ্গে পাড়ি দিতেন একটু-আধ্‌টু আনন্দ লাভের আশায়। নির্দ্দিষ্ট স্থানের কোন স্থিরতা ছিল না—যখন যেখানে খুশী, দল বেঁধে যেতেন, হৈ-চৈ ক'রে রাত কাটিয়ে ফিরে আস্‌তেন বাসায়। তারপর সুরু হ'ত বাঁধা রুটিনের কাজ—অফিস যাওয়া—খাওয়া—লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করা—এমনি আরও কত কি!

সেবার একটু দূরে পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছা হ'য়েছিল সকলের। পরপর তিনদিন ছুটি। কেরাণী-জীবনের অক্ষয় স্বর্গলাভ! জাহাজ আকিয়াবে গিয়ে থাম্‌লো। সবাই মিলে নেমে গেলেন স্বনামধন্যা এক পতিতার আলয়ে।

বয়স কুড়ি কি বাইশ। যেমন রূপ, তেমনি তার দেহের গঠন। বাসন্তী নামে পরিচিত সে।

নাচ, গান ও নেশার মধ্যে রাত্রিটা যে কেমন ক'রে কেটে গেল—তা' বোঝার অবসর পে'ল না কেউ।

ভোরের পাখী ডেকে উঠ্‌লো। বাসন্তী বিদায় নিলো। যে যেখানে পায়্‌লো একটু স্থান ক'রে নিয়ে, এলিয়ে প'ড়্‌লো নিদ্রাদেবীর কোলে।

বেলা বারোটায় একে একে উঠে ব'স্‌লেন। তিনটায় জাহাজ ছাড়্‌বে—তৈরী হ'য়ে নিতে হ'ল চট্‌পট্‌।

সবাই নীচে নেমে এলো। শরৎচন্দ্রও নাম্‌ছেন—সহসা বাসন্তী এসে তাঁর পথরোধ ক'রে দাঁড়ালো। একগাল হেসে ব'ল্‌লো—যাচ্ছো ত কিন্তু পাথেয়'র সন্ধান ত ক'র্‌লে না?

শরৎচন্দ্রের হুঁস ছিল না। বাসন্তীর কথায় পকেটে হাত দিয়ে দেখ্‌লেন ব্যাগ নেই। চকিতে মুখখানা শুকিয়ে তাঁর এতটুকু হ'য়ে গেল। বাসন্তী হাসিতে ফেটে প'ড়্‌লো। ব'ল্‌লো—ভাগ্যে আমার চোখে প'ড়েছিল—নইলে কি হ'তো বলতো? সারা মাস নিরম্বু উপবাস? ব্যাগ্‌টা এগিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লো—এই নাও!

শরৎচন্দ্র ব্যাগ্‌টা পকেটে রাখ্‌তে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। বাসন্তী শরৎচন্দ্রের হাতখানা চেপে ধ'রে ব'ল্‌লো—গুণে নিলে না?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—প্রয়োজন বোধ করিনে বাসন্তী।

বাসন্তী বিস্ময়ে ফেটে প'ড়্‌লো। ব'ল্‌লো—না—না। আমরা যে বেশ্যা—এতখানি বিশ্বাস কি আমাদের ক'র্‌তে আছে?

শরৎচন্দ্র উত্তরে মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—তোমাদের মত বিশ্বাসীই বা জগতে কে আছে বাসন্তী? যদি সত্যই তোমরা অসৎ হ'তে—হাসি-মুখে কি কেউ এস্থান থেকে ফিরে যেতে পার্‌তো?

বাসন্তী বাধা দিয়ে ব'ল্‌লো—কি যে বল ঠাকুর!

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—ঠিকই ব'ল্‌ছি বসন। যতটুকুর প্রয়োজন, তার একটুও বেশী তোমরা চাওনা। সেইটাই ত সকলের চেয়ে বড় সততা।

শরৎচন্দ্র আর দাঁড়ালেন না। বেরিয়ে এলেন হাসিমুখে।

মহামতি গোখ্‌লে এলেন রেঙ্গুনে। প্রবাসী ভারতীয়ের দল মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো। শরৎচন্দ্রও তাঁদের দলে নাম লেখালেন কিন্তু পাঁচজনের মত তাঁর সম্মুখীন হ'লেন না। বেঙ্গল সোসিয়্যাল ক্লাব যখন তাঁর জন্ত একটি প্রীতি ভোজের আয়োজন ক'র্‌লো—তিনি তখন সেই ভীড়ের মধ্যে থেকে তাঁকে একটিবার দেখে নিঃশব্দে এলেন বেরিয়ে।

পাশের একটি বন্ধু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—একি শরৎদা, পালালে যে ? যাঁকে এত শ্রদ্ধা করো—তাঁর মুখোমুখি হ'তে চাওনা বুঝি ?

উত্তরে শরৎচন্দ্র মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—শ্রদ্ধা দূর থেকেই নিবেদন ক'র্‌তে হয় ভাই—নইলে সেটা যে উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়!

* * * *

লাটপ্রাসাদের ভেতরটা দেখার সখ ছিল শরৎচন্দ্রের। একদিন সে সুযোগ মিলে গেল। গিরীনবাবু ছিলেন গভর্ণমেণ্টের কন্‌ট্রাক্‌টর। সঙ্গে গেলেন ভেতরে। লাটসাহেব তখন অন্ত প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছেন। রং আর অন্য ছোটখাটো অদল বদলের কাজ তখন চ'ল্‌ছে সেখানে।

ভেতরের বাগানটি দেখে শরৎচন্দ্র মুগ্ধ হ'য়ে প'ড়্‌লেন। সেই শিশির-ভেজা দূর্ব্বাঘাসের উপর খানিকটা ছুটে নিলেন। তারপর ভেতরে গিয়ে একবার শয্যায় একটু গড়িয়েও নিলেন।

সহসা মালিটা সেই সময়ে একটা সেলাম দিয়ে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। শরৎচন্দ্র উঠে ব'স্‌লেন। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, ব্যাপার কি ?

মালি ব'ল্‌লো—বাবু, সেলাম দিতে একটু ভুল হ'য়ে গিয়েছিল ব'লে সায়েব আমায় বরখাস্ত ক'রে দিয়েছেন—একটু দরখাস্ত লিখে দিতে হবে!

শরৎচন্দ্র শয্যা ছেড়ে সোজা সেক্রেটারীর টেবিলে গিয়ে ব'স্‌লেন।

একটি দরখাস্ত লিখে দিয়ে ব'ল্লেন—খোদ লেডি সাহেবের হাতে দিও, চাকরি তোমার আর নড়্চড়্ হ'বে না!

মালি খুশী হ'য়ে ফিরে গেল। কয়েক মিনিট পরে পুনরায় ফিরে এলো। হাতে তার সুন্দর একটি ফুলের তোড়া। ব'ল্লো, এটি যদি নেন—

শরৎচন্দ্র হেসে উঠ্লেন। ব'ল্লেন, ঘুষ্ বুঝি!

মালি জিভ্ কেটে সলজ্জ হাসি হেসে ব'ল্লো, না বাবু! আপনার গান যে শুনেছে, সে কি আপনাকে সহজে ভুল্তে পারে?

শরৎচন্দ্র হাসিতে ফেটে প'ড়্লেন। ব'ল্লেন—ও বুঝেছি! তুমি তা' হ'লে পরমহংস ভজার দলের লোক? আর ভয় নেই, চাকরী তোমার যাবে না!

* * * *

পাগ্লা গারদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভেতরে ঢোকার সখ হ'ল। পাশেই ছিলেন গিরীনবাবু। ব'ল্লেন, এটাতে বুঝি তোমার দয়া পাওয়া যায় না?

গিরীনবাবু লজ্জিত হ'য়ে প'ড়্লেন। ব'ল্লেন—কি যে তুমি বল শরৎদা'! বেশ ত' চল না ভেতরে, একবার ঘুরে আসা যাক্!

ভেতরে গিয়ে কিন্তু শরৎচন্দ্র স্থির থাক্তে পার্লেন না। তাঁর অন্তরটা আকুলি বিকুলি ক'র্তে লাগ্লো। কেউ হাস্ছে, কেউ কাঁদছে, কেউ ধেই ধেই ক'রে নাচ্ছে, কেউ-বা গলায় ফাঁস লাগিয়ে টানাটানি ক'র্ছে, কেউ আবার মেঝের উপর শুয়ে সাঁতার কাট্ছে। শরৎচন্দ্রের অন্তর ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্লো। নিজের অজ্ঞাতেই চোখ দিয়ে তাঁর দর্ দর্ ক'রে জল গড়িয়ে প'ড়্তে লাগ্লো।

* * * *

যে বাসায় থাক্‌তেন, তার নীচের তলায় একটি খৃষ্টান বুড়ো বাস ক'র্‌তো। লেখাপড়া বোধ হয় বিশেষ কিছু জান্‌তো না—ফিটার মিস্ত্রীর কাজ ক'র্‌তো। তবে খৃষ্টান ব'লে মাইনেটা বোধ হয় বেশ কিছু মোটা রকমের পেতো। কিন্তু তার সবটুকুই ব্যয় হ'য়ে যেতো নেশার পিছনে।

সংসারে ছিল স্ত্রী ও একটি মেয়ে। শোনা যায়, আগে সে ছিল ব্রাহ্মণ, পরে খৃষ্টান মেয়েটিকে বিয়ে ক'রে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিল।

মেয়েটির নাম শান্তি। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হ'লেও বাঙালী মেয়ের আভিজাত্য সে ত্যাগ করেনি। বাঙালীর সাজ-পোষাকই সে প'র্‌তো। ধীর, নম্র ও সুশ্রী। সংসারের কাজকর্ম্ম প্রায় তাকেই একা ক'র্‌তে হ'তো। মা অথর্ব্ব ব'ল্‌লেই চলে। সংসার সম্বন্ধে তিনি নির্ব্বিকার। মাঝে মাঝে চার্চে যান, তার বেশী ক'রার বা দেখার শক্তিও তাঁর ছিল না।

শরৎচন্দ্র তাঁর মেঝের কাঠের ফাঁক দিয়ে নীচের সংসারের চিত্র লক্ষ্য ক'রে তাদের সুখদুঃখের সমস্ত খবরই তিনি রাখ্‌তেন অনায়াসে। একদিন অফিস থেকে ফির্‌ছেন, শান্তি সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। ব'ল্‌লো, বামুনদা একটু ওষুধ দেবে?

শরৎচন্দ্র নিজেই উপযাচক হ'য়ে নীচে নেমে গেলেন। দেখ্‌লেন, রোগী এসিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হ'য়েছে। ওষুধ দিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর বুড়িও বমি সুরু ক'র্‌লো। তাকেও তিনি ওষুধ দিলেন। বুড়ি সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌লো কিন্তু বুড়ো মারা গেল ভোরের বেলা।

বেলা আটটায় মৃতদেহ বার করা হ'ল—বুড়ি মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌লো—পরে দেখা গেল তিনিও পরলোকে যাত্রা ক'রেছেন। অবশেষে উভয়েরই মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা ক'র্‌তে হ'ল।

শান্তি একান্ত অসহায় হ'য়ে প'ড়্‌লো। ক্রিমেটোরিয়াম্ থেকে ফিরে এলে শরৎচন্দ্র তাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—কোথায় যাবে তুমি, শান্তি?

শান্তির চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে প'ড়্লো। ব'ল্লো, তা'তো জানি না।

শরৎচন্দ্র সহানুভূতি প্রকাশে ব'ল্লেন, তুমি ছেলেমানুষ। আত্মীয়-স্বজন এখানে না থাকে বরং এইখানেই থাকো—আমি ত' র'য়েছি!

শান্তি উত্তর দিল না। নিঃশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে ফোঁপাতে লাগ্লো।

বহুকষ্টে দরজা খুলিয়ে শরৎচন্দ্র তার পাশে গিয়ে ব'স্লেন। লেবু আর পেঁপে নিজের হাতে ছাড়িয়ে দিয়ে ব'ল্লেন, খেয়ে নাও শান্তি, তোমার ভয় কি? আমি ত আছি!

* * * *

শান্তি লেখাপড়া জান্তো চল্নসই। তা' ছাড়া হাতের কাজে ছিল সে দক্ষ। একে বয়স অল্প তার উপর সহজে কারও কাছে হাত পাতার অভ্যাস তার ছিল না। প্রথম শোকের প্রতাপ একটু হ্রাস হ'লে পর, নিজেকে খাড়া ক'রে তুল্লো। ব'ল্লো—আমায় যদি কিছু কাজ সংগ্রহ ক'রে দেন, একটা পেট আমার চ'লে যায় অনায়াসে!

শরৎচন্দ্র তা'র এই স্বাবলম্বী হওয়ার প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখ্লেন। বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে জামা, সেমিজ, ব্লাউজের অর্ডারও সংগ্রহ ক'রে এনে দিতে লাগ্লেন।

শান্তি সারাদিনে সেগুলো সেলাই ক'রে রাখে। শরৎচন্দ্র অবসর সময়ে বন্ধুবান্ধবের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসেন। এমনি করেই দিন তাঁদের কাটছিল ধীরে এবং সুস্থে। সহসা শরৎচন্দ্র পীড়িত হ'য়ে প'ড়্লেন। শান্তি আপ্রাণ সেবা ও যত্নে তাঁকে সুস্থ ক'রে তুল্লো। এই স্নেহ ও প্রীতির আদান-প্রদানের মধ্যে গ'ড়ে উঠ্লো উভয়ের মধ্যে একটা গভীর বন্ধুত্ব।

রেঙ্গুন সহরে প্লেগের মড়ক দেখা গেল। মিস্ত্রীপল্লীতেও সে সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে প'ড়্‌লো। শান্তি ছুট্‌লো তাদের সেবা ক'র্‌তে। শরৎচন্দ্র বাধা দিলেন না, কিন্তু মনে মনে ক্ষুব্ধ হ'লেন।

শান্তি দিনের শেষে জ্বর নিয়ে ফিরে এলো। শরৎচন্দ্র চিকিৎসা সুরু ক'র্‌লেন। শান্তি তাঁর ম্লান ও গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ল্‌লো—তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি, মঙ্গল আমার কোনদিন হ'তে পারে না। আমায় ক্ষমা ক'রো তুমি!

শরৎচন্দ্র উত্তরে মৃদু হাসার চেষ্টা ক'র্‌লেন। ব'ল্‌লেন—তুমি পীড়িত হও, সত্যই মনেপ্রাণে যেমন আমি চাইনি—কোন সৎকাজে তোমায় কোন বাধাও আমি দিইনি! কারণ, ভাল ক'রেই তোমাকে চিনি—তার চেয়েও জানি তাদের দুরবস্থার কথা!

শান্তি নীরবে শুয়ে প'ড়্‌লো। কিন্তু মাঝরাতে জ্বরটা আরও একটু উগ্রমূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌লো। গলায় অসহ্য বেদনা। বাক্‌শক্তি সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হ'য়ে এলো। বুঝ্‌তে পার্‌লেন শান্তি প্লেগে আক্রান্ত হ'য়েছে।

সহরের তখন ভয়াবহ অবস্থা। কেউ কারও দিকে তাকাবার অবসর পাচ্ছে না। শরৎচন্দ্র যথাসাধ্য তা'র সেবা শুশ্রূষা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু শান্তির জ্ঞান আর ফির্‌লো না।

শরৎচন্দ্র বাইরের সাহায্য প্রার্থনা ক'র্‌লেন, কিন্তু সে কাল রোগে তাঁকে সাহায্য ক'র্‌বে কে? আত্মরক্ষার চেষ্টায় সবাই যে সেদিন দিশেহারা!

বেলা বারটার সময় একবার কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে শান্তির জ্ঞান ফিরে এলো। শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে কাতর নয়নে তাকিয়ে জড়তাভরা কণ্ঠে ব'ল্‌লো—তোমার কথার বহুবার অবাধ্য হ'য়েছি, ক্ষমা ক'রো। একটু থেমে ব'ল্‌লো—শেষ সময়ে একটু পায়ের ধূলো দাও!

শরৎচন্দ্রের চোখের পাতাগুলো সজল হ'য়ে উঠ্‌লো। মনে প'ড়ে

গেল অতীত জীবনের ছোট একটু কাহিনী। যখন তিনি নিজে ঘোরতর অসুস্থ, শান্তি পাশে ব'সে মাথার চুলগুলো ঠিকভাবে বিন্যস্ত ক'র্‌তে ক'র্‌তে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল—আমিও বামুনের মেয়ে, খাবে না আমার হাতে?

উত্তরে সেদিন শরৎচন্দ্র শুধু ম্লান হাসি হেসেছিলেন। শান্তি আপন মনে ব'লে গেল—মা মারা যাওয়ার পর বাবা ক্রীশ্‌চান বুড়িকে টাকার লোভে বিয়ে ক'রেছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মও অবলম্বন ক'রেছিলেন অবশেষে। বুঝ্‌লে বামুনদা, আমি কিন্তু মনেপ্রাণে বামুনের মেয়েই র'য়ে গেলুম, তার আর নড়্‌চড়্‌ এতটুকু হ'ল না!

শরৎচন্দ্র তাকে কোনদিনই অবিশ্বাস করেননি। তাই জড়তা ভাঙিয়ে তার হাতের শুধু অন্ন গ্রহণ করেননি, সেবাও গ্রহণ ক'রেছিলেন অকপটে। তিনি জান্‌তেন, মেয়েটি তাঁকে ভালবাসে মনেপ্রাণে,—একান্ত আপন ক'রে। তাই আজ যাত্রার শেষ পথে দাঁড়িয়ে—চাইলো শুধু পায়ের ধূলো—তার বেশী চাওয়ার প্রয়োজন বোধ আর সে ক'র্‌লো না!

সহসা মনে হ'ল দেহখানা যেন শান্তির শীতল হ'য়ে আস্‌ছে! সচকিত হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকালেন। দেখ্‌লেন, হাতখানা তাঁর হাতের উপর এলিয়ে প'ড়েছে। চোখে তার সতৃষ্ণ কাতর দৃষ্টি কিন্তু স্পন্দনহীন দেহ। শরৎচন্দ্র নিজেকে আর ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লেন না। মৃতদেহের ওপর আছাড়্‌ খেয়ে, ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—শান্তি—শান্তি—কথা কও শান্তি—

উত্তর এলো না—শুধু প্রতিধ্বনিটা বার বার ঘুরেফিরে বেড়াতে লাগ্‌লো।

*　　　*　　　*

বন্ধুবান্ধবের কাছে নিজ স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে শান্তির মৃতদেহ সৎকারের জন্যে শ্মশানঘাটে নিয়ে এলেন। সেই সময় এক সন্ন্যাসী তাঁকে খুব

সাহায্য ক'র্লেন। তিনিই নিজেই শবদাহের সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রেদিলেন। চিতা জ্বলে উঠ্লো। শরৎচন্দ্র ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্লেন।

সন্ন্যাসী তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে গাইলেন—

আমিই শুধু রইনু বাকী!
যা' ছিল তা' চ'লে গেল
রইল যা' তা' কেবল ফাঁকি!
বল্ দেখি মা—শুধাই তোরে
আমার কিছুই রাখ্‌লি নারে
আমি শুধু আমায় নিয়ে
কোন্ প্রাণে মা বেঁচে থাকি!

[ব্রঃ দেঃ শঃ হইতে গৃহীত]

* * * *

শান্তি শরৎচন্দ্রের মনে সত্যিই শান্তির নীড় রচনা ক'রেছিল। তাই তার বিচ্ছেদ-বেদনায় শরৎচন্দ্র শুধু অধীর হ'য়ে প'ড়্লেন না—নেশার মাত্রাটাও দিলেন বাড়িয়ে। সেইসঙ্গে মুখর হ'য়ে উঠ্লো তাঁর তুলি ও লেখনী। অসমাপ্ত 'চরিত্রহীন' বাস্তবের বুকে নেমে এলো—সেইসঙ্গে "নারীর ইতিহাসের"ও রচনা সুরু হ'য়ে গেল।

* * * *

প্লেগের মোড়ক তখনও থামেনি। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে রওনা হ'লেন বাসন্তীর আস্তানায়। কিন্তু জাহাজ ঘাটে ভিড়্লো না—শুধু মাল তোলা ও নামানোর জন্যে রাতটুকু নঙ্গর ক'রে রইলো বন্দরের একটু দূরে। মাঝি-মোল্লাদের হাত ক'রে স্থির ক'রে ফেল্লেন, সেই রাতের অন্ধকারে তাঁরা সাঁতার দিয়ে তীরে গিয়ে উঠ্বেন, আবার মাঝরাতে সবাই ফিরে আসবেন—শুধু চোর ভেবে যেন তারা উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা না ক'রে!

তারা নগদ দক্ষিণায় তুষ্ট হ'য়েছিল। ব'ল্লো—নজরের কাছি বরং একটা নিয়ে যান—স্রোতের টান একটু বেশী—রাতে-ভীতে কখন যে কি হ'য়ে যাবে বলা ত যায় না! দড়িটা ধ'রে উঠে এলেই বরং আমরা বুঝ্‌তে পা'র্‌বো আপনারা ফিরে এসেছেন।

কথা ও কাজ সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে গেল। জাহাজের রেলিংএ একগাছি সরু শনের দড়ি কোমরে বেঁধে একে একে রওনা হ'লেন। তীরে উঠে, পোষাক পরিবর্ত্তন ক'রে সোজা এগিয়ে চ'ল্‌লেন সহরের দিকে।

যে উৎসাহ নিয়ে তাঁরা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন তীরে উঠেই কিন্তু ভীত হ'য়ে প'ড়্‌লেন! লোকজন ত' দূরের কথা—একটা কুকুর-বিড়ালের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। রাত তখন আট্‌টা কি ন'টা, মনে হয় সহরটা যেন তারই মধ্যে নিঝুম-পুরীতে পরিণত হ'য়ে গেছে! আশ্‌পাশের প্রায় সব বাড়ীরই জান্‌লা-কপাট বন্ধ। একজন ব'লে উঠ্‌লেন, চল্‌, ফিরে যাওয়া যাক্‌, অভয়!

অভয় ছিলেন দলের পাণ্ডা। ব'ল্‌লেন, এসেছি যখন তখন একবার ঘুরে যেতেই হবে, কি বল শরৎদা?

শরৎচন্দ্র তাঁর কাহিনীর প্লট সঞ্চয়নে ডুবেছিলেন এতক্ষণ। ব'ল্‌লেন, নিশ্চয়!

* * *

নিঃশব্দে দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে চার মূর্ত্তি একটি দোতলা বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। ঘরের দরজা-জান্‌লা সব বন্ধ। তবে, ভেতরে যে মানুষ আছে, খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট আলোর রেখায় তা' সহজেই অনুমান করা যায়!

শরৎচন্দ্র আশপাশের বাড়ীগুলোর দিকে তাকালেন—সবারই অবস্থা এক! অথচ রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত এ পাড়াটা নাচগান ও হল্লায় মুখর হ'য়ে থাক্‌তো।

শরৎচন্দ্র কড়া নাড়া দিয়ে ডাক দিলেন, বসন্ত !

অন্যদিন বসন্ত মুখর হ'য়ে উঠ্তো। ছুটে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানাতো। কিন্তু আজ কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। শরৎচন্দ্র দরজায় একটু ধাক্কা দিতেই সেটা সশব্দে খুলে গেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দেখ্লেন, ঘরের ভেতরে মিটমিট্ ক'রে জ্বল্ছে একটা বাতি। আর বাসন্তী প'ড়ে আছে নিঃশব্দে কম্বল মুড়ি দিয়ে।

শরৎচন্দ্র ডাক্লেন, বসন !

কোন সাড়া এলো না। শরৎচন্দ্র তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কম্বলটা ঈষৎ ফাঁক ক'রে দেখ্লেন—বাসন্তীর কোন জ্ঞান নেই। গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ্লেন, জ্বরে গা' পুড়ে যাচ্ছে। বুঝ্তে পার্লেন—বাসন্তী প্লেগে আক্রান্ত হ'য়েছে।

সঙ্গীরা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শরৎচন্দ্র ফিরে এলেন। ব'ল্লেন, বোধ হয় বাসন্তীরও প্লেগ হ'য়েছে !

সভয়ে তিন হাত তাঁরা পিছিয়ে এসে জিজ্ঞাসা ক'র্লেন, তাকে ছুঁয়েছিস না কি রে ?

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন—হ্যাঁ !

সঙ্গীরা সেই মুহূর্ত্তেই সমস্বরে রায় প্রকাশ ক'র্লেন, সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্ ! পালাই চল্—এখানে আর একটি মুহূর্ত্তও না !

শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটে উঠ্লো। ব'ল্লেন—তা হয় না অভয়দা' ? যার কাছে আমরা আনন্দ উপভোগের জন্যে বারবার এসেছি, এবং উপভোগও ক'রে গেছি অতৃপ্ত আবেগে, সে আজ পীড়িত, একান্ত অসহায় ! তাকে কি একা ফেলে যাওয়া যায় ?

একজন বন্ধু বিদ্রূপ ক'রে উঠ্লেন—বেশ্যা, তার আবার প্রেম ? তার আবার ভালবাসা—কি যে তুমি বলো শরৎদা ? চলো—চলো—পালাই ! ম'র্তে যাবে কে ?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—তোমরা যাও ভাই! বসন ভাল হ'য়ে না ওঠা পর্য্যন্ত আমি এখানেই থাক্‌বো!

সঙ্গীটি হেসে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো—সত্যই তোমার দরদ দেখে হাসি পায় শরৎদা! তবুও যদি মেয়েদের গায়ে হাত তুমি দিতে পার্‌তে—

শরৎচন্দ্র কয়েক সেকেণ্ড চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে ব'লে উঠ্‌লেন—তোমার কথা এতটুকুও মিথ্যা নয় অজয়! আমি ভোগের লালসা নিয়ে এদের কাছে কোনদিন আসিনি, আসি শুধু এদের জান্‌তে! এরা ছাড়া ত' জানার অবকাশ সহজে কেউ দেবে না বন্ধু! সহসা গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, বিশ্বাস ক'র্‌বে কিনা জানিনে—কিন্তু এ কথাটাই সত্যি। কেউ নিজে এসে আত্মসমর্পণ না ক'র্‌লে সহজে তাদের গায়ে আমি হাত দিতে পারিনি। হয়ত এটা দুর্ব্বলতা—তবুও ত সেই দুর্ব্বলতাই আমার গলায় বিজয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছে! একটু থেমে কি যেন ভেবে নিয়ে ব'ল্‌লেন, তোমরা উপহাস ক'র্‌ছো—হয় ত' চিরদিনই ক'র্‌বে, কিন্তু সত্যকে ত' উপহাস করা যায় না! বাসন্তী নাচ্‌তো, গাইতো। তার বিনিময়ে নিতো টাকা। তার বেশী চাইলেও সে দেয়নি কোনদিন সাড়া—অথচ সে নিজেই আমার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেছিল, শুধু তাই নয় বার বার ব'ল্‌তো, সবাই আসে লেন-দেনের জন্যে, কিন্তু তুমি কেন আস ঠাকুর? তুমি ত' কিছু চাও না! উত্তরে ব'লেছিলাম, —ভাল লাগে তাই আসি! বাসন্তী উত্তরে ব'ল্‌লো—বোধ হয় চাওনি ব'লেই আজ আর আমার ব'লে কিছু নেই, সবই উজাড় ক'রে দিয়েছি গো তোমারই চরণতলে! চকিতে খসে গেল তার সেই বক্র-চোখ-ঝল্‌সানো হাসি। ছল্‌ছল্‌ ক'রে উঠ্‌লো চোখের পাতাগুলো। অধীর আবেগে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো ঠোঁটের দুটো পাতা—উদ্বেলিত হ'ল যৌবন কুসুম দু'টি! সে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিল আমার কাছে। না—না—অভয়দা, সে কথা, সেই দৃশ্য—আজও আমি ভুল্‌তে পারিনি,

তোমরা যাও, আমি পারবো না ওকে ছেড়ে যেতে, এই নিঃস্বহায় অবস্থায় ফেলে!

অভয়দা' এতক্ষণ নির্ব্বাক শ্রোতার স্থান অধিকার ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন। মুখর হ'য়ে উঠলেন, তোমায় ফেলেই বা আমরা যাই কেমন ক'রে?

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—তোমাদের সংসার আছে, তাদের মুখ চেয়ে ফিরে যাও অভয়দা'! এ দুনিয়ায় আমার আপন ব'লবার কেউ নেই—থাকলেও তারা আছে এতদূরে যে, আমার মৃত্যু-খবর তারা কোনদিনই পাবে না, পেলেও ক্ষতিবৃদ্ধি তাদের হবে না। যাও ভাই, আমার অনুরোধ—

অভয়দা' বাধা দিয়ে উঠ্লেন, কিন্তু—

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন, সবচেয়ে এ দুনিয়ায় বড় কথা হ'ল, জন্ম-মৃত্যু কারও হাত ধরা নয়! যদি মরি—তোমরা দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলো ভাই—সেই হ'বে আমার শেষের পাথেয়!

শরৎচন্দ্র চ'লে গেলেন। কয়েকটি বন্ধু হেসে উঠ্লেন, পাগোল!

অভয়দা কিন্তু কোন কথাই ব'ল্লেন না। নীরবে রওনা হ'লেন ষ্টীমার-ঘাটের দিকে।

* * * *

বাসন্তীর জ্ঞান ফিরলো। সভয়ে আঁৎকে উঠ্লো··· তুমি—তুমি—কেন—কেন এলে ঠাকুর?

শরৎচন্দ্র বাধা দিয়ে ব'ল্লেন, ব্যস্ত হ'য়ো না বসন—নিশ্চয়ই সেরে উঠ্বে—ভয় কি?

বাসন্তী হাঁপিয়ে উঠেছিল। কয়েক মিনিট তাঁর মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে ব'ল্লো, ভয়? তার মুখে ফুটে উঠ্লো' ম্লান একটু হাসি! ব'ল্লো—নিজের জন্যে আজ এতটুকুও ভয় নেই ঠাকুর—শুধু—

কথা তার অসম্পূর্ণ র'য়ে গেল। গণ্ড ব'য়ে গড়িয়ে প'ড়্‌লো কয়েক ফোঁটা অশ্রু!

বাসন্তী আবার জ্ঞান হারালো। শরৎচন্দ্র ব'সে ব'সে তার মাথায় পাখার বাতাস ক'র্‌তে লাগ্‌লেন।

কয়েক ঘণ্টা পরে পুনরায় তার জ্ঞান ফির্‌লো। কিন্তু সে হারিয়ে ফেলেছে তার বাক্‌শক্তি! অসহ্য যন্ত্রণায় তার মুখমণ্ডল বার বার কুঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। শরৎচন্দ্র তার মুখে ওষুধ একটু ঢেলে দিলেন।

বাসন্তী বাধা দিল না। গলধঃকরণের শক্তি তখন তার শেষ হ'য়ে এসেছে। মুখের কোয়াস্‌ বেয়ে খানিকটা গড়িয়ে প'ড়্‌লো, খানিকটা র'য়ে গেল ভেতরে! হাতটা তোল্‌বার একবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'র্‌লো। তারপর নিঃশব্দে চেয়ে রইলো শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে।

শরৎচন্দ্রের মনে প'ড়ে গেল শান্তির কথা। সেওএমনি অতৃপ্ত তৃষায় তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল—কিন্তু সে পলক তার আর পড়েনি। তবে কি বাসন্তীও আজ তাঁকে ছেড়ে চ'লে যেতে চায়? কাতরকণ্ঠে ডাক্‌লেন, বসন!

বাসন্তী তাঁর হাতখানা চেপে ধ'রে চোখের পাতাগুলো বুজিয়ে নিল। কিন্তু সে পাতা আর খুল্‌লো না।

শরৎচন্দ্র দেখ্‌লেন, তার 'বুকের স্পন্দন ধীরে ধীরে স্থির হ'য়ে গেল। এই যে পাশে ছিল, সে আজ আর নেই—একথা বিশ্বাস ক'র্‌তে মন কিছুতেই রাজি হয়না! অন্তরটা আকুলি বিকুলি ক'রে উঠ্‌লো। চোখের পাতাগুলো সিক্ত হ'য়ে গেল। বুঝ্‌লেন, বিচ্ছেদ বেদনার মত যন্ত্রণা এ দুনিয়ায় কিছু আর নেই!

পুরুষের জীবনে শোকের অবসর বড় একটা থাকে না। শরৎচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। নিজ স্ত্রীর পরিচয়ে শবদাহের ব্যবস্থা ক'রে, পরদিন যাত্রা ক'র্‌লেন, রেঙ্গুনে!

* * * *

রেঙ্গুনে ফিরে তিনি নিজেও অসুস্থতা বোধ ক'র্‌তে লাগলেন, গলার গ্লাণ্ডগুলো ফুল্‌লো, দেহের সর্ব্বত্রই ব্যথা। বুঝ্‌লেন, এ যাত্রা আর রক্ষা তাঁর নেই!

পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়। নিরুপায়ে কাৎরাতে থাকেন। উত্থানশক্তি রহিত। জ্ঞানও র'য়েছে একটু। অসহ্য যন্ত্রণায় একবার উঠেন, একবার বসেন। শেষে মরিয়া হ'য়ে পাশের র‍্যাকে যে দু'বোতল কেরোসিন তেল ভর্ত্তি ছিল, তাকে জল ভেবে ঘট্‌ঘট্‌ ক'রে সবটুকু শেষ ক'রে ফেল্‌লেন। তারপর তিনি হারিয়ে ফেল্‌লেন জ্ঞান।

দু'দিন পরে তাঁর জ্ঞান ফির্‌লো। মনে হ'ল যেন সদ্য তিনি ঘুম থেকে উঠ্‌ছেন! জ্বর আর নেই, দেহের ব্যথাও গেছে মিলিয়ে। ধীরে ধীরে সেদিনের সমস্ত ঘটনা মনে হ'তে লাগ্‌লো। অনুমান ক'রে নিলেন, কেরোসিনের জন্যেই হয়ত তিনি প্লেগ রাক্ষসীর হাত থেকে এ-যাত্রা নিষ্কৃতি পেয়ে গেছেন! তারপর থেকে যখনই তিনি শুন্‌তেন কারও প্লেগ হ'য়েছে, তিনি নিশ্চিন্ত মনে দাওয়াই স্থির ক'রে দিতেন—স্রেফ্‌ দু'বোতল কেরোসিন তেল—বাস্‌, রোগ বাপ্‌ বাপ্‌ ক'রে পালিয়ে যাবে আপনা থেকে।

* * * *

শরৎচন্দ্র নির্জ্জনে ইরাবতীর তীরে বেড়াচ্ছেন আপন মনে, সহসা দু'টি প্রাণী এসে দাঁড়ালো। শরৎচন্দ্র মুখ তুলে তাকালেন। একটি বাঙ্গালী যুবক, অপরটি এ্যাংলো বর্ম্মিজ-মেয়ে। বাংলাও ব'ল্‌তে পারে বেশ। যুবকটি শরৎচন্দ্রের পূর্ব্ব-পরিচিত। নাম তার বিজলী। সে নিজেই মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, ইনি আমার বিবাহিতা স্ত্রী। নাম কমলা। একটু টেনে হেসে উঠে ব'ল্‌লো, নামটি অবশ্য আমারই দেওয়া!

কথাবার্ত্তায় মেয়েটিকে শরৎচন্দ্রের খুব ভাল লাগ্‌লো। সেও তাদের বাড়ীতে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে গেল।

* * * *

সেদিন মনটা শরৎচন্দ্রের অজানা একটা কারণে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। পড়ায় মন ব'সে না, লেখা বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে—কলমের মুখটা স'রছে না। কোথায় যেন একটা খেই হারাণোর সুর! বার বার কয়েকটা পাতা নষ্ট ক'রে অবশেষে রং ও তুলি নিয়ে ব'সলেন—সেখানেও ব্যর্থ হ'লেন। অবশেষে উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। দূরে বিজলীকে হাসিমুখে বাড়ীর পথে ফিরে যেতে দেখে, কমলার কথা তাঁর মনে প'ড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পা দু'টো তাঁর চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। দ'রজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে প'ড়্‌লেন সেই মুহূর্ত্তে।

শরৎচন্দ্রকে দেখে কমলা বিশেষ খুশী হ'য়ে উঠ্‌লো। সাদরে বসবার জন্য বেতের একটা মোড়ক এগিয়ে দিল। একটি ট্রে ক'রে কয়েকটা চুরুট পাশের মোড়কের উপর রেখে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে জল খাবারের প্লেট্‌টা নিজেই শরৎচন্দ্রের মুখের সাম্‌নে নিয়ে এসে ধ'র্‌লো। ব'ল্‌লো—নিন দাদা! কেন জানি না আজ বার বার আপনার কথাই মনে প'ড়্‌ছিল!

শরৎচন্দ্রের মনটা এতক্ষণে তাজা হ'য়ে উঠেছিল। তিনিও খুশীভরা হাসি হেসে ব'ল্‌লেন—হয়ত মনের একটা যোগাযোগ আছে কমলা, তাই একান্তে আমিও ছুটে এলাম তোমারই কাছে!

উভয়ে হেসে উঠ্‌লেন। একটা টুলে চেপে ব'সে বিজলীও সে হাসি ও গল্পে যোগ দিয়ে ব'ল্‌লো—দেখুন শরৎদা, বারবার ফাঁকি দিলে চ'ল্‌বে না। আজ আমাদের দু'টো গান শুনিয়ে যেতে হ'বে! বোধ হয় জানেন না, কমলা আপনার গানের একজন পরম ভক্ত! আপনার নাম শুন্‌লেই ও চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। মনে কি হয় জানেন, আপনাদের সঙ্গে পূর্ব্বজন্মের কোন সম্বন্ধ ছিল—তা' ছাড়া ও এদেশের মেয়ে হ'লেও, ওর নাড়ীর সঙ্গে বাংলা দেশের কেমন যেন একটা নাড়ীর গভীর সংযোগ র'য়ে গেছে!

শরৎচন্দ্র ভাল গান জান্‌লেও সহসা গাইতে রাজী হ'তেন না।

এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। তিনি এড়িয়ে চ'ল্লেন। ব'ল্লেন, আজ শরীরটা ভাল নেই, দিদি! তবে কথা দিয়ে যাচ্ছি, একদিন তোমায় আমি নিশ্চয় গান শোনাবো!

কমলা ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্লো। ব'ল্লো—তোমার মুখটিও আজ বড় শুক্নো শুক্নো দেখাচ্ছে! খুব ক্লান্ত—না? সেই বরং ভাল, আমরা দু'জনে একসঙ্গে বোটে চ'ড়ে যেদিন বেড়াবো, আপনি আমাদের তীরে ব'সে গান শোনাবেন! কি বলেন দাদা?

কমলার মুখের স্নিগ্ধ হাসিটি শরৎচন্দ্রের ভারি ভাল লাগ্ছিল। ব'ল্লেন্, চমৎকার তোমার চয়েস্ দিদি? তাই হ'বে! শরৎচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন।

কমলা তাঁর সঙ্গে কিছুদূর পর্য্যন্ত এসে এগিয়ে দিয়ে গেল। ব'ল্লো, মাঝে মাঝে কেন আসেন না দাদা? আপনার মত লোক পেলে দু'টো কথা ক'য়ে যে আরাম পাই!

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন, সময় পেলেই আস্বো—কথা দিলাম দিদি!

* * *

শনিবার। ঝির্-ঝির্ ক'রে বৃষ্টি প'ড়্ছে। সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরে এসেছেন। আবহাওয়ার সঙ্গে মনটাও খেই ফেলেছে হারিয়ে। বারান্দার সাম্নে আরাম কেদারাটা টেনে ব'সে আছেন, সাম্নে এসে দাঁড়ালো কমলা।

শরৎচন্দ্র ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্লেন। কোথায় বসাবেন এই মেয়েটিকে! সেদিন নিজের চোখে দেখে এসেছিলেন তার বাড়ী। সব কিছুই পরিষ্কার—বেশ ঝক্ঝকে! আর তাঁর ঘরটা শুধু ধূলো ও ছেঁড়া কাগজে মলিন নয়, রীতিমত অপরিচ্ছন্নও বলা চলে নিঃসন্দেহে!

কমলার কিন্তু কোন দিকেই দৃষ্টি ছিল না। মুখের দিকে তাকিয়েই

অনুমান ক'রে নিয়েছিল, শরৎচন্দ্রের মেজাজ আজ ভাল নেই। তাই চট্ ক'রে কপালে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, তোমার কি শরীর ভাল নেই দাদা ?

শরৎচন্দ্র নিজে উঠে, কমলার দিকে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লেন—না, ভালই আছি দিদি! বসো! একটু হেসে ব'ল্‌লেন, মনের সঙ্গে আমার—প্রকৃতির একটা গভীর যোগ র'য়েছে, তাই তার রূপ বদ্‌লানোর সঙ্গে—আমার মনের ধারাটাও যায় বদ্‌লে।

কমলা ব'স্‌লো না। ব'ল্‌লো, তা'হলে তোমায় আজ একটু খাটাবো দাদা!

শরৎচন্দ্র হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন। একটা কাজই ত মন তাঁর চাইছিল এতক্ষণ! কিন্তু কি যে সে বস্তু, তার বোঝাপড়া এখনও শেষ হয়নি! ব'ল্‌লেন, বলো দিদি, কি ক'র্‌তে হবে ?

কমলা একটু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো, উনি নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা ঠিক্ ক'রেছি, আজ এই বাদল বেলায় একটা স্যাম্‌পানে চ'ড়ে নদীর কূলে ভেসে ভেসে বেড়াবো—আর আপনি একটা গান শোনাবেন।

শরৎচন্দ্র একটু বিপদে প'ড়্‌লেন কিন্তু মুখফুটে 'না' ব'ল্‌তে পার্‌লেন্ না। ব'ল্‌লেন, বেশত' চলো—আমি একটু তৈরী হ'য়ে নিই।

স্যাম্‌পানটি ছোট। দু'জনে তারা উঠে ব'স্‌লো। বিজ্‌লী ধ'র্‌লো হাল, কমলা ছপ্‌ছপ্ ক'রে টান্‌তে লাগ্‌লো দাঁড়।

শরৎচন্দ্র তীরে একটা গাছের গুঁড়ির উপর ব'সে গাইলেন—'ভালবাসা নহে ত আলেয়া, আলো সে যে শুধু আলো···'

গান শেষ হ'ল। হাসিমুখে উভয়েই স্যাম্‌পান থেকে নেমে শরৎচন্দ্রের পাশে এসে ব'স্‌লো। শরৎচন্দ্রও মৃদু হাস্‌লেন। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, ভালো লাগ্‌লো, দিদি ?

কমলা শরৎচন্দ্রের প্রায় কোলের কাছে একটু কাৎ হ'য়ে শুয়ে প'ড়্‌লো। ব'ল্‌লো, চমৎকার !···

*   *   *   *

বাসায় সবে পা দিয়ে, আলোটি জ্বেলেছেন, সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো মালতী। চোখ দু'টো তার লাল, মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো, মুখটা ভয়ে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, ব্যাপার কি মালতী ?

মালতী নিজেকে সাম্‌লাতে পার্‌লো না। চোখের কোল বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে প'ড়্‌লো। ব'ল্‌লো—তুমি ত' সবই জানো ঠাকুর ! সম্বল যা' ছিল, সব শেষ ক'রে তোমারই দয়ায় সে'বার ওকে বাঁচিয়ে তুলেছিলাম। কিন্তু পোড়া কপাল এমন যে, শান্তি জীবনে আমার আর এলো না ! বোধ করি অসুখটা গোপন ক'রেই রেখেছিল, নইলে ওষুধের শিশিটাই বা এলো কেমন ক'রে ? এখন তুমি ছাড়া আমার ত' দ্বিতীয় পথ নেই ঠাকুর !

শরৎচন্দ্র দ্বিতীয় প্রশ্ন ক'র্‌লেন না, বেরিয়ে প'ড়্‌লেন তাঁর ছোট ওষুধের ব্যাগ্‌টি হাতে নিয়ে।

রোগীকে পরীক্ষা ক'রে বুঝ্‌লেন ডবল নিউমোনিয়া। বাঁচানো খুবই শক্ত। তবুও ত' চেষ্টা ক'রে একবার দেখ্‌তে হ'বে ! কয়েক ফোঁটা ওষুধ শিশিতে ফেলে দিয়ে ব'ল্‌লেন—দেখ মালতী বরাতের জোর থাকে বাঁচ্‌বে, নইলে—

শরৎচন্দ্রকে মালতী কথাটুকু শেষ ক'র্‌তে দিল না। আঁৎকে উঠ্‌লো, বাঁচ্‌বে না ?

শরৎচন্দ্র নিজেকে সংযত ক'রে নিলেন। ব'ল্‌লেন, মানুষকে ত' চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে হবে ! একটু থেমে বুকটা বেঁধে দিলেন।

ব'ল্লেন, তিসির পুল্টিস্ দেবে। সাবধান কিন্তু—ঠাণ্ডা যেন আর না লাগে!

*　　*　　*　　*

শরৎচন্দ্র সকালে বিকালে মালতীর বাসায় ছোটাছুটি ক'র্লেন দশদিন। দেখ্লেন, গভীর তপস্যায় সমাহিত মালতী। স্বামীকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ সে সেবাযত্ন ক'রে চলেছে! এমন কি দশদিনের মধ্যে একটি মুহূর্ত্তের জন্যেও সে বিশ্রাম নেয়নি, মুখে জল পর্য্যন্ত দেয়নি। শরৎচন্দ্র বরং বার বার তাকে ধমক দিয়েছেন, এটা মানুষের শরীর! অযত্ন ক'র্লে, এখন বিপদ যা' আছে, বাড়্বে তার শতগুণ। আমিও তখন আর আস্বো না ভূতের বেগার খাট্তে!

মালতী উত্তর দিল না। সজল করুণ দৃষ্টিতে মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইলো। শরৎচন্দ্রের মায়া জাগ্লো। নিজেই তার জন্যে খাবার কিনে নিয়ে এলেন। ব'ল্লেন, খেয়ে নাও মালতী।

মালতী জিভ্ কেটে ব'ল্লো—পাপের মাত্রা আর বাড়াবো না ঠাকুর! যদি সত্যই আমাকে এতটুকু ভালবাসো—তা' হ'লে তোমার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ একটু দাও, রাজভোগের প্রয়োজন আমার নেই! সে সুখের দিন আমার বহুদিন পূর্ব্বেই গেছে ফুরিয়ে!

শরৎচন্দ্র কৃত্রিম ধমক্ দিলেন—তা কি হয়? জীবন যতদিন আছে, ততদিন শরীরটার প্রতি অবিচার ক'র্লে, তাতে পুণ্য কতটুকু হয়—তা জানি না, তবে পাপের মাত্রাটা যে বাড়ে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই!

দশদিনের দিন অমৃতলাল মারা গেল। মালতী মৃতদেহের উপর আছাড় খেয়ে প'ড়্লো। কিছুক্ষণের জন্যে তার জ্ঞান ছিল না। যখন

ফিরে এলো তার সংজ্ঞা, তখন ফোঁপাতে লাগ্‌লো—ওগো, সত্যই তুমি চ'লে যেতে পার্‌লে ?

* * * *

মালতী অভিজাতশ্রেণীর কোন এক ভদ্রঘরের মেয়ে। ছোট বয়সেই নানা লোকের হাত ফিরি হ'য়ে অমৃতলালের সঙ্গে পাড়ি দিয়েছিল বর্ম্মামুলুকে। লোকটার না ছিল রূপ, না ছিল গুণ। লম্বাটে-প্যাকাটে, কালো, বদরাগী—সকল সময়েই চিন্তামগ্ন। সে যে কি ভাবে, কি করে, তার সন্ধান আজ দু'টি বছরের মধ্যেও শরৎচন্দ্র আবিষ্কার ক'র্‌তে পারেননি। তবে একটা গুণ ছিল, সহসা কারও সঙ্গে সে মিশতো না, প্রয়োজনের বেশী একটি কথাও সে বড় একটা কইতো না। তার উপর কণ্ঠস্বরটা তার ছিল কর্কশ! নিজের চিন্তা-রাজ্যেই সে ক'র্‌তো বিচরণ। আর মালতীর ছিল অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য। ছিল ভরা-যৌবনের উজ্জ্বল দীপ্তি। তার ওপর সে ছিল সুকণ্ঠী গায়িকা।

লোকে তার নামে শত অপবাদ দিয়েছে, হাসিমুখে সে তা' মাথায় পেতে নিয়েছে, কোন প্রতিবাদ ক'রেনি কোনদিন। প্রতিবেশীর বিপদে, সমস্ত ভার নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে, তবুও সমাজে ছিল সে ঘৃণিত ও পতিতা এক নারী! তার বেশী মূল্য কেউ দেয়নি, বরং তিরস্কারের তীক্ষ্ণ বাণী হেনেছে বার বার।

লোকের মুখের গল্প শুনে, শরৎচন্দ্রও প্রথম প্রথম তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তে পারেননি। কিন্তু যেদিন তার অন্তরের সঙ্গে তাঁর হ'য়েছিল পরিচয়—সেদিন তাঁর সমস্ত শ্রদ্ধা উজাড় ক'রে দিয়েছিলেন এই মেয়েটির উপরে।

মেয়েটি তাঁকে বিশ্বাস ক'র্‌তো অকপটে। তাই তাঁর কাছে কোন-দিন কোন কথা গোপন করেনি। বরং সহজ ও সরল কণ্ঠে ব'লে গেছে

তার অতীত জীবনের বিচিত্র কাহিনী। চলার পথে সে বহু লোকের সংস্পর্শে এসেছে, বহু লোকের কাছে আত্মসমর্পণও ক'রেছে, কিন্তু ভাল সে বাসেনি কাউকেও! অথচ যার প্ররোচনায় সে স্বেচ্ছায় এ পথে এসেছিল নেমে, তাদের বিশ্বাসঘাতকতায় সে শুধু নিরুপায়ই হয়নি, দাঁড়াতে হ'য়েছিল তাকে পথের ধারে—নগরীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিলাস-বস্তুর উপকরণরূপে। ঠিক সেই সময়েই এলো অমৃতলাল। ভাল লাগ্‌লো মালতীর। নিজেকে উৎসর্গ ক'র্‌লো সে তারই চরণতলে!

সেই সাধের দেবতা এই অমৃতলাল। তাকে কেন্দ্র ক'রেই তার জীবনে এলো নতুন প্রভাত—কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উঠ্‌লো মহা-প্রলয়ের ঘূর্ণীবার্ত্তা। আজ সে আবার পথের যাত্রী!

চোখের জল তার থামে না। ব'ল্‌লো, বিশ্বাস করো বামুনদা, ভালবাসা ব'লে সত্য কিছু যদি থাকে, সেই ভালোই তাকে আমি বেসেছিলাম! তাই ত' নিজেকে হারিয়েছিলাম এমনি ক'রে।

সে নিজেই ব'লেছিল—সে পতিতা। তার বেশী যদি কেউ সম্ভ্রম বা শ্রদ্ধা ক'রে, সে ভুলই ক'র্‌বে বামুনদা! আমি যা, তার বেশী ত হ'তে পারিনে। কিন্তু অমৃতলালের মৃত্যুর পর তার সাজ-সজ্জা, লৌকিক আচার ও বিহার দেখে, তাকে সতী-সাধ্বী স্ত্রী ছাড়া কোন কিছু বলার উপায় রইলো না কারও।

সে শাড়ী ছেড়ে প'র্‌লো থান—ভাঙলো শাঁখের শাঁখা—নদীর জলে ফেলে দিয়ে এলো তার হাতের নোয়া—মুছ্‌লো সিঁথির সিঁদুর—আরম্ভ হ'ল—কঠোর ব্রহ্মচর্য্য।

তার আচরণে শরৎচন্দ্র শুধু মুগ্ধ হ'লেন না—অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলেন। এই অভিজ্ঞতাই তাঁর মনে একটা গভীর ছাপ এঁকে রেখে গেল। নারী—সে হ'লই বা পতিতা—সুযোগ-সুবিধা পেলে সে-ও সতী-সাধ্বীর স্থান অধিকার ক'র্‌তে পারে অনায়াসে!

অফিসে যাওয়ার জন্তে তৈরী হ'চ্ছেন—ছ'জন লোক হন্ত-দন্ত হ'য়ে উপরে এসে দাঁড়ালো। শরৎচন্দ্র বিস্ময়ভরে তাদের মুখের দিকে তাকাতেই তারা সবিনয়ে নিবেদন ক'র্‌লো, বড়ই বিপন্ন, স্থার, একটা দিনের জন্যে আমাদের আশ্রয় দিতে হবে।

সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা লোককে আশ্রয় দেওয়ায় বিপদ্ যথেষ্ট। ব'ল্‌লেন—আশ্রয় চাইলেই ত আশ্রয় পাওয়া যায় না—তার কারণটাও দেখাতে হয় সঙ্গে সঙ্গে, নইলে লোকে বিশ্বাস ক'র্‌বে কেমন ক'রে ?

ছ'জনে শরৎচন্দ্রকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ব'ল্‌লো, আমরা দেশ থেকে ইংরাজ রাজত্বের অবসান ক'র্‌তে চাই! বাংলা-মুলুক থেকে পালিয়ে এসেছি কোন রকমে—কিন্তু এখানেও পুলিশের নজর প'ড়েছে। আপনাকে বাঙালী ব'লে মনে হ'চ্ছে—যদি—

শরৎচন্দ্র চকিতে খাড়া হ'য়ে দাঁড়ালেন। ব'ল্‌লেন, আর পরিচয়ের আবশ্যকতা বোধ করিনে। নির্ভয়ে থাকুন্—খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। তবে অপেক্ষারও অবসর নেই—এখুনি অফিস ছুট্‌তে হ'বে।

তারা নিশ্চিন্ত মনে সেখানেই ব'সে প'ড়্‌লো। শরৎচন্দ্র তাদের আহার সংগ্রহে বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এলেন। উড়ে-ঠাকুর তাঁর পিছু পিছু খাবার নিয়ে ভেতরে ঢুক্‌লো! শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, এঁরা আমার আত্মীয় ঠাকুর, যখন যা' প্রয়োজন দিয়ে যেয়ো তোমার সুযোগ সুবিধামত।

শরৎচন্দ্র বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম ক'র্‌তেই একজন ব'লে উঠ্‌লো—আমাদের কিন্তু কোন কথাই আপনাকে বলা হয়নি—

শরৎচন্দ্র মৃদু হাস্তে উত্তর দিলেন, সে সময়ও পালিয়ে যায়নি। ফিরে এসে সব শুন্‌বো!

* * *

অফিস থেকে একটা দুশ্চিন্তা নিয়েই ফিরে এলেন্! হয়ত দেখ্‌বেন্,

সারা বাড়ীটা লালপাগ্ড়ীতে ভ'রে গেছে। বাসায় ফিরে কিন্তু স্বস্তি ফিরে পেলেন। কোন কিছুই হয়নি! তারাও নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাচ্ছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একটু কাজে বেরুবেন ঠিক ক'রেছেন—এমন সময় দুই বন্ধুই উঠে ব'স্লো। একজন জিজ্ঞাসা ক'র্লো, কখন এলেন?

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—তা হ'ল বৈকি, প্রায় আধ ঘণ্টা!

যুবক ব'ল্লো—আমাদের ডাকেননি কেন?

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—ক্লান্ত ব'লে মনে হ'চ্ছিল!

যুবক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—আপনার অনুমান এতটুকুও মিথ্যে নয়! হাঁটাপথে এখানে এসেছি, সঙ্গে ছায়ার মত পুলিশও ধাওয়া ক'রেছে। আশ্রয় মাঝে মাঝে পেয়েছি, কিন্তু এমন নিশ্চিন্তে বিশ্রামের অবসর কোনদিন আমরা পাইনি!

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্লেন—এরপর যাত্রা ক'র্বেন কতদূর?

যুবক ব'ল্লো—কোন স্থিরতা নেই আমাদের! এখানে থেকে যদি বুঝি, কাজ চালানো সম্ভব—একটা আস্তানা আমরা এখানেই ঠিক ক'রে নেবো, আর যদি দেখি, সুবিধে হ'বে না—যাত্রা ক'র্বো সুমাত্রা কিংবা জাভা। সেখানেও যদি অসুবিধা দেখি, তবে সোজা চীনের মধ্য দিয়ে জাপানে পাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা ক'র্বো।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্লেন্—তা'তে লাভ?

যুবক ব'ল্লো—ভেতরে যখন কাজ করা অসম্ভব—তখন বাইরে একটা অর্গানাইজেশন গ'ড়ে তোলার চেষ্টা ক'র্তেই হ'বে, নইলে আমাদের আজন্ম সাধনা শুধু কল্পনাই র'য়ে যাবে।

বাইরে পাণ্ডাঠাকুরকে দেখা গেল। শরৎচন্দ্র তাকে খোঁজ নেওয়ার কথা ব'লে এসেছিলেন, তাই সমস্ত কথা এখানেই চাপা প'ড়ে গেল। শরৎচন্দ্র তাকে দেখামাত্র কথার মোড় ঘোরালেন—বাইরে কেন শিবচন্দ্র? শোন, বাবুদের জন্যে খাবার আর চা এনে দাও।

শিবচন্দ্র কি একটা কাজ উপলক্ষ্য ক'রে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। শরৎচন্দ্রও আলোচনায় যবনিকা টেনে দিলেন। ব'ল্লেন—একটু কাজ আছে, এখন বেরুচ্ছি, রাতে আবার কথা হ'বে।

* * *

রাত্রি ৯টায় আহার শেষ ক'রে সকলেই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'রলেন। ফিস্ ফিস্ ক'রে কথাবার্ত্তা চ'ল্তে লাগ্লো।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'রলেন—সন্ত্রাসবাদে সত্যই কি আপনারা আস্থাশীল? এর দ্বারা সত্যিই কি দেশের কোন উপকার সাধন সম্ভব?

যুবক উত্তর দিল। এছাড়া—দ্বিতীয় কথা আমরা স্বপ্নেও ভাব্তে পারি না। অপর বন্ধুটি ব'ল্লো—তার চেয়েও সহজ ও সরল কথা এই যে, আমাদের সম্মুখে একটিমাত্র পথ খোলা আছে—হয় মন্ত্রের সাধন, নইলে শরীর পতন—তার বেশী ভেবে দেখার অবসর আমাদের নেই।

শরৎচন্দ্র আর দ্বিতীয় প্রশ্ন ক'রলেন না। নীরবে শুয়ে শুয়ে সেই কথাগুলোই বার বার ভাব্তে লাগ্লেন। সেইসঙ্গে তাঁর চিন্তাধারাও গেল ব'দ্লে।

* * *

পরদিন তাদের যাত্রা করার কথা, কিন্তু একজন সহসা একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়ায়, আরও দু'দিন তারা সেখানে থেকে যেতে বাধ্য হ'ল। শরৎচন্দ্র তাদের সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটি ক'রলেন না। সেই বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনরাত্রি বসবাসের পর তাঁর মনেও জ্বলে উঠ্লো বিপ্লবের দীপ্তিশিখা! এতদিন যা' তাঁর অবচেতন মনের পর্দ্দার অন্তরালে চাপা প'ড়েছিল একান্ত অজ্ঞাতে, সেই স্রোতটাই তাঁকে ব্যাকুল ক'রে তুল্লো। বারবার

তাগিদ দিতে লাগ্‌লো—এগিয়ে চলো—এগিয়ে চলো—আরও সম্মুখ পথে!...

* * * *

তারই কিছুদিন পরে একটি সুবেশা সুশ্রী বিদেশী নারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সুযোগ এলো একান্ত আচম্বিতে। মনটা যখন তাঁর ভাল থাকতো না, প্রায় তিনি ইরাবতীর নির্জ্জন তীরে গিয়ে ব'সে প্রকৃতির রূপ দেখ্‌তেন, মনের জ্বালাও সেই সঙ্গে যেতো মুছে। তিনি ভুলে যেতেন নিজেকে—ভুল্‌তেন পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণীয় বস্তুকে।

হঠাৎ চুড়ির রিণিটিন্‌ ঝিন্‌ঝিন্‌ শব্দ তাঁর চমক ভেঙ্গে দিল। চেয়ে দেখ্‌লেন, পাশে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মেয়ে। ভাঙ্গা বাঙ্‌লায় ব'ল্‌লো, বাবুজী, একটু আশ্রয় দিতে পারেন?

আশ্রয়? কেন? চকিতে তাঁর মনে সেই যুবক দু'টির স্মৃতি জাগরূক হ'য়ে উঠ্‌লো। তাদের আচরণে শরৎচন্দ্র মুগ্ধ হ'য়েছিলেন—আরও কিছুদিন থেকে সম্পূর্ণ সবল ও সুস্থ হ'য়ে যাওয়ার অনুরোধও জানিয়েছিলেন—কিন্তু তারা সকল কিছুর বাইরে। জীবনের প্রতি তাদের এতটুকুও মায়ামমতা নেই। তারা যেন লোহার মানুষ, যা ব'লে, তাই ক'রে। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। শরৎচন্দ্র নিজের মনে নিজেই ভেবে নিলেন—হ্যাঁ, একেই বলে জীবন!

কানের পর্দ্দায় বিপ্লবীদের সেই মিষ্টি-মধুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "বিপদ কি শুধু আমাদের! বিপদ সকলের চেয়ে বেশী তোমারই! কারণ, রাষ্ট্রদ্রোহীকে দিয়েছো আশ্রয়! আমরাও ম'র্‌বো, তুমিও মর্‌বে, তার প্রয়োজন কি ভাই? যখন বাঁচাতেও পার্‌বো না—বাঁচ্‌তেও পার্‌বো না, তখন অহেতুক বিপদ টেনে এনে লাভ কি? তার চেয়ে এই যে পরিচয়—এইটাই কি জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন নয়? তোমরা রইলে

ভেতরে, আমরা রইলাম বাইরে। যদি কোনদিন যোগাযোগের অবসর আসে, সেদিন তোমার উদার হাতখানি বাড়িয়ে দিও, দেশমায়ের প্রকৃত সন্তানের কাজ করাই হবে!"

একটু থেমে যুবক হেসেছিল। সেই হাসিটিও যেন চোখের পাতায় ভেসে উঠ্‌লো। তারপর সেই সুর—সেই মধুমাখা কণ্ঠস্বর—এই ক'দিনে তোমার সব কিছুর পরিচয় পেয়ে গেলাম! সত্যই দরদী মানুষ তুমি! তার ওপর তুমি শিল্পী। দেশকে জাগানোর ভার তোমারই হাতে অর্পণ ক'রে যাচ্ছি ভাই! বিদায়—

কি মিষ্টি মধুর হাসি! শরৎচন্দ্র দেখ্‌লেন—সেই রূপ। যেন উথ্‌লে-ওঠা জীবনের সজীব স্পন্দন—অনুপম আদর্শের দুর্ব্বার আকর্ষণ—ও তার মোহিনীমোহন রূপ! ভাব্‌লেন—হ্যাঁ, একেই বলে জীবন্ত হাসির ছটা! কামনা নেই—বাসনা নেই—শুধু অক্লান্ত কর্ম্মের উদ্দীপনা—আর অফুরন্ত আশার বাণী! পরাজয়ের গ্লানি ম্লান হ'য়ে যায় সেথা—

তন্ময় শরৎচন্দ্র ব'সে ব'সে ভাবেন—এটাই বোধ হয় তাঁর জীবনের পরম সম্পদ্!···

আবার ডাক এলো, বাবুজী!

শরৎচন্দ্রের চমক্ ভাঙ্‌লো। নিজেরই অশিষ্ট আচরণে নিজেই একটু লজ্জিত হ'য়ে প'ড়্‌লেন। ব'ল্‌লেন—ব'লুন!

পরিষ্কার বাংলায় মেয়েটি উত্তর দিল, একটু আশ্রয় চাই—অন্ততঃ এই রাত্রিটুকুর জন্যে!

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, বাসা আমার আছে, কিন্তু সেখানে কোন্ স্ত্রীলোক নেই,—একা কি থাক্‌তে রাজী হবেন?

মেয়েটি হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—কেন পার্‌বো না, বাবুজী? পুলিশের চেয়েও কি আপনি দুর্দ্ধর্ষ?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্র হতবাক্ হ'য়ে প'ড়্‌লেন।

এক অপরিসীম তেজ ও দীপ্তিতে তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে! ব'ল্লেন—বেশ চলুন।

*　　*　　*　　*

মেয়েটির সঙ্গে ছোট একটি ব্যাগ। মেঝের উপর রেখে ব'ল্লো—ছোটখাটো সুন্দর আপনার বাসা! কিন্তু বড় অপরিষ্কার—হেসে উঠে সহানুভূতিপূর্ণস্বরে ব'ল্লো—মেয়ে না থাক্‌লে, পুরুষ জাতটার দুর্দ্দশা এমনিই হ'য়ে থাকে বটে!

শরৎচন্দ্রকে কিছু বলার অবসর না দিয়ে, নিজেই লেগে গেল ঝাড়া-মোছার কাজে।

শরৎচন্দ্র লজ্জিত হ'য়ে প'ড়্লেন। মেয়েটি ব'ল্লো—লজ্জার কিছু নেই বাবু, এটা যে মেয়েদের কাজ!

শরৎচন্দ্র কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়েছিলেন হতবাক্ হ'য়ে, তারপর বেরিয়ে প'ড়্লেন, উড়ে পাণ্ডার সেই ছোট হোটেলটার দিকে।

শরৎচন্দ্র যখন এলেন তখন ঘরটার শ্রী ফুটে উঠেছে। তাঁর খাটের পাশে মেঝের ওপর ছোট একটি শয্যাও রচনা হ'য়ে গেছে। বাতিটা জ্বালিয়ে মেয়েটি ব'সে আছে তাঁরই পথ চেয়ে।

ঠাকুর খাবার দিয়ে চ'লে গেল। শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—এগুলো খেয়ে নিন্।

মেয়েটি হাস্‌লো। ব'ল্লো—আমার জন্যে আপনার চিন্তার অন্ত নেই দেখ্‌ছি! কিন্তু একা ত' খাওয়া মেয়ে-জাতের অভ্যাস নয়, আপনাকেও কিছু ভাগ নিতে হবে!

শরৎচন্দ্র মৃদু আপত্তি তুল্লেন—এইমাত্র খেয়ে আস্‌ছি।!

মেয়েটি হাস্‌লো। ব'ল্লো—তা' হ'লেও একটু ভাগ নিতে হ'বে, নইলে আহারে রুচি আস্‌বে কেন?

অগত্যা শরৎচন্দ্রকে রাজী হ'তে হ'ল। 'মেয়েটি নিজেই একটা কাঁচের প্লেটে কিছু খাবার সাজিয়ে দিলে। তারপর উভয়ে গল্প ক'রতে ক'রতে আহারে ব'সে গেলেন।

মেয়েটি ব'ল্‌লো—আমার নাম সুমিত্রা। অবশ্য এটা আসল নাম নয়, যখন যে দেশে যাই, তখন সেই দেশের একটা নামে পরিচয় দিয়ে থাকি!

শরৎচন্দ্র বিস্ময়বোধ ক'র্‌লেন। সুমিত্রা হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—এ কাজের নীতিই যে এই! নইলে কি আত্মগোপন করা যায়?

শরৎচন্দ্রের কুতূহল বেড়ে গেল। মেয়েটিকে তাঁর রহস্যময়ী ব'লে মনে হ'লো।

মেয়েটি কিন্তু কোনপাশে লক্ষ্য না রেখে, খেতে খেতে নিজের জীবনের কাহিনী ব'লে গেল—কাজটা আমার কোকেনের ব্যবসা। বহুলোক আমার আছে, সারা পূর্ব্ব এশিয়া জুড়ে। নানা দেশের ভাষার সঙ্গে তাই আছে আমার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয়! মেয়েটি একটু থেমে হেসে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো—সমস্ত দেশের পুলিশও আমার পিছুপিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু'একবার ধরাও প'ড়েছি, কিন্তু মুক্তি পেয়েছিও অনায়াসে। তবুও ওদের ভয় করি, কারণ ওরা মানুষ ত' নয়, পশুরও অধম!

একটু থেমে ব'ল্‌লো—আজ সকাল থেকে পুলিশ আমার পিছুপিছু ঘুর্‌ছে, আমিও সারাদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি! আপনাকে দেখে মনে হ'ল এঁর কাছে আশ্রয় মিল্‌লেও মিল্‌তে পারে—এখন দেখ্‌ছি সে অনুমান আমার মিথ্যে হয়নি!

তারপর গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে ব'ল্‌লো—হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছেন কেন? কোন ভয় নেই। মেয়ে হ'লেও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সব সময়েই রাখি। দেখ্‌বেন? ব'লেই তার ব্লাউজের ভেতর থেকে একটা রিভল্‌বার বার ক'রে ব'ল্‌লো, শেষ পর্য্যন্ত এটাই আমার শেষ পাথেয়। তবে মানুষকে বধ ক'র্‌তে কেমন একটা যেন ব্যথা পাই! সহজে ব্যবহার

করি না। যদি দেখি—আপনি বিপন্ন, তখন এই জানালা দিয়েই পালাবো—সে ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছি।

শরৎচন্দ্র সবিস্ময়ে দেখ্‌লেন, সত্যই জান্‌লার গরাদে বাঁধা এক গাছি সনের দড়ি।

শরৎচন্দ্রের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেলো, অদ্ভুত!

সুমিত্রা হেসে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো—একটুও মিথ্যা ব'লেননি! আমার চরিত্র এমনি বিচিত্রই বটে!

*   *   *

হ্যারিকেনের বাতিটা জ্বলছে মিট্‌ মিট্‌ ক'রে। দুইজনেই শয্যার আশ্রয় নিলেন। কিন্তু ঘুম এলো না সহজে। উভয়েই চিন্তামগ্ন। বার বার মিট্‌ মিট্‌ ক'রে চাইছেন উভয়ে উভয়ের দিকে। অথচ কেউ কারও কাছে সহজে ধরা দিতে রাজি নয়। আড়্‌চোখে যখন দেখে, এক জন চেয়ে আছে অপরের দিকে, স্বেচ্ছায় নেয় চোখের পাতাগুলো বুজিয়ে।

এমনি খেলা চ'ল্‌লো বহুক্ষণ। তারপর ধৈর্য্য আর রইলো না এই লুকোচুরি খেলায়। উভয়ের চোখাচোখি হ'য়ে গেল। উভয়েই হেসে উঠ্‌লেন। শরৎচন্দ্র উঠে ব'স্‌লেন। ব'ল্‌লেন, কেন জানি না চোখের পাতাগুলো আজ আর সহজে বুজ্‌তে চাইছে না!

উত্তরে সুমিত্রাও হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—আমারও ঠিক তাই। কিন্তু—সেও উঠে ব'স্‌লো। ব'ল্‌লো—দুর্ব্বলতা কোথায় জানেন?

শরৎচন্দ্র সবিস্ময়ে তা'র মুখের দিকে তাকালেন।

সুমিত্রা ব'ল্‌লো—ভাব্‌ছি—আমরা উভয়েই উভয়ের কথা! একটু টেনে হেসে ব'ল্‌লো—হয়ত ভুল হ'তে পারে—তবে আমি যে আপনার দুর্দ্ধর্ষ সাহসের কথাই ভাব্‌ছি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শরৎচন্দ্র বিস্মিত হ'লেন। ব'ল্‌লেন—আমার কথা ?

সুমিত্রা সহজকণ্ঠে উত্তর দিল—হ্যাঁ! আপনার কথা! বাঙালী ছেলেদের পূর্ব্বেও অনেকবার দেখেছি, কিন্তু এত ঘনিষ্ট মেশার সুযোগ জীবনে পাইনি। তাদের আচার-ব্যবহারে মনের উপর যে রেখা-পাত ক'রেছিল—আজ দেখ্‌লাম সেটা শুধু অনুমান নয়, বর্ণে বর্ণে সত্যও। তাই তো এ জাতটাকে সহজে ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে!

সুমিত্রা একটু থেমে ব'ল্‌লো—বিশ্বাস করুন, এতটুকুও বাড়িয়ে আমি ব'ল্‌ছি না। শুধু আমি একা নই, সারা দুনিয়ার নারী-জাতটাকে যদি এই প্রশ্ন করা যায়—তারাও এই একই উত্তর দিয়ে যাবে। কিন্তু কেন জানেন ?

শরৎচন্দ্র নির্ব্বাক শ্রোতা।

সুমিত্রা ব'লে চ'ল্‌লো—যাকে সারা দুনিয়ার লোক সন্দেহের চোখে দেখ্‌লো,—বিপদে যাকে আশ্রয় দিতে ভয় পেল, তাকেও এরা হাসিমুখে আশ্রয় দেয়—স্বেচ্ছায় অপরের বিপদ নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়। বিস্ময়ে ফেটে পড়ি, আর মনে মনে ভাবি, কি দুর্জ্জয় সাহসের অধিকারীই না এই জাতটা! ওপর থেকে দেখে মনে হয়, এরা অতি ভদ্র, অতি ভীরু প্রকৃতির, কিন্তু যে-ই এদের মুখোমুখী হ'য়েছে, সে-ই দেখেছে, রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতাও এদের অপরিসীম! যার তুলনা সারা বিশ্বে খুব কমই দেখা যায়!

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—এটা তোমার উচ্ছ্বাস, সুমিত্রা!

সুমিত্রা বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—কখনও না। এই যে আধা-অন্ধকার ঘরে পাশাপাশি শুয়ে আছি, আমরা পুরুষ ও প্রকৃতি—তার দুর্জ্জয় আকর্ষণের বেড়াজাল, কত আয়াসে ছিন্ন ক'রে, নিজের সংযমে সংযত হ'য়ে শুয়ে আছেন নির্ব্বিকারে। এটা শুধু ওই জাতটার পক্ষেই সম্ভব!

শরৎচন্দ্র আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন—তুমি অপ্রকৃতস্থ সুমিত্রা। ঘুমোবার চেষ্টা করো।

সুমিত্রা তেমনি মধুর হাসি হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—মিঃ চ্যাটার্জ্জী, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার সমস্ত পরিচয়ই আমি পেয়েছি কিন্তু শুন্‌লে সহসা বিশ্বাস ক'র্‌তে হয়ত পা'র্‌বেন না—এত দৃষ্টি এড়িয়ে আজও আমি স্বচ্ছন্দে বিচরণের অধিকার পেলাম কেমন করে? সকলের মূলে আছে আমার এই রূপ ও যৌবন। যেখানেই আশ্রয় চেয়েছি,—তাদের লোলুপ দৃষ্টি—আমায় প্রতিটি পলে দগ্ধ ক'রেছে,—অনেকে আবার সে সুযোগের সুবিধা গ্রহণে এতটুকুও পিছ-পা হয়নি—এইটাই হ'ল আমার রূঢ় বাস্তবের চরম অভিজ্ঞতার ফসল। প্রথম জীবনে আতঙ্কে অভিভূত হ'য়ে প'ড়্‌তাম—আজ আর ভয় পাই না—খেলে যাই খেলা!

শরৎচন্দ্র হ্যারিকেনের বাতিটা একটু বাড়িয়ে দিলেন।

সুমিত্রা বাধা দিয়ে ব'ল্‌লো—ওটা নিভিয়ে দিন, মিঃ চ্যাটার্জ্জী! এই অন্ধকারই আমাদের ভালো—! একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গায়ের চাদরটা একটু ভাল ক'রে মুড়ি দিয়ে ব'ল্‌লো—যাদের সংযম আছে, আমরা মেয়েজাতটা ভালবাসি তাদেরই। তাই আপনাকে এত সহজে ভালবেসে ফেলেছি মিঃ চ্যাটার্জ্জী! হয়ত এ মিলন আমাদের একটা রাত্রির, জীবনের সীমা-রেখায় হয়ত বা এটা একটা মুহূর্ত্ত, তবুও এ স্মৃতি জীবনে কোনদিন মুছ্‌বে না!

শরৎচন্দ্র আরও কিছু শোনার আশায় চুপ ক'রে শুয়ে রইলেন, কিন্তু সুমিত্রার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

* * *

সুমিত্রার ডাকেই শরৎচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্‌লো। উঠে ব'সে দেখ্‌লেন, সে যাওয়ার জন্যে তৈরী হ'য়ে প'ড়েছে।

শরৎচন্দ্র বাধা দিয়ে ব'ল্‌লেন—এরই মধ্যে যাবে সুমিত্রা!

সুমিত্রা মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লে—অন্ধকার নইলে গা ঢাকা দেওয়া যাবে না মিঃ চ্যাটার্জ্জী!

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, আর একটা দিন তুমি থেকে যাও সুমিত্রা—আমার অনেক কথা তোমায় বলার আছে।

সুমিত্রা ব'ল্‌লো—ত'াতে বিপদ বাড়্‌বে বই ক'ম্‌বে না!

শরৎচন্দ্র উত্তরে হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, তুমি ত নিজেই জানো সুমিত্রা, বাঙালীর ছেলে মৃত্যুকে ভয় করে না!

সুমিত্রা বোঁচ্‌কাটা পিঠ থেকে নামিয়ে ব'ল্‌লো—বেশ, তবে তাই হোক্! কিন্তু একটা কথা আছে—

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, বলো!

বাইরের কোন লোক জান্‌বে না এখানে আমি আছি! একটু হেসে ব'ল্‌লো—ভয় আমার নিজের জন্যে নয় মিঃ চ্যাটার্জ্জী, ভয় শুধু আপনার জন্যে! আমার কাছে সমস্ত ব্যবস্থাই কাছে, আমি নিজের হাতে রান্না ক'র্‌বো এবং আপনাকেও তা' খেতে হ'বে।

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, বেশ তাই হ'বে! কিন্তু এখনও ত' রাত আছে, বিশ্রাম নাও।

বিশ্রাম? সুমিত্রা পুনরায় হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—যারা বন্ধুর পথের যাত্রী, তাদের বিশ্রামরূপী বিলাস জীবনের অঙ্গ নয়, মিঃ চ্যাটার্জ্জী। তৈরী হ'য়ে নিন, চায়ের জল ততক্ষণ বসিয়ে দিচ্ছি!

* * *

সুমিত্রা নিজের হাতে আসন পেতে শরৎচন্দ্রকে খাওয়াতে ব'স্‌লো। শরৎচন্দ্র এক মনে খেয়ে চ'লেছেন। সুমিত্রা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, গম্ভীর যে?

শরৎচন্দ্র মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, এমনি!

সুমিত্রা ব'ল্‌লো, উঁহু—কখনও তা নয়। বরং ভাব্‌ছেন, এই মেয়ে-জাতটা কি? একটা রাতের সম্বন্ধ—তারই মধ্যে এমনি নিবিড় ঘনিষ্ঠতা—সত্যই কি সম্ভব কোনদিন? হেসে উঠে ব'ল্‌লো—সত্যই—সেটা একান্ত সম্ভব মেয়েদেরই পক্ষে!

শরৎচন্দ্র মৌনতা ভেঙে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, কারণ?

সুমিত্রা সহাস্যে উত্তর দিল, মেয়েরা ভালবাসে সেবা করার জন্যে—তাই ত তারা আত্মবিকিয়ে দিতে পারে এত সহজে। কিন্তু পুরুষ ভালবাসে কিসের জন্যে জানেন?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, সেবা পাওয়ার জন্যে নিশ্চয়, নয়?

সুমিত্রা হাসিতে ফেটে প'ড়্‌লো। ব'ল্‌লো, কথাটা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। অবশ্য স্নেহের বিনিময় নইলে, ভালবাসা বাসা বাঁধ্‌তে পারে না কোনদিন!

*　　*　　*

শরৎচন্দ্র অফিস থেকে ফিরে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে প'ড়্‌লেন। সুমিত্রা প্রচুর খাবার আয়োজন ক'রে রেখেছে! জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, এসব পেলে কোথায়?

সুমিত্রা মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো, মেয়েদের সাধ্যের অতীত কোন্ বস্তুটা ব'লুন ত'?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, কিন্তু তুমি যে—

সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রা মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো—দায় প'ড়েছে! ভালবাসার জন্যে জেলখাটা? অতখানি পাগোল এখনও হইনে গো! গাম্ভীর্য্য তার শেষ পর্য্যন্ত টিক্‌লো না। হাসিতে ফেটে প'ড়্‌লো। ব'ল্‌লো, বারণ ত' ক'রেছিলাম—কিন্তু মানা কি শুনেছেন? আপনার প্রিয় সেই পাণ্ডা-ঠাকুর এসেছিল খোঁজ নিতে, সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ে দেখে নিলাম সে

আপনার চর না বহুরূপী পুলিশের টুক্‌রো উলুখড় ? দেখ্‌লাম, লোকটা সত্যই নিরীহ। যা' আদেশ ক'র্‌লাম একান্ত অনুগতের মত পৌঁছে দিয়ে গেল নির্ব্বিবাদে।—যাক্—এখন হাতমুখ ধুয়ে ব'সে যান! চায়ের জল তৈরী!

শরৎচন্দ্র নির্ব্বিকার চিত্তে ব'সে প'ড়্‌লেন। ব'ল্‌লেন, একার জন্যে এতো ? তোমার কই ?

সুমিত্রা ব'ল্‌লো, মেয়েদের স্বার্থত্যাগের একটা সীমা থাকে, মিঃ চ্যাটার্জ্জী! সবটুকু শেষ ক'রে দিলে তাদের দিন চ'ল্‌বে কেমন ক'রে ? আর কি একটা ব'ল্‌লেন—কেন ? সেটা তাদের স্বভাব। চুপ্‌চাপ্‌ত তারা ব'সে থাক্‌তে পারে না!

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন না। উত্তরে শুধু মৃদু হাস্‌লেন। মুখের খাবারগুলো শেষ ক'রে ব'ল্‌লেন, সে কথাটা কিন্তু আমিও মানি!

চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে সুমিত্রা ব'ল্‌লো—মানেন ত ভালই! লক্ষ্য রাখ্‌বেন চা'টা যেন আবার জুড়িয়ে না জল হ'য়ে যায়!···

* * *

সন্ধ্যা থেকেই ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। বাইরে যাওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। শরৎচন্দ্র ইজিচেয়ারটায় ব'সে সাইকোলজির বই নিয়ে নাড়াচাড়া ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। সুমিত্রা পাশে ব'সে, ষ্টোভ জ্বেলে রাতের খাবার তৈরী ক'র্‌তে ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যাওয়ার পর সুমিত্রা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, প্রয়োজন কি, তা'তো ব'ল্‌লেন না ?

শরৎচন্দ্র মুখ তুলে চাইলেন। ব'ল্‌লেন, ঠিক সময় এখনও আসেনি, এলেই ব'ল্‌বো!

সুমিত্রা ব'ল্‌লো, অত ধৈর্য্য আমার নেই!

শরৎচন্দ্র বিস্ময় প্রকাশে ব'ল্‌লেন—আমি ত' দেখ্‌ছি তুমি একটা ধৈর্য্যের পাহাড়! নইলে একদিনের আশ্রয়ের জন্যে এসে, এ গৃহস্থালী পাত্‌তে গেলে কোন্ দুঃখে?

সুমিত্রা হাস্‌লো। ব'ল্‌লো, ওটা এ জাতের প্রকৃতি। কিন্তু সত্যই আমি অধৈর্য্য হ'য়ে প'ড়েছি আপনার ব্যবহারে।

কারণ? শরৎচন্দ্র সকৌতুক হাসি হাস্‌লেন।

সুমিত্রাও হাস্‌লো। ব'ল্‌লো, একার চুপ্‌চাপ না থেকে যে উপায়ই নেই, কিন্তু পাশাপাশি ব'সেও নীরব থাকা কোনদিন সম্ভব নয়!

শরৎচন্দ্র এবার বইখানা নামিয়ে টেবিলের ওপর রাখ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, বেশ ত' তোমার দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতার কাহিনী দু'চারটে ব'লো—আমি শুনি!

সুমিত্রা ব'ল্‌লো—অভিজ্ঞতা ত' ছাই! শুধু পুলিশের তাড়া আর প্রাণভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো—তাতে কি কোন কিছু ভাল ক'রে দেখার অবসর মানুষ পায়?

তবে এ কাজ করো কেন?

কেন? সুমিত্রা হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—মাঝে মাঝে আমার মনেও এ প্রশ্ন জাগে বটে, কিন্তু সঠিক উত্তর আজও খুঁজে পাইনে! হয় ত' পিছনে বাঁধন নেই ব'লেই এ কাজ করি—নয়ত এটা একটা স্বভাবে পরিণত হ'য়ে গেছে, স্থির হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে পারি না। ছুটে ছুটে এদেশ ওদেশ করি, লুকোচুরি খেলে এই জীবনটার বহুমূল্য সময় অপব্যয় করি। যেদিন সমস্ত শক্তি-সামর্থ যাবে নিঃশেষ হ'য়ে, সেদিন হয় ত' পাঁচ জনের মতই অনুতাপ ক'র্‌বো। কিন্তু—এখন ত' তার মধ্যে আনন্দ পাই!

শরৎচন্দ্র সহসা উত্তর দিতে পার্‌লেন না। বুঝ্‌লেন, এর মধ্যে আছে অনন্ত ক্ষুধা, কিন্তু সে-তৃপ্তি সাধনের সঙ্গী সে পায় না, তাই ত'

সৃষ্টি হ'ল তার এই বৈরাগ্য জীবনের বিচিত্র ইতিহাস! ব'ল্লেন—ঘর বাঁধ্‌তে তোমার ভাল লাগে না?

সুমিত্রা হাস্‌লো। ব'ল্লো—মাঝে মাঝে সাধ যে হয় না—এ কথা ব'ল্লে ভুল হ'বে মিঃ চ্যাটার্জ্জী, কিন্তু সে সাধ পূরণের সাথীই বা পাবো কোথায়? ক'র্‌বেন, সাথী?

সুমিত্রা নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠ্‌লো। ব'ল্লো—রান্না ত' হ'ল শেষ, খাবেন নাকি গরম গরম?

শরৎচন্দ্র ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চম্‌কে উঠ্‌লেন। রাত প্রায় দশটা। সময়টা কখন কোন্‌খান দিয়ে যে ব'য়ে গেল, তা' অনুভবের অবকাশ তিনি পান্‌নি এতক্ষণ। ব'ল্লেন—বেশ ত, শুভস্য শীঘ্রং।

সুমিত্রা হাসিমুখে উঠে গেল পাশের সেই ছোট বারান্দায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো ঝড় ও জলের খেলা।

* * *

আহার শেষ ক'রে উভয়েই শয্যার আশ্রয় নিলেন। সুমিত্রার কোন সাড়া নেই। শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—ঘুমিয়ে প'ড়্‌লে নাকি?

সুমিত্রা ব'ল্লো—না!

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—একটা কথা বহুক্ষণ ধ'রে ব'ল্‌বো ব'ল্‌বো ভাব্‌ছি কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছে না।

সুমিত্রা মুখ ফিরে শুলো। ব'ল্লো—স্বচ্ছন্দে ব'ল্‌তে পারেন!

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—তোমাকে দেখে আমার কি মনে হয় জানো?

সুমিত্রা তাড়া দিয়ে উঠ্‌লো—ভূমিকা নয়-চট্‌পট্‌ শেষ করুন। ঘুমে চোখের পাতাগুলো আমার জড়িয়ে আস্‌ছে।

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—তোমাকে খুব বুদ্ধিমতি ব'লেই আমার দৃঢ় ধারণা

জন্মেছে। তাই ব'ল্‌ছিলাম—উড়ো পাখীর মত এদেশ ওদেশ না ক'রে একটু মেয়ে-জাতটার উপকার করো না কেন!

সুমিত্রা হেসে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো—তারপর?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—সত্যই ঠাট্টা ক'র্‌ছিনা, সুমিত্রা! এ দেশের মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আমার চোখের পাতাগুলো ঝাপ্‌সা হ'য়ে ওঠে।—করো না, তাদের একটু উপকার!

সুমিত্রা ব'ল্‌লো—এ ইচ্ছা যে আমার হয় না তা নয়, মিঃ চ্যাটার্জ্জী! কিন্তু এ ইচ্ছার আমার মূল্য কে দেবে বলুন ত? আমার পরিচয়?—একটু থেমে টেনে হাসি ফুটিয়ে ব'ল্‌লো—কেউ জানে আমি আজন্ম বিপ্লবী, কেউ জানে আমি ভ্রষ্টা—আবার কেউ জানে আমি কোকেন ব্যবসায়ীদের দালাল। তাদের ধারণাটা ত' এতটুকুও মিথ্যা নয়—

শরৎচন্দ্র বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—ও সব বাজে কথা ছাড়ো সুমিত্রা! তোমায় আমি ভাল ক'রেই চিনেছি। তোমার মধ্যে আগুন আছে, তাকে নিয়ে খেলা ক'রে মিথ্যেই নিজেকে অঙ্গার ক'রে তুলছো—তার চেয়ে আমার কথা শোন। ওটা পাঁচজনের কাজে লাগাও—পাঁচটা মানুষ, সত্যকার মানুষ হ'য়ে ওঠার অবকাশ পাক্!

সুমিত্রা বাধা দিল না—জবাবও দিল না। শুধু শোনা গেল তার বক্ষ-বিদীর্ণকারী চাপা দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণ অস্পষ্ট একটি শব্দ।

* * *

মাঝরাতে হঠাৎ শরৎচন্দ্রের ঘুম ভেঙে গেল! অনুভব ক'র্‌লেন, কা'র কোমল হাতের শীতল পরশ। চোখ খুলে চাইতেই দেখ্‌লেন, সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে সুমিত্রা! মুখে ফুটে আছে শান্ত-ধীর ছোট একটু হাসি।

শরৎচন্দ্র হ্যারিকেনের বাতিটা বাড়িয়ে, উঠে ব'সলেন। সবিস্ময়ে চেয়ে দেখ্‌লেন, সুমিত্রাকে সহসা চেনার কোন উপায়ই আর নেই।

তার চোখমুখ ব্যতীরেকে সবটাই কাল পোষাকে ঢাকা। এক হাতে সেই ছোট ব্যাগ, অপর হাতে খাঁকি রঙের ভাঁজ করা একটি বর্ষাতি। ব'ল্‌লো, তা'হলে—আজকের মত বিদায়, মিঃ চ্যাটার্জ্জী!

বাইরে তখনও ঝড় ও বৃষ্টির দাপাদাপি চ'ল্‌ছে সমান তালে। শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, এরমধ্যে তুমি যাবে কেমন ক'রে সুমিত্রা?

সুমিত্রা মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো, যেতেও ত আমার এতটুকু ইচ্ছা হ'চ্ছে না, মিঃ চ্যাটার্জ্জী।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, তবে?

সুমিত্রা একটু ম্লান হাসি হাস্‌লো। ব'ল্‌লো, হাতে যে আমার কাজ বাকী আছে, মিঃ চ্যাটার্জ্জী!

শরৎচন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন তুল্‌লেন, আমাদের আবার কি কোনদিন দেখা হবে?

সুমিত্রার চোখের পাতাগুলো সজল হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো, সেই আশা নিয়েই ত' যাচ্ছি, মিঃ চ্যাটার্জ্জী! যদি বেঁচে থাকি, এবং আপনিও থাকেন এখানে, আমাদের পরস্পরের দেখা একদিন না একদিন হ'বেই হ'বে!

শরৎচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। সুমিত্রা নতজানু হ'য়ে, তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে, খাড়া হ'য়ে দাঁড়ালো। শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, বাইরে যে খুব জোর জলঝড় হ'চ্ছে, সুমিত্রা!

সুমিত্রা হাস্‌লো। ব'ল্‌লো, বেশ ত' নিজের হাতেই পরিয়ে দিন্ এই বর্ষাতিটা।

শরৎচন্দ্র পরিয়ে দিলেন নিজের খুশীমত।

সুমিত্রা ব'ল্‌লো, আর কোন ভয় নেই মিঃ চ্যাটার্জ্জী! সঙ্গে রইলো আপনার অভয় আশীর্ব্বাদ—আচ্ছা, বিদায়! কণ্ঠস্বরটা তার কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কেঁপে উঠ্‌লো! পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সবল ক'রে নিয়ে চোখের পলকে জান্‌লার সেই দড়ি ধ'রে ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌লো সুমিত্রা।

শরৎচন্দ্র সুমিত্রাকে বিদায় দিতে সত্যই ব্যথিত হ'য়ে উঠেছিলেন কিন্তু তাকে বাধা দেওয়ার মত শক্তিও তাঁর ছিল না। সে যেন বন্যার দুর্জ্জয় আবেগ ও উচ্ছ্বাস, তাকে বাধা দিতে যাওয়াই মূর্খতা। পথ সে খুঁজে নেবেই, দু'দিন আগেই হোক্ বা পরেই হোক্, কিন্তু যেদিন সে যাবে সেদিন সে অপরকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিয়ে যাবে। তার চেয়ে এই হ'ল ভাল!

তবুও শান্ত হ'তে পারলেন না তিনি। টর্চটা জ্বালিয়ে তাকে একবার শেষ দেখার চেষ্টা ক'রলেন। সুমিত্রাও একটা কিসের আর্কর্ষণে নির্ভয়ে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে সহসা থম্‌কে দাঁড়ালো। মুখ ফিরে তাকিয়ে হাতটা তুলে মৃদু দোলালো! চোখাচোখি হ'ল পরস্পরের মধ্যে। মনে হ'ল তারও চোখে জল।—কিন্তু সেটা চোখের ভ্রম, না বাইরের জলের ছাট্ ঠিক্ বোঝা গেল না।

মানুষ মাত্রেরই দুর্ব্বলতা আছে। এ দুর্ব্বলতাও তা'র কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য! দুর্গম পথের যাত্রী সে,— অপেক্ষার অবসর তা'র জীবনে নেই, চল্‌লো তেমনি নীরবে এগিয়ে। শরৎচন্দ্র কাঠ হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন তা'র গমনপথের দিকে।

* * *

মনটা শরৎচন্দ্রের সত্যই ভাল ছিল না। কোন রকমে অফিসের কাজটা সেরে বাসায় ফিরে এলেন। কিন্তু সে মন্দিরের আকর্ষণ গেছে একান্তে নিঃশেষ হ'য়ে,—আর তারই বেদনায় বুকের পাঁজরাগুলো ব্যথায় যেন বার্ বার্ টন্ টন্ ক'রে ওঠে! তিনি বেরিয়ে প'ড়্‌লেন ইরাবতীর সেই নির্জ্জন তীরের দিকে।

সহসা জাহাজের ভেঁা বেজে উঠ্‌লো। মুখ তুলে তাকাতেই, কমলার সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেল। ডেকের ওপর চোখ্ প'ড়্‌লো। দেখ্‌লেন দাঁড়িয়ে বিজলী! মাথার টুপিটা হাতের মুঠির মধ্যে ধ'রে বার্ বার্

দোলাচ্ছে। বুঝ্‌লেন, সে চ'লেছে বিদেশে, হয়ত কোন কাজের সন্ধানে, আর কমলা এসেছে তাকে "সী অফ্" ক'র্‌তে। কমলা নাড়াচ্ছে রুমাল—বিজলী দোলাচ্ছে টুপী, আর জাহাজটা যাচ্ছে ধীরে ধীরে এগিয়ে।

যতদূর দেখা যায় রেলিং-এ হেলান্ দিয়ে কমলা তাকিয়ে রইলো সেই জাহাজটার দিকে। শেষে জাহাজটাকে আর দেখা গেল না, কমলা মুখ ফিরে তাকালো। চোখে তার জল।

শরৎচন্দ্র তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন আর ভাবেন, জীবনের যাত্রাপথের বিচিত্র ধারাই বোধ হয় এই! কেউ পুলকে হাসে, কারও বা ব্যথায় গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে প'ড়ে কয়েক ফোঁটা উষ্ণ চোখের জল। অথচ এর মূল্য যাচাই ক'রে দেখার অবসর জীবনে কেউই হয়ত পায় না—পেলেও, তলিয়েও দেখে না কেউ।

দূরে কোন বৈরাগীর কণ্ঠস্বর ভেসে আস্‌ছে, "নদীর কুলে বাস ক'রে হায়, ভাস্‌লি কেন চোখের জলে… … …"

শরৎচন্দ্র আন্‌মনা হ'য়ে প'ড়্‌লেন। সুরটাও ধীরে ধীরে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

কমলা কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তিনি লক্ষ্যই করেননি। হঠাৎ চুড়ির টিন্-টিন্ ঝিন্-ঝিন্ শব্দে সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। সেদিনও ঠিক্ এইখানেই সুমিত্রার সঙ্গে তাঁর আলাপ হ'য়েছিল। মনে হ'ল সেই বুঝি ফিরে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পাশে! চোখ্ তুলে চাইলেন। সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কমলা। তখনও সে নিজেকে খাঁড়া ক'রে তুল্‌তে পারেনি। আঁচলের খুঁটে চোখের পাতাগুলো বার বার চ'লেছে মুছে।

শরৎচন্দ্র নির্ব্বাকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কমলা নিজেকে সংযত করার উদ্দেশে ব'ল্‌লো—লোকে কত যায়, কত আসে: কই তাদের জন্যে ত মন্‌টা এত বেদনায় মুষ্‌ড়ে পড়ে না, দাদা?

শরৎচন্দ্র মৌনতা ভেঙ্গে ব'ল্‌লেন, পুরুষ মানুষের চুপ্‌চাপ্‌ ব'সে থাকা কি পোষায় দিদি? তা'তে তাদের মন-মেজাজ বিকল হ'য়ে ওঠে। তার চেয়ে খাটুক্‌ না একটু, যদি মন তাঁর চেয়ে থাকে।

কমলা ব'ল্‌লো—আমার মনটা কিন্তু বার বার ব'ল্‌ছে, ও আমায় ঠকিয়েই পালালো—ফিরে আর আস্‌বে না কোনদিন!

শরৎচন্দ্র তাকে বোঝাতে চেষ্টা ক'র্‌লেন, তা কি হয়? ছেলেপিলে যখন ছেড়ে যাচ্ছে, তখন ফির্‌বে বইকি, দিদি!

কমলা ম্লান হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—তোমাদের পুরুষজাতটাকে আজও ঠিক্‌ বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না, দাদা। ওদের মন যে কোথায় ভেসে বেড়ায়, কে জানে?

শরৎচন্দ্র উত্তর খুঁজে পেলেন না। নীরবে রইলেন দাঁড়িয়ে। কমলা ব'ল্‌লো, সন্ধ্যা হ'য়ে এলো—আমায় একটু এগিয়ে দেবেন চ'লুন না, দাদা! জানেন্‌ ত পাড়াটা আমার মোটেই স্নবিধে গোছের নয়—তা'ছাড়া সত্যই আমি আজ বড় দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছি।

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, সেই বরং ভালো—তোমায় একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

শরৎচন্দ্র এগিয়ে চ'ল্‌লেন। কমলা তাঁর বাহুখানা চেপে ধ'রে, ধীর পদক্ষেপে তাঁকেই অনুসরণ ক'র্‌তে লাগ্‌লো

* * * *

কমলা সত্যই এত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছিল যে, শরৎচন্দ্রকে সহসা ছাড়্‌তে চাইলো না। নিজের হাতে চা ক'রে খাওয়ালো। ব'ললো, যা' সম্বল ছিল, সবই ত তুলে দিলাম—আসা, না আসা তার নিজেরই উপর নির্ভর করে, দাদা! আমি ত তাঁকে অবিশ্বাস করিনি।

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন, বিশ্বাসের মূল্য আছে বইকি দিদি! তুমি মোটেই ভেবো না, সে নিশ্চয় ফিরে আস্‌বে!

কমলা ব'ল্লো—আমারও বিশ্বাস তাই। কিন্তু পাঁচজনে যা' তা' বলে, তাই ত ভয় হয়, যদি সত্যই না ফেরে?

শরৎচন্দ্র আশ্বাস দিলেন, তাকি হয়। হাজার হোক্, রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষ ত বটে!

কমলা জোর্ দিয়ে ব'ল্লো—আমিও ঠিক্ তাই বলি! তা ছাড়া সে সত্যই কোনদিন অসুখী আমায় করেনি।

ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে আটটা বেজে উঠ্‌লো। শরৎচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। ব'ল্লেন—তা' হ'লে আজ উঠি, দিদি!

কমলা সদররাস্তা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। ব'ল্লো, সাব্‌ধানে যেয়ো দাদা—রাস্তাটা কিন্তু সুবিধে গোছের নয়।

শরৎচন্দ্র অভয়-হাসি হাস্‌লেন। ব'ল্লেন,—কোন ভয় নেই দিদি!

কমলা হাত দুলিয়ে বিদায় অভিনন্দন জানালো। ব'ল্লো—মাঝে মাঝে আস্‌বে ত দাদা?

মাথা দুলিয়ে শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন, আস্‌বো বই কি! সময় পেলেই আস্‌বো।

* * *

পথেই মালতীর বাসা প'ড়্‌লো। বহুদিন তার কোন খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। ভাব্‌লেন, বুড়ি ছুঁয়েই যাওয়া যাক্—কারও অভিযোগের কিছু থাক্‌বে না!

একটু এগিয়ে কড়াটা নাড়ালেন। মালতী দরজা খুলে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো—ব'ল্লো, বোন্‌কে তা' হ'লে মনে প'ড়েছে দাদার!

সহাস্যে শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন, মনে ছিল বইকি বোন, কিন্তু কাছে

আসার সময় ঠিক মত পাইনে। তারপর তোমার খবর কি? মুখ্খানা যে শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে?

মালতী ব'ল্লো, আজ যে একাদশী! বামুনের ছেলে হ'য়ে সে খবরও বুঝি রাখোনি?

শরৎচন্দ্র মৃদু হাস্লেন। ব'ল্লেন—না দিদি! প্রয়োজন যখন নেই, তখন মিথ্যে মাথা ঘামিয়েই বা লাভ কি?

মালতী ব'ল্লো—তা না হয় হ'ল, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'স্বে চলো।

শরৎচন্দ্র মৃদু আপত্তি তুল্লেন, অন্য একদিন বরং আস্বো. আজ অনেক রাত হ'য়ে গেছে বোন্।

মালতী পথ রুখে দাঁড়ালো। ব'ল্লো, তা হয় না দাদা! বোনের কাছে এসে শুধুমুখে ফিরে যেতে নেই, বোনের অকল্যাণ হয়। চলো ব'স্বে!—

শরৎচন্দ্র মালতীর পিছু পিছু উঠানের উপর পাতা আসনটায় চেপে ব'স্লেন। ব'ল্লেন, কি খাওয়াবে মালতী?

মালতী ঘরের ভেতর থেকে উত্তর দিল—গরীব বোনের যা' আছে—তাই খাওয়াবো। পরমুহূর্ত্তে হাসিমুখে বেরিয়ে এলো—এক হাতে তার বোঁটি, অপর হাতে গোটা দুই পেঁপে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সেগুলি ছাড়িয়ে সাম্নে ধ'র্লো। ব'ল্লো, একটিও ফেল্লে চ'ল্বে না কিন্তু পূর্ব্বেই তা ব'লে রাখ্ছি!

শরৎচন্দ্র কয়েকখণ্ড মুখে তুলে ব'ল্লেন—তা' না হয় হ'ল, কিন্তু তোমার রইলো কোথায় মালতী?

মেয়েমানুষের খাওয়া? মালতী হেসে উঠ্লো। ব'ল্লো—ওদের কথা আর ব'লো না দাদা—সহজে মরণ ওদের হয় না!—তার ওপর একাদশী। সৎ ব্রাহ্মণের ছেলেকে খাইয়ে লাভটা আমার কত জানো?

শরৎচন্দ্র হেসে উঠ্‌লেন। মাথা দুলিয়ে ব'ল্‌লেন,—অক্ষয় স্বর্গ!

মালতী হাসি চাপার ব্যর্থ চেষ্টা ক'র্‌লো। ব'ল্‌লো,—যাও, ঠাট্টা ক'রো না! অবশ্য আশা যে নেই—তা' ব'ল্‌ছি না—তবে ভরসা কুলোয় না—এই যা!

মালতী উঠে গেল। সে জানতো শরৎচন্দ্রের প্রিয় বস্তুটি কি? কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে হুঁকোটি বাড়িয়ে দিল।

শরৎচন্দ্র খুশী হ'য়ে উঠ্‌লেন। নিশ্চিন্ত মনে বারকয়েক টান্ দিলেন। মালতী উচ্ছিষ্ট পাত্রটি সরিয়ে রেখে ফিরে এলো। ব'ল্‌লো—এত রাতে আবার বাসায় ফির্‌বে নাকি?

হঁ্যা!—শরৎচন্দ্র সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন।

মালতী ব'ল্‌লো—দিনকাল বড় খারাপ—

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—ভয় দেখাচ্ছো বুঝি!

মালতী ব'ল্‌লো—তোমায় ভয় দেখানোর মত শক্তি কি আমার আছে, দাদা? সেদিন সন্ধ্যা-রাতে একটা খুন হ'য়ে গেল—তাই তো ভয় হয়! তোমার ত আবার প্রাণের মায়া ব'লে কিছু নেই!

শরৎচন্দ্র হুঁকোটি নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। মালতী একেবারে পাশে এসে দাঁড়ালো। ব'ল্‌লো—আজ কি না গেলেই নয়, দাদা?

শরৎচন্দ্র তার মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—কেন বলতো, দিদি?

মালতী ব'ল্‌লো—তুমি বামুনের ছেলে—হয় ত' একটু কষ্টও হবে। তাই ব'লছিলাম, যদি সব যোগাড় ক'রে দিই—বিশেষ তেমন কিছু ত কষ্ট হ'বে না! আজ নেই বা গেলে—এই অন্ধকার পথে—

শরৎচন্দ্র তাঁর ভয়ের কারণটা ঠিক বুঝ্‌তে না পার্‌লেও অনুমান ক'রে নিলেন—মমতাময়ী মালতীর এই কাতরতা প্রকাশ—তার প্রকৃতির সহজাত একটি অঙ্গ। সাহস দিয়ে ব'ললেন—ভয় কি মালতী?

মালতী বাধা দিল না। ব'ল্লো—তুমি যে নিরাপদে পৌঁচেছো, আমি খবর পাবো কেমন ক'রে ?

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—সকালেই খবর পাবে। শুধু তাই নয় মালতী, তোমার যে সঙ্কোচ—আজ আমি দেখে গেলাম, সেটা মুছে দেওয়ার আবশ্যকতা বোধ ক'র্‌ছি ! তুমি তৈরী থেকো। কাল এখানে খেয়ে অফিস ক'র্‌বো আমি। শরৎচন্দ্র আর দাঁড়ালেন না—হন্ হন্ ক'রে বেরিয়ে প'ড়্‌লেন পথে।

* * *

বেলা প্রায় ন'টা। বাইরের কড়াটা ন'ড়ে উঠ্‌লো। মালতী শরৎচন্দ্রের কথাটা রহস্য ব'লেই ভেবে নিয়েছিল। তবুও তৈরীই হ'য়েছিল, বলা ত' যায় না—যদি সত্যই এসে হাজির হ'ন !

দরজাটা খুল্‌তেই মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়ালেন শরৎচন্দ্র। স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ হাসি হেসে ব'ল্লেন—আর তোমার ভয় নেই বোন্, সশরীরে হাজির হ'য়েছি ! কিন্তু সময় খুব অল্প—তাড়াতাড়ি দাও। অফিস যেতে হবে এখুনি।

মালতী ইতস্ততঃ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। ব'ল্লো, সত্যই তুমি খাবে ?

শরৎচন্দ্র সহাস্যে উত্তর দিলেন, মিথ্যে তো তোমায় বলিনে, দিদি !

মালতী আর দ্বিতীয় প্রশ্ন ক'র্‌লো না। আসন ক'রে বসিয়ে ব'ল্লো, জীবনে অনেক ত পাপ ক'রেছি,—সবটা কি সহ্য হ'বে ?

শরৎচন্দ্র তাগিদ্ দিয়ে ব'ল্লেন—খুব হ'বে দিদি ! পাপ-পুণ্য দু'টোই এ পৃথিবীর অলঙ্কার—আসলে কিন্তু ওর কোন রূপের বালাই নেই—শুধু মনের সংস্কার।—জল্‌দি দিদি—হাতে মাত্র পঁচিশ মিনিট !

মালতী তবুও সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লো না। ব'ললো—কিন্তু—

শরৎচন্দ্র কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ ক'র্‌লেন—এখন মাথায় তোলা থাক্—যা' যা' রেঁধেছো—নিয়ে এসো—শিগ্‌গীর।

মালতী সসঙ্কোচে খাবারের থালাটা সাম্‌নে ধ'রে একটু পাশে মেঝের উপর চেপে ব'সে পাখার বাতাস ক'র্‌তে লাগ্‌লো। শরৎচন্দ্র মুখে বারকয়েক তুলেই প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন—চমৎকার রেঁধেছো মালতী! সত্যি ব'ল্‌ছি, মা মারা যাওয়ার পর এমন মধুর জিনিষ ভাগ্যে আর জোটেনি অনেক দিন।

* * *

কমলা ও তার সপত্নী কয়েকটি শিশুসন্তানকে ফেলে বিজলী ব্যবসার উদ্দেশে ক'ল্‌কাতায় সেই যে পাড়ি দিলে—বহুদিন আর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। শেষ পর্য্যন্ত কমলার অনুমানটিই হ'ল সত্য। নিরূপায় কমলাকেই নাম্‌তে হ'ল জীবিকা উপার্জ্জনের পথে। তার এই বন্ধুর পথের পরম আত্মীয় হ'লেন শরৎচন্দ্র। তিনিই বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে কাজ সংগ্রহ ক'রে এনে দিতে লাগ্‌লেন। কমলা দিন-রাত পরিশ্রম ক'রে, সেগুলো সেলাই ক'রে রাখ্‌তো। তা'তে তার যে আয় হ'তো—নিজেকে উপবাসী রেখে, শিশুদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দতার ব্যবস্থা ক'র্‌তো সে হাসিমুখে, কখনও বিরক্তি প্রকাশ ক'র্‌তো না।

শরৎচন্দ্র তার ব্যবহারে শুধু মুগ্ধ হ'লেন না, তার কর্ত্তব্যজ্ঞানকে শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তে সুরু ক'র্‌লেন।

* * *

সেদিন একটু রাত ক'রেই কমলার বাসা থেকে ফির্‌ছেন—হঠাৎ দেখ্‌লেন, কে যেন গাছের আড়ালে আত্ম-গোপনের চেষ্টা ক'র্‌ছে। শরৎচন্দ্রের কুতূহল বাড়লো। কে এই ব্যক্তি? তার সন্ধানে তিনি

নিজেও প্রবৃত্ত হ'লেন। যত ঘোরেন, সেও তত ঘোরে। শেষে ধরা প'ড়লো চোর। সে আর কেউ নয়,—মালতী। তার সাজ-সজ্জা ও বেশ-ভূষায় শরৎচন্দ্র বিস্ময় বোধ ক'র্লেন। জিজ্ঞাসা ক'র্লেন, হঠাৎ তোমার এ পরিবর্ত্তন কবে হ'ল মালতী?

মালতী উত্তর দিল না। মাথা নীচু ক'রে রইলো দাঁড়িয়ে।

শরৎচন্দ্র কয়েক মিনিট তার উত্তরের আশায় নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু অপর পক্ষ থেকে কোন উত্তর না পাওয়ায় তিনি সোজা পথ ধ'র্লেন।

মালতী খপ্ ক'রে তাঁর হাতখানা চেপে ধ'র্লো। কয়েক ফোঁটা অশ্রুও তাঁর হাতের উপর গড়িয়ে প'ড়্লো। ভাঙা ভাঙা স্বরে ব'ল্লো—জানি, কোনদিন আর আমায় তুমি বিশ্বাস ক'র্তে পার্বে না—তবুও একটা অনুরোধ ক'র্বো—রাখ্বে বামুনদা'?

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—কাউকে ত আমি অবিশ্বাস করিনে, মালতী!

মালতী অনুরুদ্ধ কণ্ঠে ব'লে উঠ্লো—তা'হলে—একটিবার বাসায় আমার এসো না বামুনদা'?

চেষ্টার ত্রুটি হ'বে না মালতী! শরৎচন্দ্র অন্ধকার পথে এগিয়ে চ'ল্লেন। মালতী তেমনি কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

* * *

অফিসের ছুটির পর হাতে কাজ না থাকায় তিনি সোজা মালতীর বাসায় গিয়ে উঠ্লেন। মালতী তৈরীই হ'য়েছিল। আসন পেতে ব'ল্লো, ব'স্বে না, বামুনদা?

শরৎচন্দ্র মৃদু হাস্লেন, ব'ল্লেন, মানুষ ত অশুচি নয় বোন্—অশুচি তার মন। তারপর ডেকেছিলে কেন, মালতী?

মালতী কয়েক মিনিট মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইলো। তারপর ব'ল্‌লো, নিজের চোখে যা' দেখেছো তারপরও কি বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌বে, বামুনদা?

শরৎচন্দ্র সহাস্যে উত্তর দিলেন, এখনও ত অবিশ্বাসের পরিচয় কিছু পাইনি!

মালতী আর নিজেকে সাম্‌লাতে পার্‌লো না। একেবারে তাঁর পায়ে গড়িয়ে প'ড়্‌লো। ফোঁপাতে ফোঁপাতে ব'ল্‌লো, ভেবেছিলাম, ও পথ— জীবনে আর মাড়াবো না কোনদিন—কিন্তু একা তুমি ছাড়া আর আমায় কেউ বিশ্বাস ক'রেনি। একটু থেমে ব'ল্‌লো—তুমি ত' জানো দা'-ঠাকুর, মানুষের জীবনের বুভুক্ষা কত? অথচ বেঁচে থাকার মত সম্বলও যে আমার নেই! যদি বেঁচে থাক্‌তেই হয়, এ দেহ বিক্রয় ছাড়া ত' বাঁচার দ্বিতীয় পথ খোলা নেই! বিশ্বাস তুমি ক'র্‌বে ব'লেই তোমার কাছে সব কথাই আজ খুলে ব'ল্‌ছি আমি। একটু থেমে ব'ল্‌লো, এ কথাটাই সত্য—জীবনে যাকে ভালবেসেছিলাম মনপ্রাণ দিয়ে, তাকে ভুল্‌তে আমি পার্‌বো না কোনদিন! কিন্তু বেঁচে থাক্‌তে ত' আমায় হবেই! ব'লো—অন্যায় কি ক'রেছি আমি?

শরৎচন্দ্রের চোখের পাতাগুলো সজল হ'য়ে উঠ্‌লো। অন্তর দিয়ে অনুভব ক'র্‌লেন, কত দুঃখে সে আত্মবিক্রয় ক'র্‌লো—অথচ এ ছাড়াও বেঁচে থাকার অন্য পথও আজ আর তার মুক্ত নেই! গভীর মমতায় অন্তরটা তাঁর দুলে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লেন—তোমার আমার পথ এক নয় মালতী, তবুও তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে এবং সেইটুকু নিয়েই আমি ফিরে যাচ্ছি। যদি কোনদিন, কোন প্রয়োজন বোধ করো, সঙ্কোচহীন চিত্তে ডাক দিও—পাশে এসে দাঁড়াতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ আমি ক'র্‌বো না।

শরৎচন্দ্র আর একটি মুহূর্ত্তও অপেক্ষা ক'র্‌লেন না, পথে এসে দাঁড়ালেন।

মালতী সেইখানে তেমনিভাবেই প'ড়ে প'ড়ে ফোঁপাতে লাগ্‌লো—আমায় তুমি ভুল বুঝো না দাদা, এ ছাড়া যে সত্যই বাঁচার পথ আমাদের নেই। নিজেকে বাঁচানোর কত চেষ্টাই না ক'র্‌লাম—তবুও তারা বিশ্বাস ক'র্‌লো না কোনমতে। বলো, তুমিই ব'লো—রক্তমাংসে গড়া মানুষ হ'য়ে কি এত ঘৃণা, এত অবহেলা সহ্য করা যায়?

* * *

কমলা অক্লান্ত সেবা ও যত্নে সপত্নী ছেলেমেয়েদের মানুষ ক'রে তুল্‌তে লাগ্‌লো। শরৎচন্দ্রও যথাসাধ্য তাকে সাহায্য ক'র্‌তে লাগ্‌লেন।

শরীরটা ক'দিন অসুস্থ ছিল। এক অফিস আর বাসা ছাড়া, কোথাও বেরিয়ে যান্ না বড় একটা। অবসর সময়টুকু, বই পড়া ও লেখায় কাটিয়ে দেন নিশ্চিন্তে।

দুই সপ্তাহ পরে একটু সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌লেন। কমলার কথা বার বার তাঁর স্মরণ হ'তে লাগ্‌লো। ছুট্‌লেন তার বাসায়। কিন্তু বিস্ময়ে তিনি ফেটে প'ড়্‌লেন—কমলা অনায়াসে তাদের ছেড়ে রেখে চ'লে গেছে কোথায় কে জানে!

বড় মেয়েটির বুদ্ধি হ'য়েছে। ব'ল্‌লো—মা'র কোন দোষ নেই বামুনদা,—আমাদের জন্যে তিনি কম ত কিছু করেননি!

কথাটা সত্যই—সে একটুও বাড়িয়ে বলেনি। তার ঐকান্তিকতা ত' তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন। কিন্তু বাকী শিশুর দল, সে-সব ত কিছুই বোঝে না—তাদের যে সে ছিল একমাত্র আশ্রয়! তার বিচ্ছেদ-বেদনায় তারা আজ ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। কি ব'লে তাদের যে' সান্ত্বনা দিবেন, কিছুই ভেবে ঠিক্ ক'র্‌তে পার্‌লেন না। একদিন যার মাতৃত্ব-বোধকে আদর্শস্থানীয় ভেবে তৃপ্তি পেতেন—তার এই হৃদয়হীনতার পরিচয়ে সত্যই তিনি ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠ্‌লেন। ভাব্‌লেন, মানুষ সত্যই স্বার্থপর! যা কিছু সে

করে—করে স্বার্থের খাতিরেই। তার বেশী একটি পাও সে চ'লতে পারে না—সে ক্ষমতাও তার নেই !

*   *   *

প্রায় দিন কুড়ি পরে অফিস থেকে ফিরছেন্—পথে কমলার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল। শরৎচন্দ্রের মনটা ঘৃণায় সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌লো। একদিন এই মেয়েটিকে কত শ্রদ্ধাই না তিনি ক'র্‌তেন, আজ তার ছায়াটিও যেন তাঁর কাছে বিষবৎ মনে হ'তে লাগ্‌লো।

শরৎচন্দ্র তাকে এড়িয়ে চ'ল্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লেন্ কিন্তু কমলা তাঁর পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো! ব'ল্‌লো, খুব কি ব্যস্ত আছ, দাদা?

শরৎচন্দ্র থম্‌কে দাঁড়ালেন। কিন্তু উত্তর দিলেন না।

কমলার ঠোঁটের পাতায় সহজাত হাসি ফুটে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো, চল না দাদা, আমাদের নোতুন সংসারটা দেখে আস্‌বে।

শরৎচন্দ্র আর ধৈর্য্য ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লেন না। ফেটে প'ড়্‌লেন—নিঃসহায় শিশুরদলকে ত্যাগ ক'রে, তোমার নোতুন সংসার পাত্‌তে বিবেকে এতটুকু বাধ্‌লো না, কমলা?

উত্তরে কমলা হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—তোমার বিবেচনায় সত্যই কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ ক'রেছি, দাদা?

শরৎচন্দ্র উত্তরে খুঁজে পেলেন না। তার ত্যাগ ত' তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন।

কমলা ব'ল্‌লো—কাজটা যে ভাল হয়নি তা' নিজেও বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু তুমিই বলত', তাদের সাবালক ক'রে—যেদিন নিজের জীবনের প্রতি তাকাবার অবকাশ পেতাম, সেদিন কি আমার জীবনটা শুকিয়ে মরুভূমি হ'য়ে উঠ্‌তো না? একটু থেমে কমলা ব'ল্‌লো—যতটুকু দরকার তার চেয়েও কি কিছু কম ক'রেছি আমি? নিজে না খেয়ে, না পরেও

তাদের খাইয়েছি, পরিয়েছি, সুখ-স্বাচ্ছন্দতার ব্যবস্থাও ক'রেছি। তারপর, যখন দেখ্‌লাম নিজেদের চালিয়ে নেবার সামর্থ্য তারা অর্জ্জন ক'রেছে, তখন নিজের জীবনটাকে রিক্ত ও তিক্ত ক'রে তোলার সার্থকতা কোথায়—তুমি কি আজ আমায় বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পারো, দাদা?

শরৎচন্দ্র কমলার মুখের দিকে তাকালেন। কমলার চোখের পাতাগুলো সজল হ'য়ে উঠেছে। ব'ল্‌লো, ওরা আমার কে? স-পত্নী ছেলেমেয়ে বই ত নয়? যিনি দিলেন জন্ম, তিনি নিঃশব্দে প'ড়্‌লেন স'রে। তারজন্যে কি আজীবন দায়ী থাক্‌বো আমি? জীবনের কি কোন মূল্য দেবার অধিকার আমার থাক্‌বে না?

শরৎচন্দ্র উত্তর খুঁজে পেলেন না। নীরবে রইলেন দাঁড়িয়ে।

কমলা ব'লে চ'ল্‌লো, সুখ ও সুবিধা, এই দু'টোকে কেন্দ্র ক'রেই মানুষের জীবনের ভিত্তি রচনা হয়। মৃত্যুর শেষদিন পর্য্যন্ত চলে এদের একটানা লড়াই। তবুও মানুষ, মানুষকে সুবিধাবাদী ব'ল্‌তে এতটুকুও লজ্জা বোধ ক'রে না। আচ্ছা দাদা, তুমিই ব'ল্‌তো—আমি কি সত্যই কোন গুরুতর অপরাধ ক'রে ব'সেছি? এই যে পৃথিবীতে এসেছি, এর কি কোন কিছুরই অবশ্যকতা ছিল না? এর পিছনে কি কোন উদ্দেশ্য নিহিত নেই? তাই যদি হয়, তবে সৃষ্টির প্রয়োজন হ'ল কেন?

শরৎচন্দ্র প্রশ্নবাণে বিব্রত হ'য়ে প'ড়্‌লেন। এর জন্যে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তা'ছাড়া, এ সব সমস্যা আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র এই প্রশস্ত রাজপথ নয়! ব'ল্‌লেন, বেশ ত' চলো, তোমার নোতুন সংসারটা দেখে আসি!

কমলা হেসে ফেল্‌লো। ব'ল্‌লো—আমায় তুমি ভুল বুঝ্‌লে, দাদা! জীবনের স্বার্থসিদ্ধিটাই হ'ল চরম ও পরম সুখ। তার উদ্দেশ্যেই জীবন-যুদ্ধের হ'ল সূচনা। অথচ এই যে সুখ,—এ শুধু মুহূর্ত্তের অনুভূতি—তবুও একে অবহেলা করা যায় না। কারণ, এটাই হ'ল মানুষের জীবনের পরম

সম্পদ। বিন্দু বিন্দু বারি নিয়ে সৃষ্টি হ'ল সাগর, এই মুহূর্ত্তের সমাবেশেই গঠিত হ'ল জীবনের বিচিত্র ইতিহাস। পারো কি দাদা, এদের অস্বীকার ক'র্‌তে?

শরৎচন্দ্র সহাস্যে উত্তর দিলেন, তোমার কোন কথাই ত' অস্বীকার ক'র্‌তে পারি না কমলা!

কমলা ব'ল্‌লো—তবে—

শরৎচন্দ্র বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, একটু আমায় সময় দাও, কমলা। তোমার সকল প্রশ্নেরই উত্তর আমি দেবো। বুঝ্‌লে—একটু টেনে হেসে উঠে ব'ল্‌লেন, মানুষের ভালমন্দ নিয়ে এই যে আলাপ-আলোচনা—এটাও পরচর্চ্চার সামিল। তবুও ত' আমরা করি! ব'ল্‌তে পারো, কেন? ওটা আমাদের প্রকৃতিগত স্বভাব। তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কেউ না কেউ, সেই আলোচনার বিষয়বস্তু হ'য়ে ওঠে। অথচ এড়িয়ে চ'ল্‌বার শক্তিও আমাদের নেই। তাই তো দেখো: আলোচনা, আলোচনাই র'য়ে যায়। কোন সমস্যারই হয় না সমাধান। কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে ব'ল্‌লেন—জানতো মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতির অন্ত নেই! ভাল-মন্দের সমালোচনা—তার নিজস্ব দুর্ব্বলতাকে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র! মাঝ-পথে পুনরায় থেমে মৃদু একটু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—সকল যুক্তির পিছনেই আছে আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা অন্ধ একাগ্রতা। তাই ফাঁকি দেওয়া যায় অপরকে, কিন্তু ফাঁকি দেওয়া যায় না—অন্তর-দেবতারূপী বিবেককে। সেই বিবেক যদি সায় দেয়—কোন কাজেই পিছপা হওয়া উচিত নয়, দিদি!

কমলা কি যেন উত্তর দিতে গেল, শরৎচন্দ্র বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—তর্ক নয় কমলা, বিবেকের নির্দ্দেশই জীবনের শ্রেষ্ঠ পাথেয়! আকাশের দিকে তাকিয়ে ব'ল্‌লেন—সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। চলো—একটু এগিয়ে দিয়ে আসি!

কমলা খুশী হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো, সেই ভালো! একেবারে বাসা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে হ'বে কিন্তু!

* * * *

বাসায় ফিরে এলেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে মনে প'ড়ে গেলো, সুমিত্রার কথা—"এ জাতটাকে সত্যই ভাল বাস্‌তে ইচ্ছে যায়।" পরক্ষণেই ভেসে উঠ্‌লো—কমলার সেই বিচ্ছেদ-বেদনা-কাতর মুখের ছায়াটা। সেদিন তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর এই কথাটা মনে হ'য়েছিল, "এত সহজে পথে বসাতেও বোধ হয় কেউ পারেনি"—আজ আবার নিজের চোখেই দেখে এলেন, তা'র নতুন গৃহস্থালী। চোখেমুখে ফুটে উঠেছে তাদের জীবনের কত আশা ও আকাঙ্ক্ষার ছবি—। মনে মনে ব'লে উঠ্‌লেন—কত বিচিত্রই না এই জগৎ! অথচ এদের কোনটাই ত মিথ্যে নয়! কোনটাকেই ত ঠেলে দেওয়া যায় না!

ঘরের চাবি খুলে বাতিটা জ্বেলে লিখ্‌তে ব'স্‌লেন। মনটা তাঁর তখন ভাব্‌রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাত যখন দ্বিপ্রহর, "নারীর ইতিহাস" রচনা হ'ল শেষ। আনন্দের আতিশয্যে তিনি নিশ্চিন্তমনে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লেন।

একটা হিস্ হিস্ শব্দে সহসা তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখ্‌লেন, চারপাশে তাঁর দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বল্‌ছে। প্রথমে কি ক'র্‌বেন—কিছুই স্থির ক'র্‌তে পার্‌লেন না। কয়েক সেকেণ্ড পরে সম্বিৎ ফিরে পেলেন। একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন বাইরে। তখন বহু লোক জমা হ'য়ে গেছে আগুন নেভানোর উদ্দেশ্যে।

অনেক কষ্টে নিভানো হ'ল, কিন্তু দেখা গেল তাঁর এতদিনের সংগ্রহ, কষ্ট ও মেহনৎ, সবই শেষে হ'য়ে গেছে। ছা'য়ে পরিণত হ'য়েছে তাঁর সখের লাইব্রেরী, বুকের রক্ত নিংড়ে লেখা, "নারীর ইতিহাস,"

"চরিত্রহীন" আর তাঁর অন্তর-রসসিঞ্চনে আঁকা মহেশ্বেতার প্রিয় ছবিখানি।

ব্যথা ও বেদনায় শরৎচন্দ্রের অন্তর টন্ টন্ ক'রতে লাগ্‌লো। বার বার তাঁর মনে হ'তে লাগ্‌লো, নিজের জীবনের চেয়েও প্রিয় বস্তুগুলি আজ হারালেন তিনি! সারা জীবনে হয়ত এ ক্ষয় ও ক্ষতির পূরণ সহজে আর হ'বে না। নিজের অজ্ঞাতেই চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে প'ড়্‌লো ফোঁটা কয়েক জল।

* * *

এই ঘটনার পর শরৎচন্দ্র তাঁর প্রিয় সেই কুলিবস্তীর মায়া কাটিয়ে উঠে এলেন রেঙ্গুন সহরে। অভিরাম পতির হোটেলে (কারও কারও মতে চট্টোরাজের হোটেলে) ছু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রলেন।

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ১৪৭]

সে দিন আবহাওয়াটা ভাল ছিল না। শরৎচন্দ্র হোটেল থেকে নেমে রাস্তায় পা দিয়েছেন, একটি পনেরো কি ষোল বছরের মেয়ে তাঁর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ল্‌লো—তুমি? তুমি এখানে বামুনদা'?

শরৎচন্দ্র তখনও মেয়েটিকে চিনতে পারেননি।

মেয়েটি তেমনি ব্যাকুল কণ্ঠে ব'ল্‌লো, ভুলে গেছ বামুনদা'? ক'ল্‌কাতায়—, মুখ্‌টা চেনাচেনা মনে হ'চ্ছিল এতক্ষণ। ক'ল্‌কাতা কথাটায় তাঁর পুরানো স্মৃতি সহসা জাগরূক হ'য়ে উঠ্‌লো। মনে প'ড়ে গেল সৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আখ্‌ড়ার কথা। চকিতে চোখের তারা ছুটো তাঁর জলে উঠ্‌লো! চিন্‌তে পার্‌লেন মেয়েটিকে। তখন সে ছিল প্রায় শিশু, এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চেহারায় অনেক পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। তাই সহসা তাকে চিনে উঠ্‌তে পারা যায় না। ব'ল্‌লেন—হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে পড়েছে বটে! তা' খবর কি বলতো? থাকো কোথায়?

মেয়েটি ব্যাকুলতা প্রকাশ ক'র্লো—আমায় তুমি বাঁচাও বামুনদা! শরৎচন্দ্র তার এই ব্যাকুলতার কারণ খুঁজে পেলেন না। ব'ল্লেন, কি হ'য়েছে তোমার, খুলে ব'ল্তে পারো স্বচ্ছন্দে!

মেয়েটি চঞ্চল হ'য়ে উঠ্লো। চার পাশ একবার ভাল ক'রে তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্লো, তোমার বাসা কোথায় বামুনদা'? দয়া ক'রে একটু আশ্রয় দাও, তারপর সব কথা তোমায় খুলে ব'ল্ছি!

বাসাটা ছিল কাছেই। অফিসে যাওয়ার সময় হ'য়ে এসেছিল। মেয়েটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢুক্লো।

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন, এখন অফিস যাচ্ছি, পরে বরং দেখা ক'রো। আমার যতদূর সাধ্য তোমায় সাহায্য ক'র্বো!

মেয়েটি কিন্তু নিঃশব্দে তক্তপোষের নীচে আশ্রয় নিয়ে ব'ল্লো, তার চেয়ে বরং ঘরে চাবি দিয়ে যাও—আমি কোনমতেই আর বা'র হ'চ্চিনে।

শরৎচন্দ্র বিব্রত হ'য়ে প'ড়্লেন। ব'ল্লেন, তা' কি হয়?

মেয়েটি উত্তর দিল, নইলে বাবার হাত থেকে আমার আর মুক্তি হ'বে না! বিশ্বাস করো, তিনি আমায় বিক্রি ক'রে দিতে চান—দোহাই দা'ঠাকুর আমায় বাঁচাও।

সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ। বাধ্য হ'য়ে তারই কথামত ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন অফিসে।

* * *

শুভ-অশুভ চিন্তায় মনটা তাঁর ভারাক্রান্তই ছিল। তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে এলেন। কাছে এসে দেখ্লেন, পুলিশ তাঁর বাসাটা ঘিরে র'য়েছে। নিরুপায়ে তিনি ফিরে গেলেন মনিবাবুর (মিত্রির) কাছে। তিনিই শরৎচন্দ্রকে তাঁর অফিসে চাকরী ক'রে

দিয়েছিলেন। শুধু আন্তরিক স্নেহ তিনি ক'রতেন না—একজন যথার্থ গুণী ব'লে সমাদরও ক'রতেন যথেষ্ট। রেঙ্গুনের সমস্ত অফিসার ও সম্রান্ত লোকের সঙ্গে তাঁর শুধু আলাপ ছিল না, সকলেই তাঁকে মান্য করে চ'ল্‌তেন। স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে পুলিশসাহেবকে ডেকে সমস্ত ঘটনা খুলে ব'ল্‌লেন; এবং বার বার জোর দিয়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন—আমরা মেয়েটিকে রক্ষা ক'রতেই চেয়েছি, তার বাপের অত্যাচারের হাত থেকে।

পুলিশসাহেব চ'লে গেল। নিবারণ চক্রবর্ত্তী তখন মনিবাবুকে ধ'রে ব'স্‌লেন—আপনারা আমার মেয়েকে নিয়ে যা' খুশী করুন কোন আপত্তি নেই। শুধু নিবেদন—নগদ দু'শো টাকা আর যাতায়াতের খরচটা দিয়ে আমায় বিদায় ক'রে দিন!

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'রলেন, কারণটা কি?

নিবারণ চক্রবর্ত্তী ব'ল্‌লেন, নইলে বাঁচার আর আমার উপায় থাক্‌বে না! আকিয়াবে দু'শো টাকায় ওকে বিক্রী ক'রেছিলাম—কিন্তু আমারই সঙ্গে ও পালিয়ে এলো। টাকা ফেরৎ দেবো, কথা দিয়েছি—তাদের লোকও সঙ্গে আছে—হয় আমায় বাঁচান, নইলে এমন হৈ-চৈ ক'রে বেড়াবো যে, এখানে সসম্মানে বাস করার উপায় আর আপনাদের থাক্‌বে না কোনদিন!

অগত্যা শরৎচন্দ্র রাজি হ'লেন দু'শো টাকা দিতে। মনিবাবুও বাকী টাকা দিতে স্বীকৃত হ'লেন।

নিবারণ চক্রবর্ত্তী পেয়ে ব'স্‌লেন, একটা ধুতি আর চাদরও দিতে হ'বে!

মনিবাবু আশ্বাস দিলেন, তারজন্যে আপনি ভাব্‌বেন না নিবারণবাবু, এখন একটু চুপ ক'রে দাঁড়ান—আপনার মেয়ের কাছ থেকে বরং আমরা ঘুরে আসি একটু!

ঘর খোলা হ'ল। নিবারণ চক্রবর্তীও তাঁদের পিছু পিছু ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন। মেয়েটির মুখ সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে শুকিয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গেল। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ব'ললো—না—না—দোহাই অপনাদের, ওঁর হাতে আমায় আর ফিরিয়ে দেবেন না!

মনিবাবু মেয়েটির সাম্‌নে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। ব'ল্‌লেন—ভয় কি মা? আমরা ত' সব র'য়েছি!

মেয়েটির চোখের জল তবুও থামতে চায় না। ব'ল্‌লো—ভাগ্যে আমার আরও কত যে দুঃখ আছে, কে জানে! আট বছর বয়সে হ'লাম বিধবা। শাশুড়ী বিক্রী ক'রে দিলেন—আর একজনের কাছে। তিনি নিয়ে এলেন ক'ল্‌কাতার ঠাকুরবাড়ীতে। সেখান থেকে মুক্তি পেলাম। ফিরে এলাম বাবার কাছে, সেখানেও পেলাম না শান্তি। তিনি আবার বিক্রী ক'র্‌লেন আকিয়াবে মুসলমানদের কাছে। তারা বন্ধ ক'রে রাখ্‌লো সাতদিন। তারপর হাঁটাপথে এসেছি রেঙ্গুন—এরপরেও কি এতটুকু আশ্রয় দেবেন না আপনারা!

* * *

মনিবাবু অভিভূত হ'য়ে প'ড়্‌লেন। ব'ল্‌লেন—না—না, তোমায় আমরা সম্পূর্ণ আশ্বাস দিতে পারি—এখানে তোমার উপর আর কেউ নির্য্যাতন ক'র্‌বে না! নিবারণবাবুর সমস্ত প্রাপ্য এখুনি আমরা মিটিয়ে দিচ্ছি। ব'লেই বেরিয়ে এলেন বাইরে।

শরৎচন্দ্রকে কাছে ডেকে ব'ল্‌লেন—আপাততঃ তোমার কাছেই ও থাক্—তারপর দেখেশুনে বরং বিয়ের একটা ব্যবস্থা ক'রে দিলেই চ'ল্‌বে!

শরৎচন্দ্রও রাজী হ'লেন। ব'ল্‌লেন, সেই ভাল। টাকাটা বরং এখনই চুকিয়ে, বুড়োকে বিদায় ক'রে দেওয়া যাক্। আবার কি ঝামেলা বাধাবে, কে জানে!

মনিবাবু ও শরৎচন্দ্র, নিবারণবাবুকে ডেকে তাঁর সমস্ত দাবী মিটিয়ে দিলেন। খুশীতে বুড়োর চোখমুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লেন, সত্যিই আপনারা বাবুর মত বাবু আছেন বটে! যাই—সে শালাদের ঋণটা এখন শোধ ক'রে দিয়ে আসি। ফিরে, কিন্তু আজ এখানেই দু'মুঠো আমি খাবো!

নিবারনবাবু চলে গেলেন। মনিবাবু অতি দুঃখেও হেসে ফেল্‌লেন। ব'ল্‌লেন—দুনিয়াটা সত্যিই বিচিত্র হে শরৎ! এমন বাপ্‌ও দুনিয়ায় দেখা যায় তা'হলে!

নিবারণবাবু লোক যে খারাপ ছিলেন তা নয়! অভাবের তাড়নায়, শোকে-দুঃখে, এমন একটা স্বার্থান্বেষী জড় প্রকৃতির মানুষে পরিণত হ'য়েছিলেন। হাসিমুখে তিনি মেয়েকে বিক্রী ক'রেছিলেন কিন্তু তার সুখ-স্বাচ্ছন্দতার কথা ভুলেননি এতটুকু। যাওয়ার সময় তিনি মেয়েকে কাছে ডেকে, পাশে বসিয়ে, দু'চার ফোঁটা চোখের জল ফেলে ব'ল্‌লেন—যে বাবুর হাতে তোমায় তুলে দিয়ে গেলাম—তিনিই তোমায় সুখী ক'র্‌বে মা! দেখো, বুড়ো বাপের আশীর্ব্বাদ কখনও মিথ্যে হবে না!

নিবারণবাবুর আরও দু'চার দিন থাকার ইচ্ছা থাক্‌লেও, শরৎচন্দ্রের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে ভরসা আর তাঁর হ'ল না। পরদিন তিনি দেশের দিকে রওনা হ'য়ে প'ড়্‌লেন।

* * * *

কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র ভীষণ অসুস্থ হ'য়ে প'ড়্‌লেন। মেয়েটি আপ্রাণ সেবা ও যত্নে তাঁকে সুস্থ ক'রে তুল্‌লেন। শরৎচন্দ্রও তার এই ঐকান্তিক সেবা ও যত্নে মুগ্ধ হ'য়ে প'ড়েছিলেন। মনিবাবু বিয়ের কথা মুখে ব'লে গেলেও আজ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টাই তিনি করেননি। ইতিপূর্ব্বে তিনি স্বেচ্ছায় মেয়েটিকে দু'একবার পাত্রস্থ করার চেষ্টা ক'রেছিলেন, কিন্তু

মেয়েটি কিছুতেই রাজী হয়নি। বলে, পুরুষ বহু মেয়ে বিয়ে ক'র্‌তে পারে, মেয়ে কিন্তু বিয়ে করে একটিবার এবং একটি পুরুষকেই! সবিস্ময়ে হতবাক হ'য়েছিলেন সেদিন। আজ কথায় কথায় শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, তোমার কথা শুনে মনে হয়, বিয়েতে তোমার আপত্তি নেই—কিন্তু শুন্‌তে পারি কি সে ভাগ্যবান পুরুষটি থাকেন কোথায়? মেয়েটি এতটুকুও সঙ্কোচ বোধ ক'র্‌লো না। স্নিগ্ধ একটু মুচ্‌কি হাসি হেসে ব'ল্‌লো, তুমি!···আমি? বিস্ময় বিমুগ্ধ শরৎচন্দ্র। হ্যাঁ, তুমি! মেয়েটি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল। তুমি ছাড়া আর কাকেও আমি স্বামীরূপে বরণ ক'র্‌তে পার্‌বো না! অনেক বুঝালেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু মেয়েটি অটল ও অচল। অগত্যা শরৎচন্দ্র তাকেই বিয়ে করা স্থির ক'র্‌লেন। সুস্থ হ'য়ে উঠে তিনি তাকে শৈব মতে বিয়ে ক'র্‌লেন। নাম দিলেন হিরণ্ময়ী দেবী।

[বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন-প্রশ্ন, শৈলেন বিশী, পৃঃ ৯২]

সুখে-দুঃখে সংসার কোনমতে চ'লে যায়। হঠাৎ এক ফকিরের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'য়ে গেল। তিনি ব'লে গেলেন, একটা কুকুর কিনে যত্ন ক'রে পুষ্‌লে, ভাগ্য তোমার খুলে যেতে পারে!

কথাটা তাঁর মনে লেগে গেল। বাজার থেকে আট আনা পয়সা দিয়ে একটি কুকুরবাচ্চা কিনে নিয়ে এলেন পরদিন।

হিরণ্ময়ী দেবী কুকুরবচ্চা দেখে একটু হতবাক্ হ'লেন। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, ওটা আবার কি ক'র্‌তে নিয়ে এলে?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—সব কথায় তোমার কাজ কি, বউ! সখ গেল, নিয়ে এলাম—এবার একটু-আধটু যত্ন ক'রে মানুষ ক'রে তোল!

হিরণ্ময়ী দেবী বিরক্ত বোধ ক'র্‌লেন না। নিঃসঙ্গ জীবনে একটি সঙ্গী জুটে গেল! আদর ক'রে নাম রাখ্‌লেন, বংশীবদন। শরৎচন্দ্র নাম দিলেন, ভেলি। শেষ পর্য্যন্ত সে "ভেলু" নামেই হ'ল পরিচিত।

* * *

ইতিপূর্ব্বে কুন্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৩০৯) গল্প "মন্দির" ১৩১০ সালে প্রথম ছাপা হ'য়েছিল। এর চার বছর পরে ১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ়ে "ভারতী" পত্রিকায় "বড়দিদি" ধারাবাহিকভাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ ক'র্‌লো। লেখকের নাম না থাকায়, অনেকের মনে ধারণা জন্মেছিল এটি রবীন্দ্রনাথের ছদ্ম রচনা। কিছু আলোড়নও চ'লেছিল। পরে রবীন্দ্রনাথ, এটি তাঁর রচনা ব'লে অস্বীকার করায়, লেখক সম্বন্ধে সমস্ত গবেষণার যবনিকা পতন ঘট্‌লো।

[শরৎচন্দ্রের একান্ত ইচ্ছা ছিল, তাঁর রচনা যেন "প্রবাসী"তে আত্মপ্রকাশ করে। সে সুযোগ মিলে গিয়েছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-ম'শায় হাকিম হ'য়ে ভাগলপুরে আসাতে। তাঁর এই লেখাটি ভাল লাগায় নকল সুরু হ'য়ে গেল। কিন্তু তিনি পূজোর ছুটির পর বদ্‌লি হ'য়ে যাওয়ায় উৎসাহীদের নিরাশ হ'তে হ'ল। তবুও কপিটি "প্রবাসীতে" পাঠানো হ'ল। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে সরলাদেবীর হাতে গিয়ে প'ড়্‌লো। তখন "ভারতী" সম্পাদনার ভার ছিল সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় ম'শায়ের ওপর। তিনি সুরেন্দ্রনাথের (গঙ্গোপাধ্যায়) সঙ্গে যুক্তি ক'রে এবং শরৎচন্দ্রের অনুমতি সুরেন্দ্রনাথ মারফৎ আনিয়ে ছাপাতে সুরু ক'রে দিলেন। প্রথম দু'টি সংখ্যাতে তাঁর নাম ছিল না। পরে তাঁর নাম প্রকাশ করা হ'য়েছিল। ['শরৎ-পরিচয়', সু. না. গ., পৃঃ ১৫৩ ও শরৎ-প্রসঙ্গ (শরৎ-বন্দনা), সৌ. মো. মু, পৃঃ ২৩৯-৪০]

সংবাদটা রেঙ্গুনেও ছড়িয়ে প'ড়্‌লো! ফলে, বন্ধুমহলে তাঁর খাতির রাতারাতি বেড়ে গেল রীতিমত। সেদিন কিন্তু তিনি আনন্দে আত্মহারা হ'লেন না। বরং সংযত হ'য়ে এরপর থেকে নিয়মিত পড়াশুনা ও গোপনে লেখা আরম্ভ ক'রে দিলেন। যাকে বলা চলে নীরব সাধনা! অবশ্য ভাগলপুরের চেলা-চামুণ্ডারা উপহার থেকে বঞ্চিত হ'লেন না। পাঠিয়ে দিলেন দু'একটা "ফাউণ্টেন পেন"।

ফকিরের কথা বর্ণে বর্ণে মিল্‌তে সুরু হ'ল। ক'ল্‌কাতায় পাড়ি দেওয়া দরকার। সুতরাং শরীর অসুস্থতার অজুহাতে [অফিসে ডাক্তার সার্টিফিকেট্ প্রডিউস্‌ ক'রে অক্টোবর মাসে (১৯১২)] সস্ত্রীক রওনা হ'লেন ক'ল্‌কাতায়। উঠ্‌লেন কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে, কৈলাস বসু ম'শায়ের বাড়ীর পাশের এক ভাড়াটে বাড়ীতে। "নারীর মূল্য"-এর বাকী অংশটুকু তিনি বর্ম্মা থেকে ক'ল্‌কাতা আসার পথে শেষ ক'রেছিলেন। কিন্তু এত কাটাকুটি ক'র্‌তে হ'য়েছিল যে, সেটুকু পুনরুদ্ধার না ক'র্‌লে পাঠোদ্ধার সম্ভবপর নয়! অথচ হাতে অনেক কাজ। সময়ও খুব সংক্ষিপ্ত। ইতিমধ্যে সকল কাজ শেষ ক'রে তাঁকে ফিরে যেতে হ'বে বর্ম্মায়।

সেদিন লেখাটা নিয়ে ব'স্‌লেন কিন্তু মন কিছুতেই ব'স্‌লো না। অবশেষে মিঃ সি. কে. সরকার ম'শায়ের কাছে দেখা ক'র্‌তে গেলেন। বর্ম্মার বন্ধু,—ক'ল্‌কাতায় এসে একবার না দেখা ক'র্‌লে মনটা শান্তি কি পেতে পারে কখনও?

কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চ'ল্‌লো। শরৎচন্দ্রের হাতে কাগজের একটা মোড়ক। মিঃ সরকার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—হাতে ওটা তোমার কি শরৎ?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—এটা আমার দিদির লেখা! প'ড়ে দেখ্‌বে না কি একবার—কেমন লিখেছেন আমার দিদি?

মিঃ সরকার অবিশ্বাসের হাসি হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—তোমার আবার দিদি এলো কোথা থেকে?

বিশ্বাস করো—দিদি আমার আছে। হাওড়ার গোবিন্দপুরে তার শ্বশুরবাড়ী। আমার ভাই প্রভাসও সন্ন্যাসী হ'য়ে এখন বেলুড় মঠে আছে!

কথাটা মোটেই বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌লেন না মিঃ সরকার। ব'ল্‌লেন, পৃথিবীশুদ্ধ লোক তোমার আত্মীয় আমি জানি। মিছে রেফারেন্স দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনে।

শরৎচন্দ্র তাঁর সহজাত স্বাভাবিক একটু হাসি হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—প'ড়ে দেখো ত' কেমন হ'য়েছে!

টেবিলের ওপর মোড়কটা রেখে একটা চুরুট ধরালেন। হঠাৎ কথায় কথায় পড়াশুনার কথা উঠ্‌লো।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—আচ্ছা সরকার, তোমরা ত' বহু বই পড়ো, কিন্তু একটা কথার আমার উত্তর দিতে পারো—সেগুলো কি কখনও ভেবে দেখার অবসর পেয়েছো জীবনে?

মিঃ সরকার উত্তর দিলেন—পড়া মানে সঞ্চয় করা—

বাধা দিয়ে উঠ্‌লেন শরৎচন্দ্র। ব'ল্‌লেন—তা নয়। সঞ্চয়ও চাই—তার ক্ষয়ও চাই, নইলে সঞ্চয়ের কোন মূল্য থাকে না! পড়ো ক্ষতি নেই, অজানা অচেনা বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করো—তার মত ভাল কাজও এ-জগতে নেই—সেই সঙ্গে একটিবার ভেবেও দেখো—বক্তব্য তাদের কতটুকু সত্যি! কতটুকু তার প্রয়োজন? কতটুকু সত্য নিহিত র'য়েছে তার মধ্যে? তবেই তার সার্থকতা—নইলে জেনো, সব কিছুই মূল্যহীন! ব'লেই সহসা উঠে দাঁড়ালেন শরৎচন্দ্র। মোড়কটাও তুলে নিলেন সেই সঙ্গে।

মিঃ সরকার বাধা দিলেন, কোথায় আবার চ'ল্‌লে? চা আন্‌তে যে ব'লেছি তোমার জন্যে!

ভাল লাগ্‌ছে না, একটু ঘুরে আসি! ব'লেই শরৎচন্দ্র বেরিয়ে প'ড়্‌লেন সেই মুহূর্ত্তে।

ছুটি মাত্র একটি মাসের। ফিরে যেতে হবে নভেম্বর মাসে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা না ক'র্‌লেও নয়। সেই সময়ে উপেনবাবু (গঙ্গোপাধ্যায়) ফনি পাল ম'শায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

তিনি "যমুনা" পত্রিকার সম্পাদক। তাঁরই বিশেষ অনুরোধ ও পীড়া-পীড়িতে অবশেষে কথা দিলেন নিয়মিত লেখা তিনি দেবেন তাঁর পত্রিকায়। স্থির হ'ল আপাততঃ তাঁর ছেলেবেলার লেখা "বোঝা" নামে একটি গল্প—"যমুনায়" পত্রিকায় ছাপা হোক্, তারপর তিনি বর্ম্মা মুলুক থেকে নিয়মিত লেখা পাঠাবেন। অবশ্য তিনি মুক্তি পাওয়ার আশায় এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বর্ম্মা ফিরে গেলেন (নভেম্বর ১৯১২)।

কার্ত্তিক-পৌষে "বোঝা" বেরুলো "যমুনায়"। তার পরমাসে "সাহিত্য" পত্রিকায় বেরুলো "বাল্য-স্মৃতি"। "কাশীনাথ" আত্মপ্রকাশ ক'র্লো "সাহিত্যে"—ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায়।

শরৎচন্দ্র খুশী হ'তে পার্লেন না। কারণ তাঁর প্রথম বয়সের রচনায় প্রতি তেমন আস্থা ছিল না। তিনি মনে-প্রাণে বিরক্তি বোধ ক'র্লেন—এই উপকারী বন্ধুটির ওপর। এ তো তাঁর উপকার নয়—হত্যার ষড়যন্ত্র! চিঠির পর চিঠি ছাড়্তে লাগ্লেন এই সব বন্ধুবর্গদের প্রতি।

এ-পাশে তিনি প্রতিশ্রুতি মত "রামের সুমতি" গল্পটি পাঠালেন "যমুনায়"। সে গল্পটি ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ ক'র্লো (১৩১৯)। সাড়া প'ড়ে গেল চারিদিকে। বৈশাখে বেরুলো "পথ-নির্দ্দেশ", সুরু হ'ল "চন্দ্রনাথ"। ও-পাশে অনিলা দিদির ছদ্মনামে ওই বৈশাখেই বেরুলো "নারীর মূল্য" (১৩২০)। আষাঢ় ও ভাদ্রে "আলো-ছায়া", শ্রাবণে "বিন্দুর ছেলে" (১৩২০)। পুস্তকাকারে বেরুলো "বড়দিদি" (প্রকাশক ফণীন্দ্রনাথ পাল)। ধীরে ধীরে এই জ্যোতিষ্কের উপর সকলেরই শুধু দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল না—শ্রদ্ধায় মাথা নতও ক'র্লো সেইসঙ্গে। রবিভোর যুগে 'চন্দ্রের' আবির্ভাব—বিস্ময়-বিমুগ্ধ-চিত্তে দেশবাসী তাকিয়ে দেখ্লো—হ্যাঁ, শরতের 'চন্দ্র'ই বটে!

"ভারতবর্ষ" পত্রিকার আবির্ভাব হ'ল (১৩২০)। পরিচালক গোষ্ঠির মধ্যে প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য ম'শায়ও ছিলেন (কলিকাতা ইভ্নিং ক্লাবের

সম্পাদক)। ইনি ছিলেন মজঃফরপুরের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই সাহিত্য-সমিতি থেকে প্রথম একখানি কাগজ বা'র করার প্রস্তাব উঠেছিল, পরে দ্বিজেন্দ্রলালকে সম্পাদক ক'রে "ভারতবর্ষ" বা'র করা হয়। তাঁরই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি ভারতবর্ষে লেখা দিতে সম্মত হ'লেন। পাঠালেন "চরিত্রহীনের" কিছু অংশ। কিন্তু কয়েক মাস পরে তা প্রত্যাখিত (অমনোনীত) হ'য়ে ফিরে গেল তাঁর কাছে। শরৎচন্দ্র ক্ষুণ্ণ হ'লেন মনে-প্রাণে।

লেখানা পাঠালেন "যমুনায়"। এ-পাশে প্রমথবাবু চিঠিতে চিঠিতে ঘর তাঁর প্রায় ভরিয়ে তুল্লেন। অবশেষে "ভারতবর্ষে" পাঠালেন "বিরাজ বৌ"। দেশবাসী তাঁকে সেইসঙ্গে একজন প্রতিভাশালী লেখক ব'লে মেনে নিলেন। এই সময়ে সস্ত্রীক তিনি একবার ক'ল্‌কাতায় ফিরে এলেন (১৯১৪) অসুস্থতার দোহায়ে। কিছুদিন পরে পুনরায় ফিরে গেলেন বর্ম্মায়। এ-সময় পুস্তকাকারে বেরুলো, "বিরাজ বৌ", "বিন্দুর ছেলে" (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স), "পরিণীতা" ও "পণ্ডিতমশাই" (রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স)। "যমুনার" সম্পাদকরূপে তাঁর নামও যুক্ত করা হ'ল। "সাহিত্যে" বেরুলো "অনুপমার প্রেম", "যমুনায়" বেরুলো "পরিণীতা", "ভারতবর্ষে" "পণ্ডিতমশাই," "মেজদিদি", "দর্পচূর্ণ" ও "আঁধারে আলো"। "যমুনায়" "ঘর ভাঙা", "ভারতবর্ষে" "নিষ্কৃতি", "সাহিত্যে" "হরিচরণ", "ভারতবর্ষে" "পল্লীসমাজ", "শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী"। যেন তাঁর লেখার বন্যায় বাংলা দেশ আত্মবিভোর হ'য়ে উঠ্‌লো। সেইসঙ্গে তাঁর নাম, যশ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তিও বেড়ে চ'ল্‌লো সেইমত।

* * * *

মহাত্মা গান্ধী আফ্রিকা থেকে ফিরে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি ১৯১৫ সালে রেঙ্গুনেও পা দিলেন। জুবিলী হলে তাঁকে

সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে একটি পার্টি দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। শরৎচন্দ্রও সে সভায় যোগ দিলেন। ছেলেমানুষের মত কাড়াকাড়ি ক'রে আট-দশ প্লেট আইসক্রীমও খেলেন, কিন্তু সে রাজনীতির মধ্যে নিজেকে জড়ালেন না।

শরৎচন্দ্র সাহিত্য-সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত ক'রতে চাইলেন কিন্তু তার অন্তরায় হ'ল চাকুরী। চাকুরী নইলে পেট চলে না! অগত্যা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁকে জীবন যাত্রার পথে অগ্রসর হ'তে হ'ল। ফলে, মেজাজটা তাঁর হ'ল খিট্‌খিটে, শরীর অসুস্থ হ'তে লাগ্‌লো দু'চার দিন অন্তর। কাজকর্ম্মে নানারূপ বিঘ্ন দেখা দিল।

শোনা গেল রবীন্দ্রনাথ জাপানে যাচ্ছেন। পথে রেঙ্গুনে তিনি দু'একদিন অবস্থান ক'রবেন! সহরে একটা হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। তৈরী হ'ল অভ্যর্থনা সমিতি। স্থির হ'ল তাঁকে অভিনন্দ পত্র দেওয়া হ'বে। সে অভিনন্দন পত্র রচনার ভার দেওয়া হ'ল শরৎচন্দ্রের ওপর। তিনি রচনা ক'র্‌লেন—

শ্রীযুত স্যার্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাইট, ডি-লিট্
মহোদয় শ্রীকরকমলেষু

কবিবর,—

এই সুদূর সমুদ্রপারে. বঙ্গমাতার ক্রোড়-বিচ্যুত সন্তান, আমরা আজ হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ঘ্য লইয়া, আমাদের স্বদেশের প্রিয়তম কবি, জগতের ভাব-জ্ঞানরাজ্যের সম্রাট, আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

আপনি অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভা বলে নব নব সৌন্দর্য্য ও নব নব আনন্দ আহরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং নব সুরে, নব রাগিনীতে, বঙ্গ-হৃদয়কে এক নব চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছেন।

আপনার কাব্যকলার সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্য হৃদয়ের এক অভিনব পরিচয়, অধুনা প্রতীচ্যের নিকট সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেই পরিচয়ের আনন্দে, প্রতীচ্য আজ প্রাচ্যের কবি-শিরে সাহিত্যের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা মুকুট পরাইয়া দিয়াছে তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর মুখশ্রী মধুর স্মিতোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার কাব্য-বীণার সহস্র অনির্ব্বচনীয় সুরে ভারতের চিরন্তন বাণী, সত্য-শিব-সুন্দরের অনাদি গাথা ধ্বনিত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ, অপরিসীম আশা ও অসীম আশ্বাস, মানব হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিশাল সৃষ্টির অণুপরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পরিস্পন্দিত হইতেছে, এবং এক অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার কাব্যে—সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং আপনাকে কোন দেশ বা যুগ বিশেষের নয়, সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনার কথায়, কাব্যে, নাট্যে ও সঙ্গীতে যে মহান্ আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, এক লোকাতীত রাজ্যের আলোকে আপনার নয়ন উদ্ভাসিত, এক অমৃত সত্তার আনন্দরসে আপনার হৃদয় অভিষিক্ত।

আপনার অকৃত্রিম একনিষ্ঠ আজন্ম বাণী-সাধনা যে অতিন্দ্রিয় রাজ্যের স্বর্ণ উপকূলে আপনাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দ-গীতি, নিখিল মানব হৃদয়কে নব নব আশা ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ করিয়া আপনার সুমোহন কাব্য রচনায় নিত্যকাল ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক, ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা। ইতি—

রেঙ্গুন,
২৫শে বৈশাখ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

ভবদীয় গুণমুগ্ধ
রেঙ্গুন প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণ।

[ব্রঃ দেঃ শঃ হইতে গৃহীত। প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৩, গিরীন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।]

(রবীন্দ্রনাথকে ২৫শে বৈশাখ, ১৩২৩ সালে জুবিলি হলে প্রবাসী বাঙালী ও বর্ম্মীদের তরফ থেকে দু'টি পৃথক মানপত্র দুটি কাস্‌কেটে দেওয়া হয়। সভাপতি ছিলেন মিঃ আবদুল করিম জামাল, আর মানপত্র পাঠ ক'রেছিলেন ব্যারিষ্টার নির্ম্মলচন্দ্র সেন ও ব্যারিষ্টার মিঃ উই-ব-থিয়েন। শরৎচন্দ্র সে সভায় যোগদানের অবকাশ পাননি। কারণ তার পূর্ব্বেই তিনি ক'ল্‌কাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন।)

মানুষ ভাবে এক, হয় অন্যরূপ। সে-সময় সাহেবদের বীর দাপটে অফিসের লোকেরা সব সময়েই কাঁপ্‌তো। সামান্য একটু ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য কেরাণী থেকে আরম্ভ ক'রে পিয়নদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার শেষ থাক্‌তো না। শরৎচন্দ্রের শরীর ও মন সেদিন ভাল ছিল না। অন্যমনা হ'য়ে কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে একটু ভুল হ'য়ে গিয়েছিল। সাহেব উত্তেজিত হ'য়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন।

শরৎচন্দ্র সাহেবের ঘরে ঢুক্‌তেই সাহেব চেয়ার ছেড়ে গর্জ্জে উঠ্‌লেন, ইরেস্‌পন্সিব্‌ল্ ননসেন্স—

মেজাজ্‌টা একে ভাল ছিল না। তার উপর ধমক—শরৎচন্দ্র ক্রোধে দিশেহারা হ'য়ে প'ড়্‌লেন। পরমুহূর্ত্তেই সাহেবের নাকে সবলে দু'তিনটে ঘুষি বসিয়ে ব'ল্‌লেন—তোমার চাক্‌রীর পরোয়া ক'রিনে সাহেব। লাথি যারা সহ্য ক'রে, তাদের মুখ ভেঙ্‌চো—আমরা বাঙালী, চিনি—ঘুলেট আর লাঠি!

সাহেব মার খেয়ে সংযত হ'য়ে প'ড়্‌লো বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের আর চাক্‌রী করা সম্ভব হ'ল না। পদত্যাগ পত্র দাখিল ক'রে বাসায় ফিরে এলেন।

পরদিন দুপুরে পিয়োন একটা রেজিষ্টার্ড থাম দিয়ে গেল। খুলে দেখ্‌লেন, প্রমথবাবু একটা এগ্রিমেণ্ট ফ'র্ম পাঠিয়েছেন। সেইসঙ্গে তাঁর চিঠিরও জবাব দিয়েছেন, "সত্যকার সাহিত্যিক হ'তে হ'লে, সমস্ত

বাঁধন তোমায় ছিঁড়্‌তে হ'বে। আমি তোমার অবস্থা উপলব্ধি ক'রেই, হরিদাসবাবুকে সমস্ত কথা খুলে ব'লেছিলাম। তিনি তোমায় মাসিক একশত টাকা ক'রে দিতে রাজি আছেন। যদি মত থাকে তো চ'লে এসো। প্রীতি ও ভালবাসা গ্রহণ ক'রো।—প্রমথ।"

শরৎচন্দ্র হাতে স্বর্গ পেলেন। এ অবস্থায় তাঁর আর একটি মুহূর্ত্তও সেখানে থাক্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছিল না। অথচ হাতে একটিও পয়সা নেই। অবশেষে তিনি বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে ক'ল্‌কাতা রওনা হওয়ার ব্যবস্থা ক'র্‌লেন।

খবরটা ছড়িয়ে প'ড়্‌লো। অফিসের বন্ধু-বান্ধবের দল, তাঁকে একটি ভোজ দিয়ে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানালেন। তার কয়েকদিন পরেই তিনিই সস্ত্রীক জাহাজে উঠে ব'স্‌লেন (১১ই এপ্রিল, ১৯১৬)।

ক'লকাতায় ফিরে এসে তিনি সস্ত্রীক বাজেশিবপুরে বাসা ভাড়া ক'রে বসবাস শুরু কর্‌লেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর "পল্লীসমাজ", "চন্দ্রনাথ", প্রকাশিত হ'য়েছিল। তিনি ফিরে এলে পর "বৈকুণ্ঠের উইল" ও"অরক্ষণীয়া" প্রকাশিত হ'ল। দেশবাসী তাঁর এই এক একটি দানকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'র্‌লো। অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপন্যাসিক হিসাবে দেশ-বিদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে প'ড়্‌লো।

ক'লকাতায় ফিরে আসার পূর্ব্বে তাঁর "বড়দিদি," "বিরাজ বৌ," "বিন্দুর ছেলে," "পরিণীতা," "পণ্ডিতমশাই" ও "মেজদিদি" তাঁকে পাঠকমহলে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যিক হিসাবে সু-প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিল।

তাঁর ক'ল্‌কাতায় বসবাসের সংবাদ পেয়ে ভক্তের দল দেশ-বিদেশ থেকে দেখা করার আশায় ছুটে আস্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লো।

শরৎচন্দ্র এতখানি সৌভাগ্যের আশা করেননি। অথচ যখন সেই

সৌভাগ্য তাঁর দ্বারে এসে ধরা দিল, তখন তিনি দিশেহারা হ'য়ে প'ড়্‌লেন না। বরং তাঁর লেখনীকে তিনি আরও সংযত ক'রে তুল্‌তে চেষ্টা ক'র্‌লেন। ধীরে ধীরে ঢেলে সাজালেন—"চরিত্রহীন," "নিষ্কৃতি" ও "কাশীনাথ"।

সেই সময় হিরণ্ময়ী দেবীর শরীর খারাপ হ'ল। তিনি সপরিবারে বায়ু পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে কাশীতে যাত্রা ক'র্‌লেন। প্রায় তিন মাস বসবাসের পর ফিরে এলেন শিবপুরে। বেরুলো, "শ্রীকান্ত, ১ম পাঠ," "দেবদাস," "নিষ্কৃতি," "কাশীনাথ" ও "চরিত্রহীন"।

* * *

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর সাহিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হ'য়ে একদিন তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। পরিচয়ের প্রথম পর্ব্ব শেষ হ'লে, তিনি তাঁর পত্রিকার জন্য একটি গল্প লেখার অনুরোধ জানালেন।

শরৎচন্দ্র তার কয়েকদিন পরে "স্বামী" গল্পটি লিখে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দেশবন্ধু গল্পটি প'ড়ে এতই মুগ্ধ হ'লেন যে, তাঁকে একটি ব্ল্যাঙ্ক চেক পাঠিয়ে দিলেন। শরৎচন্দ্র সবিস্ময়ে তাঁর কাছে চেক্‌টি পুনরায় ফেরৎ পাঠালেন। উত্তরে দেশবন্ধু জানালেন—এ ভুল তাঁর স্বেচ্ছাকৃত, এবং ইচ্ছা ক'রেই তিনি ব্ল্যাঙ্ক চেক পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর পারিশ্রমিক তিনি যেন খুশীমত বসিয়ে চেক্‌টি ভাঙিয়ে নেন।

শরৎচন্দ্র একটি শতটাকার অঙ্ক বসিয়ে চেক্ ভাঙালেন। দেশবন্ধু, তাঁর এই সততায় শুধু মুগ্ধ হ'লেন না—বন্ধুত্ব প্রার্থী হ'লেন!

আত্মপ্রকাশ ক'রলো "স্বামী," "দত্তা" ও "শ্রীকান্ত—দ্বিতীয় পর্ব্ব"।

"বসুমতীর" সঙ্গে চুক্তি হ'ল: গ্রন্থাবলীরূপে তাঁর রচনা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ ক'র্‌বেন তাঁরা। অক্টোবরে বেরুলো গ্রন্থাবলী—১ম খণ্ড; ছবি (জানুয়ারী ১৯২০); গ্রন্থাবলী—২য় খণ্ড; গৃহদাহ (মার্চ ১৯২০); গ্রন্থাবলী—৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড; 'বামুনের মেয়ে' ও 'নারীর মূল্য'।

আশুতোষবাবু (মুখোপাধ্যায়) তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'লেন। তাঁকে জগত্তারিণী পদকে ভূষিত ক'রলেন (১৯২৩)। "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় তারপর ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হ'ল 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' ও 'পথের দাবী'। এপাশে বেরুলো : 'দেনাপাওনা' ও 'নববিধান'। সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল তাঁর দিকে। [নারীর মূল্য, চন্দ্রনাথ, চরিত্রহীন, পথনির্দ্দেশ, পরিণীতা ও নিষ্কৃতি প্রথম প্রকাশ ক'রেছিলেন এম. সি. সরকার এণ্ড সন্সের সত্বাধিকারী শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়।]

* * * *

এর পূর্ব্বে চরকা আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। নিজের হাতে সুতো কেটে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে একটি চাদরও উপহার দিয়েছিলেন কিন্তু রাজনীতি আন্দোলনে প্রত্যক্ষ যোগ দেবেন কি না তখনও স্থির ক'রে উঠ্‌তে পারেননি। তাই সুরেনমামাকে (গাঙ্গুলি) জিজ্ঞাসা ক'রলেন, কাজটা কি ঠিক্ হ'চ্ছে ?

সুরেনবাবু উত্তর দিলেন, সাহিত্য নিছক্ সখ নয় শরৎ, ওটাও একটা দেশের কাজ। আমার মনে হয়, এর দ্বারাই তুমি ভাল দেশের কাজ ক'রতে পারবে।

শরৎচন্দ্র উৎসাহভরে ব'লে উঠ্‌লেন, ঠিক ব'লেছো মামা! যার যা' কাজ, নিষ্ঠাভরে সম্পাদন ক'রলেই দেশের সেবা করা হয়। তোমার তাঁতশালা চ'লছে কেমন ? [এই তাঁতশালা তাঁরই উৎসাহ ও অর্থ সাহায্যে সুরেনবাবু তখন পরিচালনা ক'রছিলেন এবং এইখানেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে উপহার-দত্ত চাদরটি বোনা হ'য়েছিল।]

সুরেনবাবু সহাস্যে উত্তর দিলেন—তুমি যতক্ষণ আছো পাশে, ততক্ষণ কাজ ভাল ক'রেই চ'লবে—যদি স'রে যাও তখনই প'ড়্‌বো বিপদে।

* * *

পীড়িত দেশবাসীর দুঃখে ব্যথিত হ'য়েই তিনি প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগদান ক'র্লেন। অথচ তাঁর স্বভাবটা এরূপ যে, যখন যে কাজে মেতে থাকেন, সেটাই প্রাধান্যলাভ করে, ভুলে যান অন্যকথা! তাই তাঁর লেখনীও প্রায় স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়্লো।

প্রকাশক হরিদাসবাবুর তরফ থেকে জলধরদা (সেন) তাঁর বাড়ীতে গিয়ে ধন্না দিতে সুরু ক'র্লেন। সখেদে জানালেন, তুমি কি আমায় পথে বসাবে শরৎ?

শরৎচন্দ্র তাঁর কথাটির প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ ক'র্লেন না, তা নয়—বরং আশ্বাস দিলেন, আচ্ছা যান, পাঠিয়ে দেবো। কখনও বা ব'লেন—কাল বরং একবার আস্বেন—সব ঠিক্ ক'রে রাখ্বোখন!

জলধরদা আশ্বস্ত হ'য়ে বাসায় ফিরে এলেন।

* * *

শরৎচন্দ্র ভুলে গেলেন সে কথা।

পরদিন জলধরদা পুনরায় আবার তাগিদ দিলেন, কই শরৎ?

শরৎচন্দ্র সচকিত হ'য়ে উঠ্লেন। ব'ল্লেন—আচ্ছা,—আচ্ছা, কাল হ'বেখন!

জলধরদা মিনতিভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—আবার ভুলে যাবে না ত'?

শরৎচন্দ্র মিষ্টি মধুর হাস্লেন। ব'ল্লেন, না—না, জলধরদা, ভুল আমার হয় না। তবে কি জানেন? বড়ো কুঁড়ে হ'য়ে গেছি, কাজে ঠিক্ মন বসাতে পারিনে।

জলধরদা' চলে যাওয়ার পর সন্ধ্যায় ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে লিখ্তে ব'স্লেন। কলম আর চ'লে না। একটা জিনিষ বার বার লেখেন—আবার কাটেন। শেষে পাতাটা মুড়ে ফেলে দেন ওয়েষ্ট পেপার বক্সে।

বিরক্ত হ'য়ে উঠে প'ড়্লেন। মন যখন চায় না—তখন মিথ্যা কালি-কলমের অপব্যবহার ক'রে লাভ কি?

* * *

হরিদাসবাবু স্বয়ং হাজির হ'লেন পরদিন। শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—আজও লেখা তৈরী হয়নি ঠিক্মত।

কিন্তু এ পাশে যে আধখানা কম্পোজ হ'য়ে ব'সে আছে, শরৎদা!

কি করি বলো, কলম যে চলে না?

সে কি কথা, দাদা? মুখে এত সুন্দর গল্প করেন—আর কলম আপনার চ'ল্ছে না—এ কথা কি কেউ বিশ্বাস ক'র্তে পারে?

শরৎচন্দ্র মৃদু হাসলেন। ব'ল্লেন—তোমার মুখেও সেই এককথা! সেদিন একজন ঠিক এই কথাই ব'ল্ছিল—আপনার কাছে গল্পের প্লট শুন্তে আসি। কিন্তু আমার প্লটে কাজ হয় না হরিদাস, আমি আঁকি চরিত্র! সেই চরিত্রই তৈরী ক'রে দেয় তোমাদের গল্প।

হরিদাসবাবু সবিস্ময়ে শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে তাকালেন। শরৎচন্দ্র মৃদু হাস্লেন। ব'ল্লেন—ব'সো হরিদাস, চা পাঠিয়ে দিচ্ছি!

পরম তৃপ্তির সঙ্গে চা-পান শেষ ক'রে হরিদাসবাবু চুপচাপ্ চেয়ারটায় ব'সে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র ফিরে এলেন। হরিদাসবাবুকে ব'সে থাকতে দেখে ব'ল্লেন—তুমি এখনও ব'সে আছো হরিদাস? হরিদাসবাবু ব'ল্লেন—আজ লেখা না নিয়ে গেলে, কোন উপায়ই থাক্বে না দাদা!

শরৎচন্দ্র সচকিত হ'য়ে উঠ্লেন। ব'ল্লেন, বলো কি? কাজ একেবারে অচল?

হরিদাসবাবু হাস্লেন। ব'ল্লেন, বিশ্বাস করুন দাদা। আজ যদি কিছু একটা না দেন, মানসম্ভ্রম সব খোয়াতে হবে!

শরৎচন্দ্রের আত্মসম্ভ্রম বোধ ছিল প্রবল। তাই সহসা কারও সম্ভ্রম তিনি নষ্ট ক'র্তে চাইতেন না। ব'ল্লেন, আচ্ছা, একটু ব'সো। দেখি, তোমার জন্যে কতদূর কি ক'র্তে পারি!

শরৎচন্দ্র ঢুক্লেন লেখার ঘরে। পেগ দুই 'এক্স' এক নম্বর পর পর গলধঃকরণ ক'রে ধ'র্লেন লেখনী।

তন্ময়তার মধ্যে তাঁর কেটে গেল দু'টি ঘণ্টা! তারপর এলেন বেরিয়ে। পাতা তিন-চার হরিদাসবাবুর হাতে দিয়ে ব'ল্লেন—এখন আপাততঃ এই নিয়েই কাজ চালাও হরিদাস, পরে সময়মত বরং এটুকু শেষ ক'রে রাখ্বো।

হরিদাসবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠ্লো। ব'ল্লেন, সে সৌভাগ্য কি আমার হ'বে দাদা?

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন, হবে বৈকি ভাই, সব হ'বে! বোঝত—একে বুড়ো মানুষ, তার উপর পাঁচজনের মত কলম চালাতেও শিখিনি। মনের আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে সংযত রেখেই আমায় যে কাজ সুরু ক'র্তে হয় ভাই! তাই ত বলি, তোমারা তাগিদ দিয়ে ও-কাজটা আদায় ক'রে নিয়ো সময় মত।

* * * *

সুরেনবাবু ভাগলপুর থেকে রাতে ফির্লেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি, কারণ তখন তিনি লেখায় ছিলেন মগ্ন। ইচ্ছা ক'রেই তিনি বিশ্রাম নিতে চ'লে গেলেন।

পরদিন সকালে সুরেনবাবু লেখার ঘরে ঢুকে বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে প'ড়্লেন। টেবিলের উপর ডজনখানেক বোতল ইতস্ততঃ ছড়ানো। সোডা ও 'এক্স'এর বোতল। ব'ল্লেন, এত বোতল কেন, শরৎ?

শরৎচন্দ্র গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, কাল "গৃহদাহ" শেষ হ'ল কি না!

সুরেনবাবু হেসে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, তা হ'লে তুমিও এদের দাহ ক'রেছো ব'লো?

শরৎচন্দ্র তেমনি মধুর হাসি হেসে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, মদ না খেলে কি লেখা ভাল খুলে সুরেন? তোমরা কেউ ওটা ত খেলে না, তাই আমার শিষ্য হ'য়েও ঠিক সুনামটা আমার বজায় রাখ্‌তে পার্‌লে না।

উত্তরে সুরেনবাবু হাস্‌লেন। ব'ললেন, তা যা ব'লেছো? শুক্নারা বিদ্যেটা সত্যই অপূর্ণ র'য়ে গেল!

কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। শরৎচন্দ্র নিজেই বোতলগুলো নীচে সাজিয়ে রাখ্‌তে সুরু ক'র্‌লেন।

সুরেনবাবু সহসা মুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন—দেখ শরৎ, এর প্রতিক্রিয়াটা সম্বন্ধেও তোমার সচেতন থাকা উচিত।

উত্তরে শরৎচন্দ্র মৃদু হাস্‌লেন। পরমুহূর্তে গম্ভীর হ'য়ে উঠে ব'ল্‌লেন, তোমরা বিশ্বাস ক'র্‌বে কিনা জানি না, কিন্তু জীবনে যাদের আমি দেখেছি, গভীর ক'রে মিশেছি, নেশায় বিভোর হ'লে, তাদেরই সুখদুঃখের, হাসি-কান্নার চিত্র চোখের পর্দ্দায় আমার স্পষ্টতর হ'য়ে ওঠে। আমি আত্মভোলা হ'য়ে দেখি সেই চিত্র—আর ব'সে বসে আঁকি সেই চিত্রেরই প্রতিচ্ছবি! বুঝ্‌লে সুরেন, এটা আমার বিলাস নয়—করি আমি সাধনা।

[শরৎ-পরিচয়—সু. না. গ., পৃঃ ১৭৫-৭৬]

মহাত্মা গান্ধীর নন্-কো-অপারেশন আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। দেশবন্ধুর ডাকে শরৎচন্দ্র সে আন্দোলন সমর্থন ক'রে কংগ্রেসে যোগদান ক'র্‌লেন। হাওড়া জিলা কংগ্রেস পরিচালনার ভার প'ড়্‌লো তাঁর উপর। নির্বাচিত হ'লেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য। দেশবন্ধুর বাড়ী, নির্ম্মলচন্দ্র ম'শায়ের বাড়ী ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্যালয় হ'ল তাঁর কর্ম্মকেন্দ্র।

কংগ্রেসে তিনি যোগ দিলেন বটে, কিন্তু সমস্ত প্রোগ্রাম তিনি মনে-প্রাণে মেনে নিতে পার্‌লেন না। খদ্দর প'র্‌লেন ডিসিপ্লিন্ হিসাবে। আস্থা ছিল বিলাতী দ্রব্য বয়কটের ওপরে। খেতাব বয়কটের প্রোগ্রামটিও ছিল তাঁর মনঃপূত। কিন্তু চর্‌কা কেটে দেশ উদ্ধারের স্বপ্নে তিনি মোটেই আস্থাশীল ছিলেন না।

১৯১৫ সালে ভারত সম্রাটের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ "নাইট" উপাধি লাভ ক'রেছিলেন। ১৯১৯-এর ৩০শে মে, তিনি পাঞ্জাবের হাঙ্গামা ও জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারে, সেই উপাধি বর্জ্জন ক'র্‌লেন। শরৎচন্দ্র খুশী হ'লেন সকলের চেয়ে বেশী। ব'ল্‌লেন— "কবি মুখ রেখেছেন সমস্ত বাঙ্গালাদেশের। নন্‌-কো-অপারেশন আন্দোলনে তাঁর আস্থা নেই সত্য, কিন্তু দেশের ব্যথা ও অবমাননায় বিচলিত হ'য়ে নিতান্ত তুচ্ছবস্তুর মত সমস্ত উপাধি ত্যাগ ক'রে শুধু নিজেকে নয়, আমাদের সবাইকে মহিমান্বিত ক'রেছেন।"

প্রফুল্লচন্দ্রের মত নিরলস কর্ম্মী ও আদর্শ দেশপ্রেমিক যখন খেতাবের মোহ ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌লেন না—তখন তাঁর দুঃখের সীমা রইলো না। ব'ল্‌লেন, "চাঁদেও কলঙ্ক র'য়ে গেল। ওঁর উচিত ছিল 'স্যার' টাইটেল্‌টা ত্যাগ করা। ওঁর মত অত বড় পেট্রিয়ট্ যে টাইটেল্‌টা ছাড়্‌লেন না, এর ব্যথা আমার মন থেকে কিছুতেই যায় না।..."

* * * *

মেয়েরাও স্বরাজ আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়াতে চাইলেন। সমস্যায় প'ড়্‌লেন দেশবন্ধু। ব'ল্‌লেন—"শরৎবাবু, এই ভার আপনাকে দিলুম, মেয়েদের কাজ ক'র্‌বার স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ক'র্‌তে হবে, তার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করুন।" শরৎচন্দ্র পশ্চাৎপদ হলেন না, বরং তাঁরই নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবানীপুরে 'নারী কর্ম্ম-মন্দির'

স্থাপন করা হ'ল। ব'ল্লেন, "যুগ যুগ ধ'রে যারা একলা বাড়ীর উঠানের বাইরে যায়নি, রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘর ছাড়া—যাদের জন্য সমাজ আর কোন কর্ম্মক্ষেত্র রাখেনি, তাদের ভেতর থেকে আজ হাজারে হাজারে স্বাধীনতার সৈনিক কোথা থেকে আস্‌বে? কিন্তু পাঁকেই পদ্মফুল জন্মায়! তাই দেশের অন্তঃপুর থেকে এরাও গজিয়ে উঠেছে!..."

সন্দেহ দানা বাঁধ্‌লো: ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা একযোগে দেশের কাজে নাম্‌লে কিছু দুর্নীতি আমদানী হওয়ার আশঙ্কা আছে কি না? শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন—"পান থেকে যদি একটু চুণ খসেই যায়—সেটা বড় কথা নয়! মশাল জ্বল্‌ছে—তার দীপ্তিতে অন্ধকার প্রান্তর উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে, সেটাই বড় কথা—তার পোড়া ন্যাক্‌ড়া থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে কিনা—সে প্রশ্নটা একান্তই অবান্তর! বন্যার পলিমাটি পেয়ে মাঠ উর্ব্বর হ'ল,—সেটাই লাভের বস্তু—কোথায় ময়লা ভেসে এলো, কোথায় বা দুটো ইঁদুর ম'রে প'চে রইলো—তার জন্যে আমার কোন ক্ষোভ নেই!..."

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে স্পেশাল কংগ্রেসের অধিবেশন ব'স্‌লো। Govt. & Govt.-aided স্কুল-কলেজ বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

ডিসেম্বরে পুনরায় নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। সভাপতি হ'লেন বিজয় রাঘবাচারীয়ার। ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজ ত্যাগের ডাক দেওয়া হ'ল—সাড়াও পাওয়া গেল সেই সঙ্গে। জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি (১৯২১) দেশবন্ধু বাংলার ছেলেমেয়েদের স্কুল বর্জ্জনের ডাক দিলেন। ফরবীজ ম্যানসনে "গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যায়তন" নামে জাতীয় কলেজ স্থাপন করা হ'ল। প্রিন্সিপ্যাল্ হ'লেন সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্রও নিলেন অধ্যাপনার ভার। কিন্তু বিরোধ বাঁধ্‌লো—

আশুবাবু (মুখোপাধ্যায়) ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। শেষ পর্য্যন্ত আশুবাবু দেশবন্ধুর কাছে হার স্বীকার ক'র্‌লেন—সে স্রোতকে ঠেকাতে পার্‌লেন না!—শরৎচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ জানালেন। [শরৎ-চন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তিনবার সংঘর্ষ বাঁধে। প্রথম—'শিক্ষা বিরোধ,' দ্বিতীয়, মৌন সংঘর্ষ ১৯২৬-২৭-এ 'পথের দাবী' নিয়ে। যখন সরকার "পথের দাবী" বাজেয়াপ্ত করেন, তখন তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদ ক'র্‌তে অনুরোধ জানালেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা' লিখেছিলেন—তা' শরৎচন্দ্রের মনঃপুত হয়নি। তৃতীয়, বিচিত্রায় তরুণ সাহিত্যিকদের নিয়ে।]

সুরু হ'ল পিকেটিং। বড়বাজারে বাসন্তীদেবী গ্রেপ্তার হ'লেন। দাবানলের মত সে সংবাদ শহরের সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে প'ড়্‌লো। দলে দলে লোক কংগ্রেস অফিসে গ্রেপ্তার বরণের জন্য ভলেণ্টিয়ার তালিকায় নাম লেখাতে সুরু ক'র্‌লো। শরৎচন্দ্র সে দৃশ্য দেখে কিন্তু মোটেই খুশী হ'তে পার্‌লেন না। কথায় কথায় একদিন দেশবন্ধুকে ব'ল্‌লেন—এই সব জেল যাওয়াকে আমি বীরত্বের আখ্যা দিতে পারি না!

দেশবন্ধু বিস্মিত হ'লেন! জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—কি ব'ল্‌লেন শরৎবাবু? নিরস্ত্র নিরীহ লোকেদের এই নৃশংসভাবে ঠেঙিয়ে জেলে নিয়ে যাওয়াটাই কি তবে বীরত্ব?

উত্তরে শরৎচন্দ্র ধীরকণ্ঠে জবাব দিলেন—আমার স্থির বিশ্বাস—আপনাদের এই নন্‌-কো-অপারেশনে দেশের স্বাধীনতা কোনদিনই আনা সম্ভব হবে না! তার কারণ কি জানেন?

দেশবন্ধু তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতেই ব'ল্‌লেন, ভারতবর্ষ আজ বিশ্বের দুয়ারে কিন্নরী-অপ্সরী! তাকে দোহন করার উদ্দেশ্যেই একদিন পাঠান ও মোগল-দস্যুদল হানা দিয়েছিল। আর আজ পাশ্চাত্য সভ্য সমাজ, সেই দস্যুর স্থান নতুন ক'রে অধিকার ক'রে দোহনের ষড়যন্ত্র এঁটে চ'লেছে।

একটু থেমে ব'ল্লেন, আপনারা বিশ্বাস ক'রবেন কিনা জানি না, তবে আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে—এই অপ্সরীকে দোহনের উদ্দেশ্যেই ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠেছিল। যতদিন না এই কিন্নরী স্বাধীন ওরফে স্বাবলম্বী হ'য়ে উঠ্‌তে পারে—ততদিন পর পর একটা না একটা মহাযুদ্ধের সূচনা হ'বেই হ'বে। এটাই হ'ল ইউরোপের ভাগ্যলিপি—আর আমাদের ভাঙা হাটের 'কুঁড়েঘর লুটে'র হবে বিচিত্র ইতিহাস।

দেশবন্ধু সে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে ব'ল্লেন—যারা নিরস্ত্র —এছাড়াও ত মুক্তির দ্বিতীয় পথ তাদের জন্যে খোলা নেই, শরৎবাবু!

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—নেই তা' নয় দেশবন্ধু—মাঝপথে সহসা থেমে প'ড়ে ব'ল্লেন—ন্যায়ই হোক—আর অন্যায়ই হোক, যে পথ আমরা একবার বেছে নিয়েছি—তার সমালোচনা ক'রে লাভ নেই। বরং চেষ্টা ক'রেই দেখ্‌তে হবে, রুদ্ধ দ্বারের আগল খোলা যায় কিনা!

* * * *

১৯২১সালে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সকে পাঠানো হ'ল ভারত ভ্রমণ ক'রতে। উদ্দেশ্য: উজ্জ্বল নানা আশা ও মনোমত তুষ্টবাণী বর্ষণ ক'রে জাতীয় আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করা। কিন্তু কংগ্রেস ঝটিতি এক প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের অভ্যর্থনা আয়োজন বয়্‌কট্‌ করার নির্দ্দেশ দিলেন।

১৭ই নভেম্বর তিনি বোম্বাইয়ে এসে পৌঁছ্‌লেন। জনসাধারণ অভ্যর্থনা উৎসব বয়কট ক'রলেন। যারা অভ্যর্থনায় যোগ দিল, তাদের জনসাধারণ আক্রমণ সুরু ক'রলেন।

২৪শে ডিসেম্বর, প্রিন্স ক'ল্‌কাতায় এলেন। ক'ল্‌কাতায় দেশবন্ধুর

ভাকে পূর্ণ হরতাল পালন করা হ'ল। ফলে, গভর্ণমেণ্ট কঠোর দমননীতি আরম্ভ ক'র্‌লেন। মতিলাল, লালা লাজপত রায়, দেশবন্ধু, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতারা কারারুদ্ধ হ'লেন।

'গ্রেপ্তারে হিড়িক্‌। ভক্তের দল শরৎচন্দ্রকে ব'ল্‌লেন—এবার আপনার পালা!

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—আফিম খেতে দেয়?

আজ্ঞে না।

তামাক?

তাও না—

তবে বাপু জেলে যাওয়া আমার হবে না!

সে কি কথা?

আরে দূর দূর। দেখ্‌ছি ওটা মোটেই ভদ্রলোকের জায়গা নয়! ও আমার পোষাবে না! গুলি যদি চ'লে, তার মুখে দাঁড়াতে পারি, কিন্তু ঐ ভেড়ার গোয়ালে ব'সে কড়িকাঠ গুণে মাসের পর মাস কাটানো আমার দ্বারা সম্ভবপর নয়। তবে, হ্যাঁ—কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে যদি এমনি ধ'রে নিয়ে যায়—যাবো—কিন্তু জেলে যাবার জন্য জেলে যাবো না!'

* * * *

ডিসেম্বরের শেষে আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন ব'স্‌লো। সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'লেন দেশবন্ধু। তখন তিনি জেলে। সভাপতিত্ব ক'র্‌লেন হাকিম আজমল খাঁ। অসহযোগ প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করা হ'ল। গান্ধীজীকে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হ'ল। স্থির হ'ল: গুজরাটের বারদৌলী তালুকে প্রথম খাজনা বন্ধ করা হবে। পরে সারা ভারতে এই আন্দোলন ব্যাপ্ত করা হ'বে।

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গোরক্ষপুর জেলায় চৌরীচৌরা

গ্রামে থানার পাশে জনসাধারণের সঙ্গে কনষ্টেবলদের প্রথমে বচসা সুরু হ'ল। পরে চ'ল্‌লো গুলি—মিছিলকারীরা পাল্টা আক্রমণ ক'র্‌লো। থানায় আগুন দেওয়া হ'ল। সিপাহীদের কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে সেই আগুনে নিক্ষেপ ক'র্‌লো।

এ সংবাদ পেয়ে গান্ধীজী মর্ম্মাহত হ'লেন। বুঝ্‌লেন, সম্পূর্ণভাবে অহিংস আন্দোলন চালানোর মত শক্তি ভারত এখনও সঞ্চয় করেনি। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রায়োপবেশন ক'র্‌লেন পাঁচদিন। ১১ই ফেব্রুয়ারী বারদৌলীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডেকে, সেই আন্দোলন বন্ধের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন। এ প্রস্তাবটি 'বারদৌলী হল্ট' নামে খ্যাত। সহসা আন্দোলন বন্ধের ফলে লোকের মন একেবারে ভেঙে প'ড়্‌লো—প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'ল। মহাত্মাজীও সর্ব্বপ্রথম বন্দী হ'লেন (১০ই মার্চ্চ, ১৯২২)

শরৎচন্দ্র মনে মনে ক্ষুব্ধ হ'লেন। ব'ল্‌লেন—"মহাত্মাজী ভয়ানক ভুল ক'র্‌লেন। এ অবস্থায় আন্দোলনকে স্থগিত রাখা মানে, টুঁটি টিঁপে আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটানো। 'মাস রেভোলিউশান' একেবারেই নষ্ট হ'য়ে গেল। এ মুভ্‌মেণ্ট আর রিভাইভ্‌ ক'র্‌বে না।"

শরৎচন্দ্র তখন প্রায় নিঃসঙ্গ। মানসিক যন্ত্রণায় অধীর হ'য়ে ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছেন। দেশবন্ধু জেলে, সুভাষচন্দ্র বন্দী। সহকর্ম্মী এমন কেউ বাইরে নেই, যাদের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা ব'লে মনের জ্বালা বিদূরণ ক'র্‌তে পারেন। মাঝে মাঝে যাঁরা দেখা ক'র্‌তে যেতেন, তাঁদের কাছেই তিনি মনের জ্বালা প্রকাশ ক'র্‌তেন। একদিন কথায় কথায় ব'ল্‌লেন, "ভেবে দেখেছো কি, কত বড় অন্যায় ক'র্‌লেন মহাত্মাজী! গোটাকতক কনষ্টেবল 'ইন্‌ফিউরিয়েটেড্‌ মব'-এর হাতে পুড়ে মরেছে—তাতে হ'য়েছে কি? তার জন্যে সারা ভারতের আন্দোলন বন্ধ ক'র্‌তে হবে? বিরাট এই দেশের মুক্তি-যজ্ঞে রক্তপাত হ'বে না? এরা বলে কি? রক্তের গঙ্গা ব'য়ে যাবে

চারিদিকে—তবেই ত সেই শোণিত-প্রবাহের মাঝে ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল! এতে দুঃখ কিসের? ক্ষোভ কিসের? অনুতাপেরই বা আছে কি? এটা ওঁরা বুঝ্‌লেন না—'নন ভায়ওলেন্স খুব নোবল্ আইডিয়া' কিন্তু 'এ্যাচিভ্‌মেণ্ট অব্‌ ফ্রিডম ইজ্‌ নোব্‌লার্—হানড্রেড টাইমস নোব্‌লার্…'

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২২, দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা আহ্বান ক'রে ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের রেজলিউশন্ অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হ'ল। কিন্তু মতভেদ দেখা দিল। ভোটের জোরে 'বারদৌলী প্রস্তাব' অনুমোদিত হ'ল বটে, কর্ম্মীদের মনের বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ধূমায়িত হ'তে লাগ্‌লো। তাই ৭ই জুন তারিখে, পুনরায় যখন লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল, বহু সদস্য 'আইন অমান্য আন্দোলন' পুনঃপ্রবর্ত্তন করার জন্য জিদ্ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। তখন 'আইন অমান্য অনুসন্ধান কমিটি' নামে একটি সাব্‌ কমিটি গঠন ক'রে তাঁদের ওপরে প্রতিটি প্রদেশ ভ্রমণ ও অনুসন্ধান ক'রে রিপোর্ট প্রদানের ভার অর্পণ করা হ'ল।

কমিটি যখন অনুসন্ধান-কাজে ব্যাপৃত, দেশবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তিলাভ ক'র্‌লেন। তিনি ফিরে এসেই কংগ্রেসের আন্দোলনকে নোতুন রূপ দেবার জন্যে কাউন্সিল প্রবেশের পরিকল্পনা উপস্থিত ক'র্‌লেন। গয়া কংগ্রেসে তিনি পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'লেন। কিন্তু যখন তিনি কাউন্সিল প্রবেশের প্রোগ্রাম উপস্থাপিত ক'র্‌লেন, অপ্রত্যাশিত এক ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হ'ল। দেশবন্ধু অনেক বোঝালেন, কিন্তু অনেকেই তাঁকে ভ্রান্ত মনে ক'র্‌লো।

শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ালেন। উৎসাহ দিলেন—"কিছু

ভাব্‌বেন না আপনি! এই ত আপনার পথ। যে সত্য আপনি একান্তমনে উপলব্ধি ক'রেছেন, নিঃসঙ্কোচে তা'কে প্রচার করুন!"

দেশবন্ধু ব'ল্‌লেন—"সবাই যে বিপক্ষে শরৎবাবু?"

উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—"হোক্‌ বিপক্ষে! সকলের মত তো আপনার জন্য নয়। বরং আপনার মত সকলের! বুঝেছেন, সত্যের বাণী প্রথমে কেউ কানে তুলে না! তাই সতীদাহ বন্ধ ক'র্‌তে গিয়ে রামমোহনকে দুর্নাম কিন্‌তে হ'য়েছিল, বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্যে বিদ্যাসাগরকে অপদস্থ হ'তে হ'য়েছিল। আপনাকেও ভুল বুঝ্‌বে কিন্তু শুন্‌বে—কাল না হয় পরশু—পার্থক্য যা এখানেই!"

গয়া কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে দেশবন্ধু 'কাউন্সিল প্রবেশ' প্রোগ্রাম উপস্থাপিত ক'র্‌লেন। ঝড় উঠ্‌লো। নো-চেঞ্জারদের মুখপাত্র ও নেতা হ'য়ে রাজাগোপালাচারী দেশবন্ধুকে পরাজিত ক'র্‌লেন।

দেশবন্ধু পরাজিত হ'লেন কিন্তু জিদ্‌ তাঁর বেড়ে গেল। ব'ল্‌লেন, "আমি জিত্‌বোই! দেশ আমার প্রোগ্রাম নেবেই!"

শরৎচন্দ্র তাঁর সঙ্গে একমত। ব'ল্‌লেন, "নিশ্চয় জিত্‌বেন? ভাল ক'রে প্রচার করুন, লোকে প্রোগ্রাম আপনার নিশ্চয় নেবে—নিশ্চয় বুঝ্‌বে!"

বরিশালে বি. পি. সি. সি.'র অধিবেশন হ'ল, সেখানেও প্রবল বাধা পেলেন দেশবন্ধু। ভ্রমণ সুরু ক'র্‌লেন প্রতিটি প্রদেশে।

ন'মাস পরে দিল্লী স্পেশাল কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে, দেশবন্ধুর নীতি অনুমোদিত হ'ল। গঠন ক'র্‌লেন 'স্বরাজ্য-দল'। মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায়, বিঠলভাই প্যাটেল, এম. আর. জয়াকর, তরুণরাম ফুকন, শ্রীনিবাস অয়েঙ্গার ইত্যাদি প্রতিপত্তিশালী নেতারা তাঁর দলে যোগ দিলেন। কাউন্সিল নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে প্রস্তুত হ'লেন। কিন্তু প্রচণ্ড বাধা পেলেন বাংলাদেশ থেকেই।

প্রবল দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনার মধ্যে ইলেক্‌সন শেষ হ'ল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর দল পরাজিত হ'লেন। সেই সময়ে দেশবন্ধুকে দুই ব্যক্তি প্রাণপণে সাহায্য ক'রেছিলেন। এক—শরৎচন্দ্র, দ্বিতীয়—সুভাষচন্দ্র। অথচ দু'জনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ালেন। শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, "'দুর দুর, সে কি কখনও হয়? আমি সামান্য গ্রন্থকার, কাউন্সিল ইলেক্‌শনে দাঁড়াবার যোগ্য? লোকে ব'ল্‌বে কি? জেলে যাইনি, ওকালতী-ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিনি, দেশের জন্যে কোন নির্য্যাতন বরণ করিনি—এরপরও কি লোকে ভোট দেবে? তাছাড়া নিজের সাহিত্য-সাধনাকে আমি রাজনীতির মূলধন ক'র্‌তে চাই না!"

আর সুভাষচন্দ্র একবারে নীরব। নীরবে কর্ম্মসাধনাই তিনি ক'র্‌তে চান! বাইরের যত কাজ দেখেন সুভাষচন্দ্র, আর ভেতরের যত কাজ, মায় প্রেস রিপোর্ট থেকে বিবৃতিটি পর্য্যন্ত রচনা ক'রে দিতে লাগ্‌লেন শরৎচন্দ্র!

এই সময়ে "পথের দাবী" বঙ্গবাণীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'তে সুরু ক'র্‌লো। যুবক দল আকৃষ্ট হ'ল।

অনেকে আবার সব্যসাচীর অবলম্বিত পথকেই দেশমাতৃকার একমাত্র মুক্তির পথ ব'লেও মেনে নিয়েছিল। ফলে, এনার্কিষ্টপার্টির যোগাযোগটা অধিকতর ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌লো। তাদেরই মারফৎ তিনি গোপনে অর্থ সাহায্য ক'র্‌তে সুরু ক'র্‌লেন। এই সময় অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস থেকে শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব্বের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করা হ'লো। কিন্তু টেগার্ডসাহেবের শ্যেনদৃষ্টি প'ড়্‌লো তাঁর ওপর। নীলরতন মুখোপাধ্যায় সন্দেহভাজন হ'য়ে নজরবন্দী হ'লেন। ডাঃ কানাই গাঙ্গুলী ও বিপিন গাঙ্গুলীর পিছনে ছুট্‌লো গোয়েন্দা বিভাগ,—পুলিশ গোপন দৃষ্টি রাখ্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লো শরৎচন্দ্রের ওপর।

* * *

যদিও সে-সময় তিনি অহিংস সূতোকাটা কংগ্রেসী, জেলা কমিটির সভাপতি। তবুও সংগ্রহ ক'র্লেন একটি "কোলট রিভলবার।" তাও চোরাইমাল! সকল সময়ে তিনি সেটি সযত্নে পকেটে লুকিয়ে চলা-ফেরা সুরু ক'র্লেন। পোষাকের পরিবর্ত্তন দেখা দিল। পাঞ্জাবী ছেড়ে ধ'র্লেন—গলাবন্ধ চীনা কোট। পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা হ'লেই বাঁ-হাতটি বুক পকেটে ঠেকিয়ে ইঙ্গিত ক'র্লেন—সঙ্গে সঙ্গে অনুচরেরা বুঝে নিলেন, দাদার সাথী আছে পকেটেই!

একদিন একজন অতি উৎসাহী ভক্ত জিজ্ঞাসা ক'র্লেন—আচ্ছা দাদা, ও-বস্তুটি সকল সময়ে সঙ্গে রাখেন কেন?

শরৎচন্দ্র আত্মগোপন ক'র্লেন। তিনি যে বিপ্লবীদলেরই একজন সেকথা বর্ণাক্ষরে প্রকাশ ক'র্লেন না। ব'ল্লেন, ভেলু নেই (শরৎচন্দ্রের প্রিয় সেই কুকুর "ভেলি")—চোর-ডাকাতের হাতে কখন কি হয় বলা তো যায় না!

এর কিছুদিন পরেই তিনি (১৪ জুলাই, ১৯২২) জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব ত্যাগ ক'র্লেন। তখন যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন তা' "আমার কথা" নামে "স্বদেশ ও সাহিত্যে" শোভা বর্দ্ধন ক'রে চ'লেছে।

আবার কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এপাশে বাংলা দেশের কোন বিখ্যাত কংগ্রেসীর তরফ থেকে একখানা গোপনে চিঠি পাঠানো হ'লো গান্ধীজির কাছে। তিনি ছদ্মবেশে অভিযোগ পরীক্ষার আশায় ক'ল্কাতা চ'লে এলেন। উঠ্‌লেন দেশবন্ধুর বাড়ীতে। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ম'শায় তখন বি. পি. সি. সি.-র প্রেসিডেন্ট। মহাত্মাজী সার্ভেন্ট কার্য্যালয়ে চর্‌কা কাট্‌তে চাইলেন।

চর্‌কা আনা হ'ল। কাটাও আরম্ভ হ'ল। মহাত্মাজী নিজেও কিছুক্ষণ চর্‌কা কাট্‌লেন। তারপর কে কি রকম কাট্‌ছে লক্ষ্য ক'রে পরিহাস

ক'র্‌লেন—"Look look, President of the B.P.C.C. is spinning ropes."

কথাটা শুনে সবাই হাস্‌তে সুরু ক'র্‌লেন। শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন, "Nearer the Church remoter from God."

সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজী ব'ল্‌লেন—"But Saratbabu, you have no faith in Charka."

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—"No, not a jot."

"But you spin better than many lovers of Charka."

"I have learnt spinning, because I have love for you, though not for the Charka."

মহাত্মাজী হেসে উঠ্‌লেন—"But why don't you believe that the attainment of Swaraj will be helped by spinning ?'

উত্তরে শরৎচন্দ্রও হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—'No, I don't believe. I think, attainment of Swaraj can only be helped by Soldiers, and not by Spiders."

শরৎচন্দ্রের নির্ভিক উত্তরে মহাত্মাজী ক্ষুব্ধ হ'লেন না বরং উচ্চ হাসিতে ফেটে প'ড়্‌লেন।

* * * *

বাসায় ফিরে এসে আলাপ-আলোচনা পুনরায় সুরু হ'ল। কথা উঠ্‌লো: মহাত্মাজীর সঙ্গে কবে কোন্ বাঙালীর প্রথম আলাপ হ'য়েছিল। কিরণবাবু (কিরণশঙ্কর রায়) ব'ল্‌লেন—ও গৌরবটি কিন্তু আমারই প্রাপ্য। আমি যখন বিলেতে ব্যারিষ্টারী পড়ি, তখন মহাত্মাজী বুয়র যুদ্ধে এ্যাম্বুলেন্স কোরের কাজে বিলেতে এসেছিলেন। তখন ওঁর খেয়াল হ'য়েছিল বাংলা শেখার। আমি সেদিন ওঁর মাষ্টারী ক'রেছিলাম।

দেশবন্ধু সহাস্তে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"তাই নাকি? ছাত্রটিকে কতখানি বাংলা শিখিয়েছিলে কিরণ?"

কিরণবাবু কতকটা অপ্রতিভ হ'য়ে প'ড়্লেন। ব'ল্লেন—"ছাত্রের মেধাটা তেমন ধারালো ছিল না!"

শরৎচন্দ্র মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"Was Kiron your Guru in England?"

মহাত্মাজী মৃদুহাস্যে উত্তর দিলেন—"Yes, he taught me Bengali.'

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন—"That is why you could not learn it!"

সে রসিকতায় সকলেই হাসিতে ফেটে প'ড়্লেন। এমন কি মহাত্মাজীও!...

চ'লেছে ঘরোয়া আলোচনা। কখনও serious বস্তু, কখনও বা লঘু পরিহাস। কথায় কথায় মহাত্মাজী ব'ল্লেন—এদেশের অনেককেই দেখি সন্ত্রাবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু আমার মতে—এ মত ও পথটা অর্থহীন। এতে দেশ-মুক্তির কাজটা আরও শত বছর পিছিয়ে যাবে!

প্রতিবাদ ক'রলেন শরৎচন্দ্র, সেকথাই বা জোর দিয়ে বলেন কেমন ক'রে?

মহাত্মাজী ব'ল্লেন—দু'টো সাহেব মেরে দেশ উদ্ধার করা যায় না। তাতে ক্ষতিই হয় বেশী। একজনকে মার্লে দশজন আস্বে, সেই সঙ্গে দেশবাসীর উপর জুলুমও বাড়্বে দশগুণ। ফলে, মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই দেখা দেবে—মুক্তি আস্বে না কোনদিন।

সহাস্যে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আপনার মতে তাহ'লে অহিংসাই একমাত্র অস্ত্র?

গম্ভীর স্বরে একটু জোর দিয়েই, মহাত্মাজী উত্তর দিলেন—সে-বিষয়ে দ্বিমত আমার নেই! তা'ছাড়া আমি জোর দিয়ে ব'ল্‌তে পারি, সসস্ত্র বিপ্লবে যারা বিশ্বাসী, তারা ভ্রান্ত—আর যারা সন্ত্রাসবাদী তারা দেশের শত্রু।

সহসা উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লেন শরৎচন্দ্র। দেশবন্ধু পাশে ব'সেছিলেন, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। ইঙ্গিত - চুপ করুন, তর্ক এখানে নিষ্প্রয়োজন। ওটা নিছক্ মতবাদ, তার বেশী কোন মূল্য নেই!

শরৎচন্দ্র কিন্তু নিরস্ত হওয়ার লোক নন্। অন্যায়কে কোনদিন সহ্য ক'র্‌তে শেখেননি। সুতরাং এতবড় অপবাদ নীরবে হজম ক'র্‌তে কোনমতেই রাজী হ'লেন না। কারণ তিনি নিজেও যে মনে-প্রাণে বিপ্লববাদী—বিপ্লবে বিশ্বাসী। জানেন, জীবনে বাঁধন ছিঁড়্‌তে হ'লে, বিপ্লবের প্রয়োজন—নইলে মুক্তি সহজে আসে না! ব'ল্‌লেন, আপনার বক্তব্যের পিছনে হয়ত যুক্তি আছে, কিন্তু তাদের শত্রু ব'লে অপবাদ দেবেন না—সে অধিকার আপনারও নেই!

গান্ধীজী জোর দিয়ে ব'ল্‌লেন, সত্যকে সত্য ছাড়া অন্য কিছু ভাব্‌তে আমি শিখিনি! সুতরাং যা' গর্হিত তার নিন্দা ক'র্‌তে এতটুকুও আমি কুণ্ঠা বোধ করিনে। যারা দেশের অগ্রগতি রোধ করে, তাদের শত্রু ছাড়া অন্য কিছু কি ভাবা সম্ভব কোনদিন?

ঘরে থম্‌থমে ভাব। সকলেই নীরব শুধু নয়—এই অবাঞ্ছিত আলোচনায় লজ্জিত ও দুঃখিত। কেবলমাত্র কুতূহলভরা দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সুভাষচন্দ্র! দৃষ্টি তাঁর উজ্জ্বল, চোখ-মুখ লাল—একদৃষ্টে শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে আছেন তিনি তাকিয়ে।

শরৎচন্দ্র বুঝ্‌লেন—একমাত্র সমধর্ম্মী ও সহযাত্রী হ'লেন এই যুবকটি! সুতরাং আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রতিবাদ ক'র্‌লেন—আপনার কথার মর্ম্ম

ঠিক্ উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌লাম না! অগ্রগতি রোধ ব'ল্‌তে আপনি কি বুঝেন? শত্রু শব্দেরই বা অর্থ কি?

প্রকাশ্যে দেশবন্ধু বাধা দিলেন—থামুন্, শরৎবাবু থামুন্—

শরৎচন্দ্র উত্তরে মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, থাম্‌তে আমায় হ'বেই! কিন্তু তার পূর্ব্বে, ও-দুটো কথার অর্থও আমায় ভাল ক'রে বুঝে নিতে হ'বে! দ্বিধা নিয়ে পথ চ'লে লাভ নেই দেশবন্ধু, তাতে সফলতার চেয়ে ব্যর্থতাই দেখা দেয় সকলের চেয়ে বেশী!

বলেন কি? মহাত্মাজী সবিস্ময়ে প্রশ্ন ক'র্‌লেন।

ঠিকই ব'ল্‌ছি! আপনার সঙ্গে মতবিরোধ আমার থাক্‌তে পারে, কিন্তু তা' ব'লে, আপনাকে ত আমি শত্রু ব'লে আখ্যা দিতে পারিনে! আর মতবিরোধই যদি শত্রুতা বোঝায়, তাহ'লে যদি কেউ আপনাকেও শত্রু ব'লে আখ্যা দেয়, আপনারও ব্যক্তিগত আপত্তি থাকা উচিত নয় কি!

এতবড় কথা কি কেউ গান্ধীজীর সাম্‌নে ব'ল্‌তে পেরেছে কোন-দিন? সকলে হতবাক্ হ'য়ে প'ড়্‌লেন। এমন কি গান্ধীজীও।

শরৎচন্দ্র একটু জোর দিয়ে হেসে উঠ্‌লেন। ফলে, সেই গম্ভীর পরিবেশ লঘু হ'য়ে এলো। ব'ল্‌লেন—আমার কথায় কোন অপরাধ নিবেন না মহাত্মাজী। দেশকে আপনি মনেপ্রাণে ভালবাসেন, আমি আর পাঁচজনের মতই জানি এবং শ্রদ্ধাও করি। আর বিপ্লবী অর্থে এই সন্ত্রাসবাদী (এনার্কিষ্ট) দলকেও আমি ঠিক্ তেমনি শ্রদ্ধা করি—কারণ, তারাও দেশকে মনেপ্রাণে ভালবাসে। ভালবাসে বলেই ত জীবনের সবচেয়ে যা কিছু প্রিয়, সবই উৎসর্গ ক'রে দেয় বুলেটের সাম্‌নে! তারা হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে ঝুলে,—প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে—যা আমি বা আপনি পারিনে সহজে। বলুন—আপনিই বলুন—এই যে এদের ত্যাগ, এই যে এদের আদর্শ,—এটা হয়ত

আপনার মতে ভ্রান্ত হ'তে পারে।—কিন্তু দেশের শত্রু এরা হ'ল কেমন ক'রে? যদি তারা ভালই না বাস্‌লো—তবে হাসিমুখে প্রাণ দিল কেন? মৃত্যুর অনুশোচনা—বা গ্লানি ত তাদের মুখের হাসিকে ম্লান ক'রে দিতে পারেনি! আপনিই বলুন—এটা কি তবে আত্মহত্যা?

গান্ধীজী উত্তর খুঁজে পেলেন না। মাথা নত ক'রে কি যেন আপন মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—এরপরও কি তাদের দেশপ্রীতি সম্বন্ধে আপনার সন্দেহের অবকাশ আছে, মহাত্মাজী?

গান্ধীজী কয়েক সেকেণ্ড নীরবে ব'সে থেকে ব'ল্‌লেন, একটু উত্তেজিত হ'য়ে প'ড়েছিলাম—আমার কথা আমি উইথ্‌ড্র ক'রে নিচ্ছি।

গভীর উত্তেজনার এই সহজ সমাধানে সকলেই খুশী হ'লেন—বিশেষ ক'রে দেশবন্ধু নিজেকে আর সংযত রাখ্‌তে পার্‌লেন না। শরৎচন্দ্রের হাতখানা নিজের হাতে চেপে ধ'রে ফিসফিস ক'রে ব'ল্‌লেন, সত্যই আজ কাজের মত একটা কাজ ক'র্‌লেন বটে শরৎবাবু! বাংলা দেশের ইজ্জোৎ বাঁচিয়ে দিলেন আপনি!

মহাত্মা গান্ধী সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে গেলেন। কিন্তু পুলিশের দৃষ্টি অধিকতর প্রখর হ'য়ে উঠ্‌লো। গোয়েন্দার দল নানা বেশে তাঁর বাড়ীতে আনাগোনা সুরু ক'র্‌লো। শরৎচন্দ্র এতটুকুও ভীত হ'লেন না। কারণ তিনি যেমনি চতুর তেমনি ধূর্ত্ত। সে সময়ে আরম্ভ হ'ল তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ। পরিচালনার ভার গ্রহণ ক'র্‌লেন দেশবন্ধু। সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিলেন শরৎচন্দ্র। নানা লোকের আনাগোনা—পুলিশ একটু বিভ্রান্ত হ'ল। ইতিমধ্যে স্বামী সচ্চিদানন্দ ও স্বামী বিশ্বানন্দের সঙ্গে বিরোধ বেঁধে গেল। অভিযোগ শুন্‌তে শুন্‌তে দেশবন্ধুর কান ঝালাপালা। প্রাণ অতিষ্ঠ। শরৎচন্দ্র ত্রাণকর্ত্তা হিসাবে উপস্থিত হ'লেন সেখানে। দেশবন্ধু ব'ল্‌লেন, প্রাণ যে আমার যায় শরৎবাবু!

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'যাবেই ত!'

দেশবন্ধু একটু বিস্মিত হ'লেন। তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—'ম'শাই দুই স্ত্রী নিয়ে সংসার পাত্‌লে প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে, আর আপনি দুই স্বামী নিয়ে ঘরকন্না আরম্ভ ক'রেছেন; আপনার প্রাণ যাবে না—!' উপস্থিত সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠ্‌লেন। বিবাদও হ'ল সাঙ্গ।

তার কিছুদিন পরে কংগ্রেস অফিসে অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে শরৎবসু ম'শায়ের একটু মন কষাকষি দেখা দিল। এর মূলে ছিল খদ্দর। অনিলবাবু পরেন মোটা খদ্দর আর শরৎবাবু পরেন মিহি। অনিলবাবু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—আপনার এ খদ্দর কোথাকার তৈরী ম'শাই?

অহেতুক অবাস্তব প্রশ্নে শরৎবাবু (বসু) গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, ভাগলপুরে।

এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কিন্তু পরে একটা অপ্রিতিকর অবস্থার সৃষ্টি হ'য়ে গেল। শরৎচন্দ্র হাজির হ'লেন সেই সময়ে। আবহাওয়ার উত্তাপ লক্ষ্য ক'রেই ব'ল্‌লেন, 'ওহে, আমাদের এখানে সব রকমই আছে। বুঝ্‌লে না, তা একটু বৈচিত্র্য থাকাই ভাল! অনিলবরণ, বুঝ্‌লে হে, তুমি হ'লে খদ্দরের মাদার টিন্‌চার।—আর শরৎবাবু, আপনি হচ্ছেন টু হান্‌ড্রেড ডাইলিউশন্‌!'

হাসিতে ফেটে প'ড়্‌লো সারা ঘরখানা।

চাঁদা তোলার কাজ শরৎচন্দ্র মোটেই পছন্দ ক'রতেন না। কিন্তু যখন দেশবন্ধু ব'ল্‌লেন—পল্লী সংগঠনের কাজে যে তিন লক্ষ টাকা চাই শরৎবাবু!

শরৎচন্দ্র সেই মুহূর্ত্তেই চাঁদা তোলার কাজে আত্মনিয়োগ ক'র্‌লেন।

স্বরাজ দল গঠনকালে বাংলা দেশের সমস্ত পত্রিকাই দেশবন্ধুর বিপক্ষে গেল। শুধু তাই নয়; বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা, সার্ভেণ্ট প্রভৃতি প্রভাবশালী কাগজও দিনের পর দিন তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ হান্‌তে সুরু ক'র্‌লো। তখন নিজেদের একখানা কাগজ বার না ক'র্‌লেই নয়। 'Forward' নামে একখানা দৈনিক বার করা হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু শেয়ার বিক্রয়ের প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র নিজেই সেই শেয়ার বিক্রীর কাজে অগ্রসর হ'লেন।

পুলিশ একটু বিভ্রান্ত হ'লেও তাদের অনুচরবৃন্দ তাঁর আবাস পরিত্যাগ ক'র্‌লো না। আসেপাশে ঘোরাফেরা ক'র্‌তে লাগ্‌লো নিয়মিত। সেই সময় বেরুলো : 'দেনাপাওনা', 'নারীর মূল্য' (১৯২৩) ও 'নববিধান' (১৯২৪)।

তিনি চাইছিলেন এমনি একটা সুযোগ। দর্শকের সংখ্যা বেড়ে গেল। উৎসাহী পাঠকের ছদ্মবেশে দলের লোকও পুনরায় আনাগোনা সুরু ক'র্‌লো। তাদের হাতে অনায়াসেই তিনি পাচার ক'র্‌তে লাগ্‌লেন তাঁর সাহায্য। পুলিশ পুনরায় বেয়াকুব সাজ্‌লো। শরৎচন্দ্র নিরপেক্ষের ভান ক'র্‌লেন। কাজও এগিয়ে চ'ল্‌লো পুরো দমে।

* * * *

ন্যাশ্‌ন্যাল কলেজের লাইব্রেরী রুমে নীরবে ব'সে আছেন শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্র সহসা প্রশ্ন ক'র্‌লেন—আচ্ছা দাদা, আপনার মতে কি নন্‌-ভায়লেন্স দ্বারা এদেশের স্বাধীনতা পাওয়া কোনদিন সম্ভব হবে না ?

শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে মুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন—বুঝ্‌লে সুভাষ, আমি কোনদিন অহিংস-পন্থী নই! প'ড়ে মার খাওয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ।

আমি তোমাদের মত ঝানু রাজনীতিক নই, সাদা-সিধে মানুষ, বুঝি রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত। কেউ যদি মত জান্‌তে চাও, বলি, ভিক্ষায় চেয়ে দু'বেলার পেটের খোরাক্ যোগাড় হয় না—আর তোমরা ভিক্ষা চাইছো স্বাধীনতা! তাইত এ তাজ্জব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাইনে। দেশবন্ধু বা তোমরা যে যা বলো, শুধু মাথা দু'লিয়ে যাই, মুখ ফুটে "হ্যাঁ" কিংবা "না" ব'ল্‌তে কোনদিন সাহস করিনি!

সুভাষচন্দ্র অনুযোগ ক'র্‌লেন,—এটা কিন্তু আপনার অন্যায়, দাদা!

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন,—যখন মতে মেলে না, তখন চুপ্‌চাপ্ থাকা ছাড়া অন্য উপায়ই বা কি বল? কাজে যখন নেমেছি, তখন কার্য্যোদ্ধারই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সুভাষচন্দ্র মৃদু হেসে ব'ল্‌লেন,—তা না হয় হ'ল, দলগত আনুগত্য—সত্যকার অভিমত আপনার কি?

অভিমত! শরৎচন্দ্র হেসে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন,—শুন্‌লে তোমরা লাফিয়ে উঠ্‌বে, কিন্তু "পথের দাবী"র সব্যসাচীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ত তোমরা শুনেছো সুভাষ!

সুভাষচন্দ্র একটু গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, এই কি আপনার একমাত্র মত ও পথ?

শরৎচন্দ্র উত্তরে মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন,—সত্য নাও হ'তে পারে, তবে আমার বিশ্বাস, বাইরে থেকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আঘাত হান্‌তে সমর্থ হ'বে, ততদিন এ দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন হ'বে না,—হওয়া সম্ভবও নয়!

বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। ক্লাশের সময় হ'লো। কর্ত্তব্যের ডাকে উভয়েই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

* * *

দেশবন্ধু কর্পোরেশনের মেয়র হ'লেন। সুভাষচন্দ্র হ'লেন চীফ একজীকিউটিভ্ অফিসার।

শরৎচন্দ্রের খুশীর অন্ত নেই! মেয়রের ঘরে ব'সে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র। শরৎচন্দ্র ভেতরে গিয়ে ঢুক্‌লেন। সুভাষচন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে চেয়ারে ব'সিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লেন, বসো, সুভাষ! আজ তোমায় একটা কথা জানাতে ছুটে এসেছি। একদিন তুমি আমার মতামত জান্‌তে চেয়েছিলে, সব্যসাচীর মতের সঙ্গে আমার নিজের মতের কোন মিল আছে কিনা? উত্তর দিয়েছিলাম, কিন্তু সবটুকু সেদিন শেষ করার অবসর পাইনি। তার কারণ কি জানো?

সুভাষচন্দ্র ও দেশবন্ধু তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, যেদিন গল্পটি সূচনা ক'রেছিলাম তখন গল্পের নায়ক ছিল তিনজন। এক—বিপিন মামা (গাঙ্গুলী), আর তাঁর গাঁজার থলি, দুই—মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর অস্ত্র-সংগ্রহের প্রচেষ্টা, তৃতীয়—রাসবিহারী বসু ও তাঁর ভবিষ্যৎ আশা!

দেশবন্ধু মাঝপথে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠ্‌লেন, গাঁজার থলিটি কি?

সে ইতিহাস জানেন না? শরৎচন্দ্র হেসে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, এনার্কিষ্ট পার্টির উনি যে একজন বড় পাণ্ডা, তা তো আপনি ভাল করেই জানেন! একবার টেগার্ড সাহেবের পাল্লায় প'ড়েছিলেন—তখন সত্যই ওঁর কাছে দু'টো রিভল্‌ভার ছিল। টেগার্ডসাহেব ছদ্মবেশে ওঁর পিছু নিয়েছেন—কিন্তু তিনিও ওঁর দৃষ্টি কোনমতেই এড়াতে পারেননি। বিপদ বুঝে, উনি আমার মেজ-ভাই প্রভাসের কাছে গুপিযন্ত্র দু'টি সরিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লেন, শীগ্‌গির পালা!—সঙ্গে সঙ্গে যথাস্থানে গাঁজার দু'টি থলি ঝুলিয়ে রাখ্‌লেন। অবশেষে উভয়েই মুখোমুখী হ'লেন। বিপিন-মামাকে টেগার্ডসাহেব জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, যন্ত্র দু'টি কোথায় সরালেন?

উত্তরে—বিপিনমামা, গাঁজার থলি দু'টি দেখিয়ে ব'ল্লেন,—একটু বেশী আমরা নেশা করি সাহেব! একেই তুমি, যন্ত্র ভেবে এতখানি পথ ধাওয়া ক'রেছো? ইংরেজ জাত্টা যে এত বোকা হ'তে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না!

সকলেই হেসে উঠ্লেন।—

হাসির জেরটা একটু ক'ম্লে দেশবন্ধু জিজ্ঞাসা ক'র্লেন, তারপর?

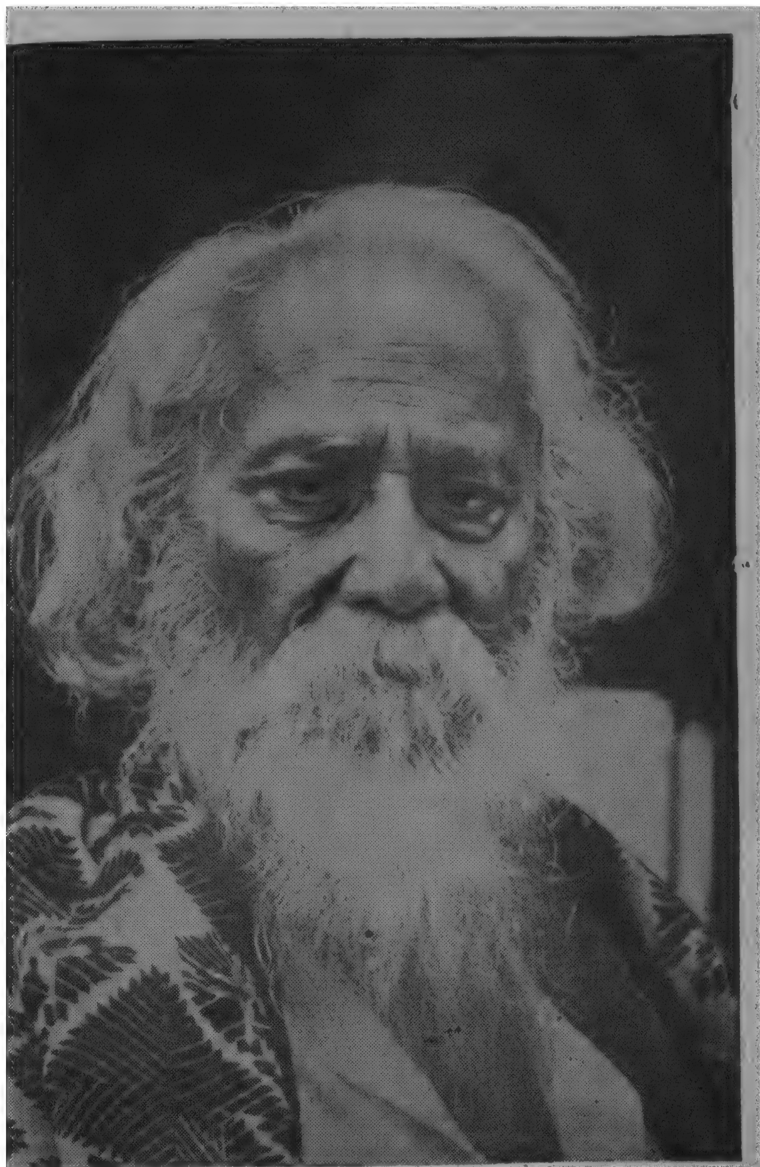
শরৎচন্দ্রও উত্তরে—মৃদু হাস্লেন! ব'ল্লেন, তার পরের ব্যাপারটি খুবই সংক্ষিপ্ত। রচনা শেষ হ'লে দেখ্লাম, যে চরিত্র অঙ্কন ক'রেছি, সে-চরিত্র আমাদের মধ্যেরই একজনের। একটু টেনে ব'ল্লেন, যার উপর আমরা সবাই আশা, ভরসা ও নির্ভর ক'রে ব'সে আছি।

ইঙ্গিতটা স্পষ্টতর হ'য়ে উঠ্লো। সুভাষচন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য লজ্জিত হ'য়ে প'ড়্লেন।

শরৎচন্দ্র অকারণে হাসিতে ফেটে প'ড়্লেন। ব'ল্লেন, ভয় নেই, সব্যসাচী! উপন্যাস আর জীবন—দু'টো কোনদিন এক হ'তে পারে না। এটা হ'ল রূঢ়-বস্তব—আর ওটা কল্পনা, সুতরাং একটু-আধটু পার্থক্য র'য়ে যাবেই যাবে।

শরৎচন্দ্রের বাসাতেই কংগ্রেসের (বি. পি. সি. সি.'র) বৈঠক ব'স্তে সুরু হ'ল। কারণ দেশবন্ধু নানা কাজে ব্যস্ত, আর অতিথি আপ্যায়ণের ব্যবস্থা অতি উত্তম ছিল এখানে। সদস্যদের কাছে এ-বস্তুটি অত্যন্ত লোভনীয়।

কিন্তু সভার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই মুলতুবী রাখার ব্যবস্থা করা হ'ত। উদ্দেশ্য: ভুরিভোজন চ'ল্বে আরও একটা দিন। তা' ছাড়া শরৎচন্দ্রও মনেপ্রাণে এরূপ হৈ-চৈ অনুমোদন ক'র্তেন। তাঁর মেজাজ



অনুসারেই সভার কাজ পরিচালনা করা হ'ত। কয়েক ঘণ্টা আলোচনার পর ব'ল্‌তেন, আজ থাক্, অমুক দিন ভেবে-চিন্তে আলোচনা করা যাবে!

সদস্যরা তখুনি তাঁর অনুকূলে রায় প্রকাশ ক'র্‌তেন। তারপর জলযোগ ও বিদায়ের পালা।

যারা কাজের মানুষ, তাঁরা চ'লে যেতেন, আর যারা শরৎচন্দ্রের সাহচর্য্য চাইতেন, তাঁরা ব'সে থাক্‌তেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিরণশঙ্কর বাবু এলে, আসরটা আরও ভাল ক'রে জমে উঠ্‌তো। সুরু হ'ত ঘরোয়া আলোচনা।

একদিন কথায় কথায় শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—প্রতিশোধ যদি নিতে চাও, আমার মত নিও!

সকলে উৎসুক হ'য়ে উঠ্‌লেন। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, ব্যাপার কি? কি রকমের প্রতিশোধ? কেমন ক'রে নিয়েছিলেন? কার উপর?

শরৎচন্দ্র গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন—আমার গুরুদেবের উঁপরে!

গুরুদেব? সে আবার কে?

আমার গুরুদেব—তোমাদের বিশ্বকবি! সহাস্যে উত্তর দিলেন শরৎচন্দ্র।

কুতূহল আরও বেড়ে গেল। সকলেই অধীরভাবে প্রতীক্ষা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন।

শরৎচন্দ্র একটা ঢেলা আফিং মুখে ফেলে, কাপে চুমুক দিলেন। গলধঃকরণ ক'রে ব'ল্‌লেন—ঘটনাটা কিন্তু খুব বেশীদিনের নয়। হবে বছর দুই তিন আগের। আর পাঁচজনের মতই একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে আমার কাছে প্রায়ই আসা-যাওয়া ক'র্‌তো। প্রত্যেকের কিছু না কিছু চাহিদা থাক্‌তো; আলাপ-আলোচনাও চ'ল্‌তো, তারপর

তারা উঠে যেতো কিন্তু এ-ছোক্‌রা চায় না কিছুই! কথাও বলে না বড় একটা! একদিন সবাই উঠে গেলে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম—দিন আসো, দিন যাও, কিছু বলো না—ব্যাপার কি? আমার কাছে তুমি কি চাও ব'লতো?

সাহস পেয়ে অন্তর খুল্‌লো—আজ্ঞে একটু সাহিত্য শেখার বাসনা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম! যদি দয়া ক'রে একটু—

বাধা দিয়ে ব'ল্‌লাম, সাহিত্য কি শেখানো যায়? নিজেকে সাধনা ক'র্‌তে হয়!

তবুও ছোক্‌রা নাছোড়বান্দা! একদিন দু'দিন তিনদিন—অবশেষে মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম—তোমার নাম কি?

নিরঞ্জন।

করো কি?

এম্‌. এ. পাশ ক'রেছি।

কোন্‌ ক্লাস?

ফার্ষ্ট ক্লাশ—

চলে কেমন ক'রে?

বর্ত্তমানে বাড়ীতে খাওয়া-পরার ভাবনা নেই!

বাবার তা' হ'লে দু'পয়সা আছে ব'ল্‌তে হবে!

আজ্ঞে তা আছে! ছোক্‌রা সলজ্জ হাসি হেসে মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল।

তা' হ'লে একটা কাজ ক'র্‌লে না কেন?

বলুন—

জোড়াসাঁকোতে একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লে না কেন?

আজ্ঞে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে আবেষ্টনী দুর্ভেদ্য!

বহুদিনের পুরানো একটা কথা স্মরণ হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ

দুটো আমার জ্বলে উঠ্‌লো। মাথার মধ্যে একটা দুষ্টুবুদ্ধি আনাগোনা সুরু ক'রে দিল। ব'ল্‌লাম, রবিবাবুর কাছে যাবে?

তা' কি ক'রে সম্ভব? দ্বিধা-মিশ্রিত কণ্ঠে উত্তর দিল নিরঞ্জন।

আরে যাবে কিনা বলো?

সে ত' আমার পরম সৌভাগ্য! ব'লেই পা দুটো আমার জড়িয়ে ধ'র্‌লো।

বহুকষ্টে ছাড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম—কবিতা দু-একছত্র লিখ্‌তে পারো?

আনন্দে গদ্‌ গদ্‌ স্বরে ব'ল্‌লো—কালই আমি আমার কবিতার খাতাখানা সঙ্গে নিয়ে আস্‌বো।

সর্ব্বনাশ! ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌লাম। ব'ল্‌লাম, তার প্রয়োজন হ'বে না। আমি একখানা চিঠি লিখে দেবো, সেখানা নিয়ে রবিবাবুর সঙ্গে দেখা করো। সমস্ত ব্যবস্থা তিনিই ক'রে দেবেন।

নিরঞ্জন খুশীমনে উঠে গেল। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম। বহুদিন পরে পুনরায় নিজের কাজে মন দিতে পার্‌লাম। মুখের সাম্‌নে ব'সে থাক্‌লে কখনও কি কাজ করা যায়, না সম্ভব?

পরদিন ভোরে নিরঞ্জন এসে হাজির। সকল কাজ ফেলে চিঠি লিখ্‌তে ব'সে গেলাম: গুরুদেব, বহুদিন আপনার খোঁজ-খবর নিতে পারিনি। আশা করি শারীরিক ও মানসিক কুশলেই আছেন! আমি শ্রীমান নিরঞ্জনকে আপনার কাছে পাঠালাম—ফার্ষ্ট ক্লাস এম, এ: বাড়ীতেও খাওয়া পরার অভাব নেই, তার উপর কাব্যপ্রিয়। ওর খুব ইচ্ছা—আপনার সেবা করে। যদি বেচারীকে পায়ে একটু ঠাঁই দেন—ও কৃতার্থ বোধ করে; আমিও সামান্য একটু গুরুদক্ষিণা দিতে পারি।

একটু থেমে ব'ল্‌লেন—চিঠিখানা পেয়ে গুরুদেবের আমার খুশীর

অন্ত নেই। ফার্ষ্ট ক্লাস এম্. এ.—তার উপর পেট-ভাতায় শ্রীমান্ নিরঞ্জন কাজ ক'রতে রাজি হয়েছে, অতএব খুশীমনে তিনি আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে, শ্রীমানকে বোলপুরে চালান ক'রে দিলেন।

অতি উৎসাহ নিয়ে শ্রীমান্ বোলপুরে রওনা হ'ল। যে কবির সহসা সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, আজ তাঁরই সহকর্ম্মী। ঠাঁই হ'ল একান্ত সন্নিধানে। খুশী হওয়ারই কথা!

কিন্তু মনের উৎসাহ তার দু'দিনেই নিভে গেল। কোথায় সকল সময়ে কবির সঙ্গে থাক্‌বে, তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'র্‌বে—না দু'বেলা শুধু ছেলে পড়ানো—একি কখনও ভাল লাগে?

নিরুৎসাহ হ'লেও হাল একেবারে ছাড়্‌লো না। সে অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থাটি খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা ক'র্‌লো। সেই সঙ্গে অবসর সময়টুকু কবির সান্নিধ্যে কাটানোর আপ্রাণ চেষ্টা সুরু ক'রে দিল।

মাস দুইয়ের মধ্যে কবির প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌লো। অবশেষে খবর পাঠালেন: শরৎ, তুমি যে ছেলেটিকে পাঠিয়েছিলে, সেটি যে সর্ব্ব-গুণে সমন্বিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! লেখা-পড়ায় ভাল, সদালিপি, এও সত্য—এর উপর ছেলে-মেয়েদের পড়ায়-শোনাও ভাল, কিন্তু আমার প্রাণপাখী অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে।

অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে ব'ল্‌লে, কথাটাকে একটু লঘু ক'রে দেওয়া হ'বে,—সে আমার জীবনকে দুর্ব্বিসহ ক'রে তুলেছে। বোলপুর আসার পথে একটি সোনার কলম নিয়ে এসেছে, লিখ্‌তে আমায় দেয় না—কোন কলমই তার পছন্দ নয়, কেবল সেটি এগিয়ে দিয়ে বলে—না গুরুদেব—এটা—এটা অর্থাৎ তার ধারণা সোনার কলমে না লিখ্‌লে, আমার বিশ্বকবিত্ব একেবারে লোপাট হ'য়ে যাবে! শুধু কি তাই, কোন কিছু করার স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত আমার নেই! এমন কি পায়খানা

যাওয়াও বন্ধ! সে গাড়ুটাও নিজে ব'য়ে নিয়ে যাবে—লেখা ত মাথায় উঠেছে, আমার বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া প্রায় একই স্তরে নেমে এসেছে। এখন দয়া ক'রে তুমি তোমার দেওয়া এই রত্নটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমায় মুক্তি দাও!

সংবাদটি পেয়ে ভারী খুশী হ'লাম! অপমানের প্রতিশোধ নিতে পেরেছি এতদিনে! সুতরাং কাল বিলম্ব না ক'রে উত্তর দিলাম—গুরুদেব, আপনার চিঠিখানা পেয়ে সত্যই মর্ম্মাহত হ'লাম। বিশেষ ক'রে একজন সাহিত্যিক যদি বেঁচে থেকে কলম ধ'র্‌তে না পারে—তার বেঁচে থাকা আর মারা যাওয়া—একই কথায় পর্য্যবসিত হ'য়ে থাকে।

কিন্তু গুরুদেব, এই হতভাগ্য শিষ্যের কোন অপরাধ গ্রহণ ক'র্‌বেন না! আমি স্বেচ্ছায় এবং জেনে-শুনেই এই রত্নটিকে আপনার কাছে পাঠিয়েছি!

আপনি যখন বাংলাদেশ তথা সারা ভারতের উদীয়মান সূর্য্য, তখন ভবঘুরে, আশ্রয়হীন এই ভাগ্যহত শিষ্য, আপনার ওই জোড়াসাঁকোর আশে-পাশে, সাহিত্য-সাধনার আশায় বহুবার ধন্না দিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যে তার গুরুর সাক্ষাৎ লাভ ঘটেনি! অতি উৎসাহী ভক্তদের কাছ থেকে অর্দ্ধচন্দ্র খেয়ে ফিরে আস্‌তে হ'য়েছিল! অপরাধ নেবেন না গুরুদেব, সেদিন বয়সটা ছিল কাঁচা—রক্তও ছিল তাজা, সহসা প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'স্‌লাম, এ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ আমায় ক'র্‌তেই হবে।

সেদিন জান্‌তাম না কি ক'রে তা সম্ভব। ক্রোধের মাথায় শুধু প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম মাত্র! ব্রাহ্মণের ছেলের প্রতিজ্ঞা বোধ করি মাঠেই মারা যায়! কারণ নিয়তির আদালতে, আমাদের মধ্যে সম্পর্ক দাঁড়ালো গুরু আর শিষ্য! এটা শুধু মুখের কথা নয়—রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা, লাল ও শ্বেত কণিকার মত! অপরিহার্য্য ও অনবিচ্ছেদ্য!

হয়ত নীলয়গামীই হ'তে হ'তো—হঠাৎ একটা সুযোগ মিলে গেল। নিরঞ্জন সাম্‌নে এসে গেল। যে ক'দিন সে আমার কাছে ছিল, আমি হাড়ে-মাসে অনুভব ক'রেছিলাম, সে কি প্রকারের জীব! মনে হ'ল, এ বুঝি ভগবানের প্রেরিত দূত। ব্রাহ্মণের ছেলের প্রতিজ্ঞা রক্ষার একটি দুর্ভেদ্য কবচ। পাঠিয়েদিলাম আপনার কাছে। গুরুদেব, আপনি সাগর, আমি নদী, ও এখন সাগরের সন্ধান পেয়েছে, ফিরিয়ে দিলেও ফিরে আর আস্‌বে না!

(শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প)

* * *

সেদিন মিটিং মোটেই জম্‌লো না! কেউ এলো—কেউ এলো না, সুতরাং যারা এসেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ র'য়ে গেলেন—কিরণশঙ্কর-বাবুর সঙ্গে দেখা করার আশায়। কোন একটা কাজে তিনি আটক্ পড়ে গিয়েছিলেন। ফোন ক'রে জানালেন—আপনি কাজ চালিয়ে নিন্ শরৎদা, আমি কাজটা সেরেই আপনার বাসায় ফির্‌ছি!

যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের একথা জানাতেই—কেউ কাজের অছিলায় সেস্থানে ত্যাগ ক'র্‌লেন—অন্যেরা অপেক্ষা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, একে একে সাহিত্য-বিলাসীদের জমায়েৎ সুরু হ'ল।

শরৎচন্দ্রের নির্দ্দেশমত সিঙ্গাড়া ও রসগোল্লা এলো প্রথমে। তারপর এলো চা। জলযোগ শেষ হ'লে, সান্ধ্য-বৈঠক সুরু হ'য়ে গেল। দুপুরে ব'সেছিল রাজনীতির সভা, এখন ব'স্‌লো সাহিত্যিকের আসর। যারা জমায়েৎ হ'য়েছেন, তাঁরা সকলেই কিন্তু সাহিত্যিক নন! কেউ শ্রোতা, কেউ দর্শক, মাত্র দু'একজন আছেন সাহিত্যিক।

রাজনীতির বৈঠকে শরৎচন্দ্র ধীর ও স্থির। কথা বলেন কম,—

ব'ল্‌লেও থেমে থেমে বলেন—সাধারণ শ্রোতার কাছে, তিনি উত্তম বক্তা নন,—কিন্তু সাহিত্যের আসরে তিনি সহজ মানুষ। মজ্‌লিসে তিনি মজ্‌লিসী মানুষ। কাজেই সভার রূপ পরিবর্ত্তন ক'র্‌লো।

ছেলে-মেয়ের পার্থক্য এখানে নেই। অসঙ্কোচে সকলেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত ক'রে চ'লেছেন।

শরৎচন্দ্রও মুখ খুল্‌লেন। কোন দ্বিধা নেই। ব'ল্‌লেন—মেয়েদের আমি খুব কম ক'রেই জানি। তবে ছোটবেলায় দাদাম'শাইকে (কেদারনাথ) ব'ল্‌তে শুন্‌তাম—মেয়েদের ফিক্‌স্‌ড মাইণ্ড, যা একবার ভেবে ঢুকেছে, তা থেকে এতটুকুও নড়্‌চড়্‌ হবে না—এমন কি একচুলও না! আমার অভিমতও ঠিক তাই!

পাশে একটি মহিলা সাহিত্যিক ব'সেছিলেন। তিনি প্রতিবাদ ক'র্‌লেন—আমার ধারণা কিন্তু ঠিক বিপরীত! ভালবাস্‌তে মেয়েরাই জানে—পুরুষরা হ'ল ঘোর স্বার্থন্বেষী।

অনেকেই প্রতিবাদ ক'র্‌তে উদ্যত হ'লেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র বাধা দিলেন। একটু মৃদু হেসে ব'ল্‌লেন—আমার কিন্তু একটা ছোট অভিজ্ঞতার কথা তোমাদের ব'ল্‌ছি!

দেশ (দেবানন্দপুর) থেকে ফিরে ভাগলপুরে গিয়েছি, সাম্‌নে পরীক্ষা!

দাদাম'শাইয়ের পূজোর ঘরটি অধিকার ক'রে বাসা বেঁধেছি। রাজুর দেওয়া দেবদারু কাঠের শেল্‌ফ্‌, একটি ছোট টেবিল আর অল্প-পরিসর ভে-ঠেঙ্গা একটি চেয়ার। সজাগ ছাড়া ঘুমোনোর বিন্দুমাত্র উপায় নেই। ছেঁড়া দড়ির খাট, বিছানার দৈন্য ঢাকার জন্য উড়ুনি চাদর ঢাকা। তার নীচে একটি গুড়্‌গুড়ি, সময়মত হাজির বন্ধুবর আমার শ্রীমান নীলা। মামাদের অবস্থা প'ড়্‌তে সুরু হ'য়েছে, সারারাত্ত জেগে পড়ার মত তেল যোগাড় ক'র্‌তে পারেননি মা (ভুবনমোহিনী)।

বন্ধুরাই মোমবাতি সংগ্রহ ক'রে দিয়ে যায়—এমন কি বই পর্য্যন্তও ; রাত জাগার জন্ম রাখা হ'ল : একটি ষ্টোভ আর একটা কেৎলি। ইঙ্গিত, প্রয়োজনমত তৈরী ক'রে নিয়ো। এক কথায় পৈত্রিক সম্পত্তি আমার ছেঁড়া একটি জামা আর ময়লা একখানি গায়ের কাপড়।

ভেবে দেখ, কি দৈন্যতার মধ্যে দিন আমার কাটছে! তবুও সে-সময় একটি ছেলে আমায় মনে-প্রাণে ভালবেসেছিল,—তার নাম পূর্ব্বেই ক'রেছি, পরম বন্ধু আমার শ্রীমান নীলা!

এই শ্রীমান কথাটির ব্যবহার থেকেই তোমরা বুঝ্‌তে পারো আমাদের মধ্যে কতখানি আন্তরিকতা ছিল। রাজু ছিল আমার সহচর,—কৈশোর জীবনের গুরু। আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা ছিল উভয়েরই সঙ্গে। তবুও আমি সেদিন বেশী ভালবাসতাম নীলাকে।

কারণ একটা ছিল। নীলা ছিল অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, তার সঙ্গীরও অভাব ছিল না, তবুও আমার মত হা'ভাতে ঘরের ছেলেকে সে ভালবেসেছিল একান্ত নিবিড়তর ক'রে।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম—হ্যাঁরে নীলা, তুই আমায় এত ভালোবাস্‌লি কেমন ক'রে?

ব'ল্‌লো—তোর ঠোঁট দুটো দেখে!

মানে?

তুই তামাক খাস্—দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম।

সত্য কথা ব'ল্‌তে কি, সে এই নেশার মোহেই আমাকে ভালবেসেছিল! এমন কি আমার জন্যে নিজের বাড়ী থেকে, সকলের অজ্ঞাতে ঘড়ি চুরি ক'রে এনে দিয়েছিল,—যেহেতু পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটছে। সময়মত এসে তামাক সেজে, নিজে খেয়ে ও খাইয়ে মেজাজটাকে আমার সতেজ রেখেছিল সেই! নিঃসন্দেহে আজ ব'ল্‌তে পারি, পরীক্ষা পাশের সমস্ত উপকরণের মধ্যে সেও ছিল একটি উপকরণ। তার একটি

প্রিয় এসরাজ ছিল। সেটিও সে দিয়ে দিয়েছিল—এর কারণ কি তোমরা ব'ল্‌তে পারো ?

সকলেই নীরব।

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—হয়ত তোমরা ব'ল্‌বে বাল্যপ্রীতি! কিন্তু এখন সেই সব অতীতের কাহিনীগুলো হাত্‌ড়ে, স্থির সিদ্ধান্তে পৌচেছি, পুরুষের ভালবাসা মানে—নেশা! সে এই নেশার মোহেই ভালবাসে। সে বাস্তব জগতের নেশাই হোক্, আর মনোজগতের নেশাই হোক্! এ নেশা টুটে গেলে, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়ে সে বেরিয়ে। এটাই তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য তাই সে নির্ম্মম! আর নারী—তার সকল কিছুর মূল হ'ল কামনা। সে গণ্ডীকে সে অতিক্রম ক'র্‌তে পারেনি,—তাই তার স্বার্থ ত্যাগের নিশানা ওই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এরজন্য কাউকেই দোষারোপ করা চলে না!

(শরৎচন্দ্রের বৈঠকী আসরের সত্যকার রূপ)

* * * *

ভুবনমোহিনী দেবীর গুণ ছিল, রূপ ছিল না—হিরণ্ময়ীদেবীও ঠিক্ তেমনি! যেরূপ বেঁটে ও কালো, সেইরূপ স্থূলপ্রকৃতির। প্রথম দৃষ্টে শরৎচন্দ্রের রুচিকে তরিফ করা চলে না। কিন্তু যদি এই মহিলাটির সংস্পর্শে কেউ আসে—সে মুগ্ধ না হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বে না। শ্রদ্ধায় মাথা নত হ'য়ে যায় আপনা থেকেই। এমন সেবাপরায়ণা নারীমূর্ত্তি সহসা চোখে পড়ে কিনা সন্দেহ! এঁর কাছে, পান থেকে চুণ খ'সে পড়ার সম্ভাবনাটি পর্য্যন্তও নেই। কখন কে কি খাবে, কখন কার কি প্রয়োজন, তা স্মরণ করার পূর্ব্বেই মুখের কাছে উপস্থিত হ'য়ে গেছে আপনা থেকেই।

এই যে গুণ, এর কাছে রূপের কোন মূল্যই নেই! দু'দিন পরে,

রূপের আগুন ছাই ঢাকা প'ড়ে মলিন হ'য়ে যায়, কিন্তু চোখে ভেসে থাকে এই গুণ—যার কাছে, অন্তর পায় তৃপ্তি, দেহ-মন শীতল হ'য়ে যায়।

এই মহিলাটিকে শরৎচন্দ্র মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌তেন। যখন এঁর পেটে একটা টিউমার হওয়ায় অপারেশনের কথা উঠ্‌লো—তখন শরৎ-চন্দ্রের মুখের দিকে তাকানো যায় না। মুখখানা ফেকাসে সাদা রক্তহীন,—চোখ দুটো ছল্‌-ছল্‌ ক'র্‌ছে। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, অপারেশন ক'র্‌লে বাঁচ্‌বে তো?

ডাক্তার আশ্বাস দিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র রাজি হ'লেন না। ব'ল্‌লেন—যতদিন বাঁচে এমনি ক'রেই বাঁচুক্‌, ওর অপারেশন হ'তে দেবো না।

হিরণ্ময়ীদেবীকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—তোমার কি কোন্‌ কষ্ট হ'চ্ছে বড়-বৌ?

হিরণ্ময়ীদেবী ('বড়-মা'—এই নামেই তিনি আত্মীয়-স্বজনের কাছে পরিচিত। আর যাঁরা শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন—তাঁরা "বৌদি" ব'লেই ডাক্‌তেন) ব'ল্‌লেন—কষ্টের চেয়ে লজ্জাই হয় বেশী! লোকে কি ভাবে বলতো?

যার যা খুশী—সে তা ভাবুক্‌, আমি কিন্তু তোমার এই অপারেশনে মত দিতে পারি না!

কেন?

ছল্‌ছল্‌ চোখে শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন—সে-কথা তুমি বুঝ্‌বে না বড়-বৌ! তুমি যে আমার কি—সে-কথা কেউ বুঝ্‌বে না কোনদিন!

এর পর আর যুক্তি বা অনুরোধ নিরর্থক! আজও সেই টিউমারের বোঝা ব'য়ে চ'লেছেন হিরণ্ময়ী দেবী।

* * * *

বেরুলো "রূপ ও রঙ" সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র ম'শায়ের সহযোগে সম্পাদনার ভার গ্রহণ ক'র্‌লেন। এপাশে দেশবন্ধু সমস্ত কিছুই দান ক'র্‌লেন, তবুও গৃহত্যাগ ক'রে চলে যেতে পার্‌ছেন না। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে একটা গভীর উদ্বিগ্নের ছায়া। সারা রাত ার কথা মনে হ'য়েছে,—তাঁর কাছে লোক পাঠানোর অবকাশও তিনি তিনি পাননি! সহসা একটা ট্যাক্‌সি তাঁর বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। দেশবন্ধু চোখ তুলে চাইতেই উভয়ের চোখাচোখি হ'য়ে গেল। সহাস্যে সাদর সম্ভাষণ জানালেন—আরে, আসুন, আসুন! আপনার কথাই ভাব্‌ছিলাম এতক্ষণ!

শরৎচন্দ্র সহাস্যে ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। ব'ল্‌লেন, সমস্ত খবর আমি কাল পেয়েছিলাম,—শুনেই মনটা এখানে ছুটে আসার জন্যে ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছিল।

দেশবন্ধু ব'ল্‌লেন, আমারও তাই! কি আশ্চর্য্য মনের মিলন দেখুন!

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, অন্তরঙ্গতা যেখানে দৃঢ়, ভালবাসা যেথা গভীর, সেখানে একজনের ডাকে অপরের মন উদ্বেলিত হ'বেই—এটাই প্রকৃতির রীতি। কিন্তু সে কথা এখন থাক্‌—সর্ব্বস্ব ত ত্যাগ ক'র্‌লেন, এখন উঠ্‌বেন কোথায় স্থির ক'র্‌লেন?

দেশবন্ধু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন,—এখনও ঠিক্‌ ক'রে উঠ্‌তে পারিনি!

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন,—তা'হলে এ দীনের কুটিরেই পদার্পণ ক'র্‌বেন চলুন!

দেশবন্ধু স্থির হ'য়ে কি যেন একটু ভেবে নিলেন। ব'ল্‌লেন, যদি কোথাও উঠ্‌তেই হয়, আপনার কাছে গিয়েই প্রথম উঠ্‌বো, কথা দিলাম, শরৎবাবু। কিন্তু তার আগে যে আমার আর একটি জিনিষের ভার নিতে হ'বে।

শরৎচন্দ্র সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

দেশবন্ধু ব'ল্লেন—সারা রাত আমি ভেবে দেখেছি, কিন্তু সে পরীক্ষ করার সাহস কারও দেখিনে। একমাত্র আপনিই আছেন, যা সাদর গ্রহণ ক'র্তে পারেন!

শরৎচন্দ্রের বিস্ময় বাড়্লো বই কম্লো না। জিজ্ঞাসা ক'র্লেন, সে বস্তুটি কি দেশবন্ধু?

দেশবন্ধু ব'ল্লেন,—আমার গোবিন্দজীকে গ্রহণ ক'র্বেন, শরৎবাবু আমি ওঁরই জন্য এখনও বাড়ী আগ্‌লে ব'সে আছি।

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন,—জানেন ত' আমার দেব-দ্বিজে ভক্তি নেই, আমি নাস্তিক!

দেশবন্ধু হেসে উঠ্‌লেন। ব'ল্লেন—তাই ত' পরীক্ষার সাহস রাখেন আপনি! শুনুন, আমার এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি ব'ল্লেন, তোকে একটা জিনিষ দিয়ে যেতে পারি, কিন্তু সে ভার সত্যই কি বহন ক'র্তে পার্বি? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা ক'র্লাম—এমন কি অমূল্য সম্পদ আপনি আমায় দেবেন?

সন্ন্যাসী ব'ল্লেন—সত্যই, সেটি এক অমূল্য রতন! ব'লেই একটি শালগ্রাম শিলা ঝুলি থেকে বার্ ক'র্লেন। ব'ল্লেন—এ শিলার এমনই গুণ যে, কেউ গৃহী হ'তে পারেনি, সকলকেই তিনি সর্ব্বত্যাগী ক'রেছেন।—নিবি তুই?

মনটা আমার বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌লো! অন্ধ-সংস্কারকে কোনদিনই প্রশ্রয় দিতাম না, পরীক্ষার ছলে সেটি গ্রহণ ক'রেছিলাম। এখন সে অগ্নি-পরীক্ষা, একমাত্র একা আপনিই ক'র্তে পারেন!

শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে রাজি হ'য়ে প'ড়্লেন! ব'ল্লেন,—কোন চিন্তা নেই দেশবন্ধু, ও দেবতাটির ভার আমিই গ্রহণ ক'র্লাম!

দেশবন্ধু আনন্দে মুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন, সত্যই নেবেন শরৎবাবু?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন,—আপনার সঙ্গে কি কোনদিন রহস্য ক'র্‌তে পারি? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওঁকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ে যাবো।

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ১৯৪]

* * *

শরীরটা ভাঙন ধরায়, তিনি হাওড়ার গোবিন্দপুরে, তাঁর দিদি অনিলা দেবীর বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। বহুবার তিনি এস্থানে এসেছেন। বেশ ভাল লাগে তাঁর রূপনারায়ণের এই নির্জ্জন তীরটি। মনে মনে এইখানে একটি আস্তানা গ'ড়ে তোলার ইচ্ছা তাঁর হ'ল।

তখন গ্রামে লেগেছে দুর্ভিক্ষ। বুভুক্ষু গ্রামবাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রাণটা তাঁর কেঁদে উঠ্‌লো। তিনি কোলাঘাট-গামী ধানের নৌকাগুলোকে থামালেন এবং চড়া দামে তাদের সমস্ত ধান কিনে নিলেন। ঠিক ক'র্‌লেন,—এই ধান তিনি এদের মধ্যেই বিলিয়ে দেবেন—কিন্তু তারও ত' একটা সৎপথ আবিষ্কার করা চাই!

বহুক্ষণ পদচারণার পর সহসা তাঁর মনে হ'ল—যে স্বপ্ন তিনি এখানে ব'সে ব'সে দেখেছিলেন, সেটার বাস্তব রূপ দেওয়া কি সম্ভব নয়? সঙ্গে সঙ্গে লোক লাগিয়ে তিনি জমি ঠিক ক'রে ফেল্‌লেন এবং রাষ্ট্র ক'রে দিলেন, যারা এখানে পরিশ্রম ক'র্‌বে, তাদের তিনি অন্ন যোগাবার ব্যবস্থা ক'র্‌বেন!

অনিলাদেবী সবিস্ময়ে প্রশ্ন ক'র্‌লেন—ব্যাপার কি শরৎ?

শরৎচন্দ্র উত্তরে মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—ওদের ত কিছু সাহায্য করার প্রয়োজন ছিল—কিন্তু শুধু হাতে সে বস্তুটা তুলে দিতে সাহস হ'ল না!

সবিস্ময়ে অনিলাদেবী মুখের দিকে তাকাতেই, তিনি সহাস্যে

ব'ল্লেন—শুধু দান ক'র্তেই নেই দিদি, তাতে ক্ষতি হয় উভয় পক্ষের। বাড়ে নিজের দম্ভ—আর যে নেয়, সে হ'য়ে যায় হেয়। তার চেয়ে—"নেই কাজ ত খই ভাজ্"—একটা বিনিময় চলুক্। ওরা ব'ল্বে, আমরা খেটেছি, আমিও ভাব্বো, বাড়ীটা আমার ফুকুট্সে তৈরী হ'য়ে গেল!

উপস্থিত সকলেই হেসে উঠ্লেন। শরৎচন্দ্রও নিজের রসিকতায় নিজেকে সংযত রাখ্তে পার্লেন না। সে হাসির স্রোতে নিজেও গা ভাসিয়ে দিতে এতটুকুও কুণ্ঠা বোধ ক'র্লেন না।

স্বরাজ পার্টির ফরিদপুরে কন্ফারেন্স ব'স্লো। সভাপতি দেশবন্ধু স্বয়ং। ডেলিগেটদের অধিকাংশই তাঁর নিজের দলের লোক—শিষ্য ও অনুগামী। অভিভাষণে, তিনি সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া, লর্ড বার্কেন হেডের সহযোগীতার আহ্বানে একটা মীমাংসার মনোভাব প্রকাশ ক'র্লেন। তাঁর শিষ্যের দল সেই মুহূর্ত্তেই প্রতিবাদ জানালেন। দেশবন্ধু কন্ফারেন্স শেষ ক'রে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ক'ল্কাতা ফিরে এলেন। কানাঘুষা চ'ল্তে লাগ্লো—দেশবন্ধু মডারেট হ'য়ে গেছেন—সে ডায়নামিজম্ আর তাঁর নেই! কেউ কেউ বিদ্রূপ ক'র্লেন, প্রভিন্সিয়্যাল্ অটোনমি গ্রহণ ক'রে, সি. আর. দাস গভর্ণর হ'তে চাইছেন!

অভিমানে ও হতাশায় দেশবন্ধুর হৃদয় একেবারে ভেঙে গেল। শরীর পূর্ব্বেই ভেঙেছিল,—তার উপর মানসিক এই আঘাতে দেহমন একবারে জরাজীর্ণ হ'য়ে প'ড়্লো। জলভরা চোখে তিনি ব'ল্লেন—শরৎবাবু আমি মডারেট হ'য়ে গেছি! গভর্ণর হ'তে চাই! এই কি বাংলাদেশের ধারণা?

আশ্বাস দিলেন শরৎচন্দ্র—দুঃখ ক'র্বেন না দেশবন্ধু! এ দুঃখ সঞ্চিত থাকুক্—সমস্ত দেশের জন্যে—সমস্ত জাতির জন্যে!

তবুও কি দেশবন্ধু শান্ত হ'তে পা'র্‌লেন? অভিমানে তাঁর হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'তে লাগ্‌লো। অবশেষে শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—আপনি সর্ব্বত্যাগী, আপনি অভ্রান্ত, আপনি অগ্নিশুদ্ধ, আপনিই নেতা! দেশ আপনারই! কিছুদিন দার্জ্জিলিং থেকে ঘুরে আসুন, স্বাস্থ্যটা পুনরুদ্ধার হোক্, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

দেশবন্ধু তাঁর পরামর্শ গ্রহণ ক'র্‌লেন। দার্জ্জিলিং যাত্রা ক'র্‌লেন। কিন্তু অভিমানের বালুর বাঁধকে তিনি রোধ ক'র্‌তে পার্‌লেন না। একপাশে বাজ্‌ছে ট্রেন-ছাড়ার বিদায় বাঁশী, অন্য পাশে জনতার জয়ধ্বনি "জয় দেশবন্ধুর জয়"—তারই আবর্ত্তে অন্তরাত্মা তাঁর বার বার অভিমানে ফেটে প'ড়্‌তে চাইলো। অবশেষে একবার ক্ষীণ-কণ্ঠে ব'ল্‌লেন—তোমরা আমার "সাজেশন্"টা সিরিয়াস্‌লি একটিবার চিন্তা পর্য্যন্ত ক'রে দেখ্‌লে না?

নির্ম্মম লোহার যন্ত্রটা হস্-হস্ শব্দে এগিয়ে চ'ল্‌লো। জনতা জয়ধ্বনি দিল—"দেশবন্ধু কি জয়"—কিন্তু উত্তর দিল না শিষ্য, সহকর্ম্মী ও ভক্তের দল। বিদায় দিলেন শুধু নীরবে—

১৬ই জুন সন্ধ্যার পরে সারা ভারতের বুকে নিদারুণ বজ্র আঘাত হান্‌লো—"দেশবন্ধু নেই!"

কান্নার রোল উঠ্‌লো ঘরে ঘরে—রাস্তায়-রাস্তায়—পার্কে-পার্কে—দেশবন্ধু আর নেই।

শত্রু-মিত্র সবাই কাঁদ্‌ছেন—দেশবন্ধু আর নেই—নেই—নেই—আর নেই—

শরৎচন্দ্র শোকের আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। মাঝে মাঝে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—হ্যাঁ, সব শেষ! হ্যাঁ—হ্যাঁ—শেষ আমরাই তাঁকে ক'র্‌লুম! এত মার কি সহ্য হয়?

মাথার চুল ছিঁড়্‌তে ছিঁড়্‌তে ব'ল্‌লেন—বেশ ক'রেছেন! কাঁদ্‌তে

কাঁদ্‌তে যেদিন তিনি বিদায় নিয়েছিলেন—সেদিন তো কেউ আমরা কাঁদিনি—হাত ধ'রে বলিনি—ওগো—আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো তুমি—বিশ্বাস করো—তোমাকেই আমার চাই—

একটু থেমে পাগলের মত নিজের মনে ব'লে উঠ্‌লেন—শোধ নিয়েছেন তিনি! আমরা তাঁকে কাঁদিয়েছি,—তিনিও আমাদের কাঁদালেন—স্থদে-আসলে শোধ নিলেন! বেশ ক'রেছেন! উই ডিডিণ্ট ডিজার্ভ হিম—

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সেই শূন্যস্থান গ্রহণ ক'র্‌লেন। সুভাষচন্দ্র তখন মান্দালয়ে কারাগারে অন্তরীণ। যে বাংলা ছিল সকলের পুরোভাগে, সেই বাংলা রইলো সকলের সঙ্গে। শরৎচন্দ্রও ভগ্নহৃদয়ে পানিত্রাস-আমৃতাবেড়েতে বসবাস সুরু ক'র্‌লেন। পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হ'ল "হরিলক্ষ্মী" (১৯২৬)। ডাক এলো—ঢাকা-মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করার জন্য। সে আহ্বান তিনি পরিত্যাগ ক'র্‌লেন না। এরই পর বেরুলো "পথের দাবী" (১৯২৬)। টেগার্ডসাহেবের বাসনা সফল হ'ল এতদিনে। তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন।—কিন্তু শরৎ-সাহিত্য-অনুরাগী কোন এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ব'ল্‌লেন, যুবকসমাজের উপর শরৎচন্দ্রের বিশেষ প্রভাব, সুতরাং ওঁকে নিয়ে বিশেষ টানাটানি করা উচিত হবে না, তার চেয়ে চিরন্তনী প্রথা অনুসারে কাজ করা হোক্। নইলে, যে কোন মুহূর্ত্তে একটা বিপ্লব দানা বেঁধে উঠ্‌তে পারে!

* * * *

সরকার সে পরামর্শ গ্রহণ ক'র্‌লেন সুবোধ বালকের মত। কারণ, কথাটা সত্যই উড়িয়ে দেওয়ার মত ছিল না। বইখানা বাজেয়াপ্ত

করা হ'ল। আর লেখককে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আদেশ হ'ল,—সাধারণ উপন্যাস ছাড়া রাজনীতিকে কেন্দ্র ক'রে কোন উপন্যাস ভবিষ্যতে তিনি রচনা ক'র্‌তে পার্‌বেন না!

শরৎচন্দ্র মনে মনে ক্ষুব্ধ হ'লেন,—কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁকে দস্তখতে রাজী হ'তে হ'ল। কারণ, বর্ম্মামুলুকে তিনি আফিং ধ'রেছিলেন। জেলখানায় ওবস্তুটির প্রবেশ নিষিদ্ধ। সুতরাং মনের ক্রোধ মনেই চাপা রাখা যুক্তিযুক্ত বোধ ক'র্‌লেন।

বেরুলো শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব ও ষোড়শী (দেনা পাওনার নাট্যরূপ, ১৯২৭) মান্দালয় জেল থেকে মুক্তিলাভ ক'র্‌লেন সুভাষচন্দ্র (১৯২৭)। বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (অধ্যাপক)-প্রমুখ বিপ্লবী নেতারাও মুক্তিলাভ ক'র্‌লেন। ১৯২৪ সালে, ৩নং রেগুলেশন আইন ও বেঙ্গল অর্ডন্যান্স আইনে যাঁরা ধৃত হ'য়েছিলেন, তাঁরাও মুক্তি-লাভ ক'র্‌লেন। কর্ম্মক্ষেত্রে এই মুক্ত রাজবন্দীর দল ফিরে এলেন কিন্তু তাঁদের একঘরে করার ব্যবস্থা হ'ল। ঘরে ঠাঁই নেই, আত্মীয় স্বজনদের কাছে ঠাঁই নেই, মেস-বোডিং পর্য্যন্ত বন্ধ। তার উপর কংগ্রেসও এঁদের এড়িয়ে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। স্বরাজীরাও আমল দিতে চাইলো না। চারিদিকে শুধু টিকটিকি পুলিশের ছড়াছড়ি, এরা সব বিপ্লবী, চোখে চোখে এদের রাখ্‌তেই হ'বে—নইলে সাম্রাজ্য যায় রসাতলে! সাধারণ লোকত ভয় পাবেই, বন্ধু-বান্ধবের অবস্থাও তাই—

তাহ'লে এঁরা যায় কোথায়? শরৎচন্দ্র এগিয়ে এলেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তিনি। সাঙ্গোপাঙ্গোদের ডাক দিয়ে ব'ল্‌লেন, তোমরা মুক্ত রাজবন্দীদের নাগরীক সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করো। শুধু তাই নয়, এমন জমকালো ক'র্‌তে হ'বে, যাতে দেশের moral impression-টা, রীতিমত একটা দানা বেঁধে ওঠে। ওরা দেশের জন্যে রক্ত দিয়েছে, জেল খেটেছে, তাদের বি. পি. সি. সি. বরণ

না ক'র্‌তে পারে, কিন্তু বরণ আমাদের ক'র্‌তেই হ'বে—তোমরা তৈরী হও। সমস্ত ব্যবস্থার আয়োজন কর।

অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হ'ল। শরৎচন্দ্র হ'লেন চেয়ারম্যান। তাঁর সমস্ত সঙ্কোচ, লজ্জা, কুণ্ঠা ধুয়ে-মুছে গেল। সেই স্বল্পবাক্ শরৎচন্দ্র মুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন। নিরীহ অলস শরৎচন্দ্র হ'লেন, কর্ম্মঠ ও বেগবান্। নিজে তাঁদের সম্বর্দ্ধনাপত্র পাঠ ক'র্‌লেন। গদগদ ভাষে ব'ল্‌লেন, 'দেশের জন্যে এরা জীবন উৎসর্গ ক'রেছে, যৌবন উৎসর্গ ক'রেছে, সর্ব্বস্ব উৎসর্গ ক'রেছে, এরাই দেশের অগ্রদূত। সরকার এ'দের ভয় ক'রে, কারণ তাঁরা জানে, এঁদের তপস্যায় রচিত হ'বে তাদের ধ্বংসের মন্ত্র। কিন্তু তাঁদের সহস্র চেষ্টা পারেনি এদের মনের অপরাজেয় বল ও অন্তরের অনির্ব্বাণ স্বাধীনতার স্বপ্নকে বিচূর্ণ ক'র্‌তে! এরা চিরজীবি, চিরতরুণ, চিরচঞ্চল। দেশের তরুণদের আমি বলি, তোমাদের এত বড় আপন জন, এত বড় জীবন্ত আদর্শ আর কেউ নেই!…'

শরৎচন্দ্র যা চেয়েছিলেন ঠিক্ তাই হ'ল। হাওড়া টাউন হলে এই সম্বর্দ্ধনা সভার পর বাঙ্‌লার যুবচিত্ত সজাগ হ'য়ে উঠ্‌লো। এদের মন থেকে বিগ ফাইড্ ভেসে গেল। জেলায় জেলায় আরম্ভ হ'ল রাজবন্দী সম্বর্দ্ধনা। বিপিন গাঙ্গুলী, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিষ ঘোষ (অধ্যাপক), সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, প্রতুল গাঙ্গুলী, পূর্ণ দাস প্রভৃতি নেতাদের সভাপতিত্ব ক'রার হিড়িক পড়ে গেল।

* * * *

সুভাষচন্দ্র ফিরে আসার পর শরৎচন্দ্র পুনরায় মুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন। তাঁর বৈঠকখানা রাজনীতির সুর ও লয়ের তালে সরগম হ'য়ে উঠ্‌লো। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর বিপ্লব-যুগের নেতা, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ

দত্ত, জার্মানী-ফেরৎ ডাঃ কানাই গাঙ্গুলী, সন্তোষ মিত্র, হেমন্ত সরকার, জ্যোতিষ ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা ঘনঘন যাতায়াত ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। সোসালিজম্‌ প্রচার সবে সুরু হ'চ্ছে। "ইকনমিক্‌ স্বরাজ" কথাটার প্রচলন এই প্রথম আরম্ভ হ'ল।

শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে শিবপুরে পরপর কয়েকটি বৈঠক ব'স্‌লো। বাংলাদেশে একটি সোস্যালিষ্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনা খাড়া ক'র্‌লেন শরৎচন্দ্র। কাজও আরম্ভ হ'য়ে গেল। পার্টির অফিস স্থাপিত হ'ল ক'ল্‌কাতায় অক্রুরদত্ত লেনে।

এই সময়ে গার্ডেনরীচে এ. জে. মেইন নামে এক বিলাতী ইঞ্জিয়ারিং কোম্পানির কারখানায় শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট সুরু ক'র্‌লো। সংবাদ পেয়ে সোস্যালিষ্ট পার্টি সাহায্য ক'র্‌তে এগিয়ে গেল। কিছুদিন ধর্ম্মঘট পরিচালিত হওয়ার পর শ্রমিদের জয়লাভ হ'ল। এর পরেই হাওড়ায় মেথর ও ঝাড়ুদার ইউনিয়নের কাজ সুরু ক'র্‌লেন সোস্যালিষ্ট পার্টির শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, অগম দত্ত ও জীবন মাইতি। প্রেসিডেণ্ট হ'লেন ডাঃ প্রভাবতী দাসগুপ্তা। ইউনিয়ন গঠনের কয়েক মাসের মধ্যেই মেথরদের ধর্ম্মঘট সুরু হ'ল। তখন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বরদা পাইন। বিজয় ভট্টাচার্য্য ভাইস চেয়ারম্যান। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং শরৎচন্দ্র।

সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতারা আশীর্ব্বাদ চাইতে এলেন। শরৎচন্দ্র আশীর্ব্বাদ ক'রে সহাস্যে ব'ল্‌লেন, "এবার কি গুরুমারা বিদ্যা আরম্ভ ক'র্‌লে?"

নেতা ব'ল্‌লেন, 'কি ক'র্‌বো বলুন ইউনিয়ন গ'ড়ে তুলে, এখনত আর পিছিয়ে আসা যায় না?'

প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন শরৎচন্দ্র, "না, পিছিয়ে আসা চ'ল্‌বে না। কর্ত্তব্য পালন ক'রে যেতেই হ'বে। সংঘর্ষটা কি জন্যে হ'চ্ছে,

সেটা বড় কথা। কার সঙ্গে হ'চ্ছে, সেটা বড় কথা নয়! সমাজে মেথর আর বেশ্যা, এদের চাইতে worst persecuted আর কেউ নেই। সেই মেথরদের cause নিয়েছো, দ্বিধা সংকোচ নেই—এগিয়ে যাও।"

একসপ্তাহ ধর্ম্মঘট চ'ল্‌লো। সহরের অবস্থা ভয়াবহ রূপধারণ ক'র্‌লো। অনেকে শরৎচন্দ্রকে ব'ল্‌লেন, 'যাঁরা ধর্ম্মঘট করিয়েছে, ওরা ত আপনারই শিষ্য, ওদের ধমক দিয়ে ধর্ম্মঘট উইথ্‌ড্র করিয়ে নিন।'

শরৎচন্দ্র তাঁদের ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন—'No by no means. যারা ধর্ম্মঘট ক'রেছে, তাদের grievence যদি সত্য হয়, তা হ'লে সে সম্বন্ধে সঙ্গত ব্যবস্থা ক'রো তোমরা!'

নির্ম্মল মিত্রম'শায় ধর্ম্মঘট বানচাল করার চেষ্টা ক'র্‌লেন। তিনিও ব্যর্থ হ'লেন। দশম দিনে কতকগুলো মিউনিসিপ্যালিটির জমাদার শচীনন্দন বাবুকে ধ'রে উত্তম মধ্যম দিল (তিনিই ছিলেন ধর্ম্মঘটী দলের নেতা)। কথাটা শরৎচন্দ্রের কানে গিয়ে উঠ্‌লো। তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, "এসব কি? This is sheer cowardice. একটা ছোট ছেলেকে ধ'রে মেরে তোমরা ধর্ম্মঘট ভাঙাতে চাও?"

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি পদ ত্যাগের হুমকী দেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সেইদিনই কমিশনারদের এক জরুরী বৈঠক বস্‌লো। রেভারেণ্ড সি. এফ্. এণ্ডরুজ সাহেবকে মধ্যস্থ মানা হ'ল। তাঁরই মধ্যস্থতায় ধর্ম্মঘটের মীমাংসা হ'য়ে গেল।...

* * *

সুভাষচন্দ্র তখন কর্পোরেশনের মেম্বর। শরৎচন্দ্র হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি। বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে তখন দু'টি তারকা জ্বল্‌জ্বল্ ক'র্‌ছেন। একপাশে জে. এম. সেনগুপ্ত—অন্যপাশে সুভাষচন্দ্র! এই দুই তারকাকে কেন্দ্র ক'রে দু'টি দল নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের

চেষ্টা সুরু ক'র্‌লো। সুভাষচন্দ্র চান বাংলার সংগঠন। জে. এম. সেনগুপ্তের দল তখন ক্ষমতার অধিকারী। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে তরুণ যুব-সমাজ, ছাত্র-সমাজ, বিগ ফাইভ, বিপিন গাঙ্গুলীর দল, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের দল, সরস্বতী প্রেসের দল ও চট্টগ্রামের বিপ্লবী (অস্ত্রাগার লুণ্ঠন) দলের নেতারা, আর সেনগুপ্তর পিছনে অনুশীলন সমিতি, খাদি দল, সন্তোষ মিত্রের দল, গৌরাঙ্গ প্রেসের দল, আর সোস্যালিষ্ট দলের সকলে। সুতরাং মুখোমুখী না হ'লেও ভেতরে চ'লেছে, ক্ষমতাকে আয়ত্ত করার জোর একটা প্রতিযোগিতা। সুভাষচন্দ্রের মুখে হাসি নেই, অথচ দল ছাড়াও রাজনীতির আসরে নামা যায় না।

শরৎচন্দ্র চিরদিন ছিলেন সুভাষ-ভক্ত। এলেন, তাঁর মুক্তিপথের কাণ্ডারী হ'য়ে। তিনি সদম্ভে ঘোষণা ক'র্‌লেন, তোমরা যদি আমাদের পথ না ছাড়ো, আমরা তরুণ যুব ও ছাত্রসমাজ নিয়ে পৃথক দল গঠন ক'র্‌বো! দেখি, আমাদের পথ রোধ্‌ করে কে?

মীমাংসার পথ খোলা হ'য়ে গেল। কারণ দেশের যা কিছু সম্বল—সে ত' যুবসম্প্রদায় ও ছাত্রসমাজ! উভয়েরই আধিপত্য তাদের ওপর। সুতরাং আপোষ মীমাংসা ক'রে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত!

সুভাষচন্দ্রের মুখে হাসি ফুট্‌লো। কারণ আত্মকলহ তিনি কোনদিন পছন্দ ক'র্‌তেন না। ক্ষমতার একচেটে অধিপত্য নইলে কাজ করা যায় না, অথচ সে বস্তুটাও যে কারও মৌরসী পাট্টাভুক্ত নয়—সে চেতনা তাঁর সকল সময়ে ছিল ব'লেই তিনি তাঁর সহকর্মীদের বার বার ব'ল্‌তেন, যে ক'র্‌বে কাজ, ক্ষমতার অধিকারী তাকে হ'তেই হ'বে—নইলে কোন কিছুই সম্পাদন সম্ভবপর নয়'! তাই ব'লে, কাজও ক'র্‌বো না—পথও ছাড়্‌বো না, সে কথা দেশবাসী শুন্‌বে কেন? ব'ল্‌লেন—আমায় আপনি বাঁচালেন, দাদা!

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—যেমন তুমি ভালমানুষ! মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়্‌তে হয়, নইলে কাজ হাসিল হয় কি কখনও!

* * * *

সেই বছরেই বিশিষ্ট পাঠক ও বন্ধু সম্প্রদায় তাঁর প্রথম জয়ন্তী উৎসবের ব্যবস্থা ক'র্‌লেন। সুবোধ রায়, অনুরূপ নারায়ণ প্রমুখ স্থানীয় বিশিষ্ট অধিবাসীদের সাহায্যে, সমারোহে জয়ন্তী-উৎসব পালন করা হ'ল। সে উৎসবে দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও যোগ দিয়ে অনুষ্ঠানটিকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে তুল্‌লেন।

* * * *

কর্‌পোরেশনের মেয়রের ঘরে ব'সে ছিলেন, সুভাষচন্দ্র ও বীরেন্দ্রনাথ (শাসমল)। শরৎচন্দ্র ভেতরে ঢুক্‌লেন। উভয়েই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সুভাষচন্দ্র নিজের আসনটি শরৎচন্দ্রের জন্যে ছেড়ে দিলেন।

শরৎচন্দ্র বাধা দিয়ে ব'ল্‌লেন—না—না, তা হয় না, সুভাষ! যার যা আসন, তাকে তা' গ্রহণ ক'র্‌তেই হয়, নইলে কাজ করা কি সম্ভব কোনদিন?

সুভাষচন্দ্র বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যস্ত হ'লেন। শরৎচন্দ্র সহাস্যে উত্তর দিলেন—উনি আমার পূর্ব্ব-পরিচিত। দেশবন্ধুর আমলের পুরাতন বন্ধু। তারপর চেয়ারটায় চেপে বসে ব'ল্‌লেন—আজ তোমাদের সঙ্গে আমি ঝগড়া ক'র্‌তে এসেছি!

সুভাষচন্দ্র সবিস্ময়ে ব'ল্‌লেন, দোহাই দাদা, ও কাজটি ক'র্‌বেন না!

শরৎচন্দ্র সহাস্যে টেবিল চাপ্‌ড়ে ব'লে উঠ্‌লেন—আল্‌বৎ ক'র্‌বো। দেশের লোকগুলো প্রতি বছর না খেয়ে ম'র্‌ছে, প্রতি বর্ষায় বন্যায় ভেসে যাচ্ছে, যদি তাদের দিকে না তাকাবার অবসর পেলাম ত' নেতা

হ'লাম কিসের ? বীরেন্দ্রনাথকে সাক্ষী রেখে ব'ল্‌লেন—বলুন বীরেনবাবু, এই যে অভিযোগ আপনার কাছে ক'র্‌লাম—তা কি এতটুকু বাড়িয়ে ব'লেছি ?

বীরেন্দ্রনাথ উত্তরে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, আপনার অভিযোগটাকে অস্বীকার ক'র্‌বার উপায় এতটুকুও আমার নেই !

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—আজ আমার অভিযোগের পালা—তোমাদের অনুযোগ যদি কিছু থাকে, স্বচ্ছন্দে ক'র্‌তে পারো। মনে রেখো সুভাষ, আজ তুমিও আমার কাছ থেকে বাদ প'ড়্‌বে না !

সুভাষচন্দ্র বেয়ারাকে চা আন্‌তে পাঠালেন।

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, একটু জল্‌দি আসিস্‌ বাবা, গলাটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হ'য়ে গেছে। আজ পেয়েছি দু'টি রত্নকে—একেবারে একসঙ্গে—এমন সুযোগ হারালে জীবনের অনেকখানি অংশ আপ্‌শোষ ক'রে ম'র্‌তে হ'বে।

বীরেন্দ্রনাথ মৌনতা ভেঙ্গে ব'ল্‌লেন—আজ দাদার মেজাজটা—

বাধা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র ব'লে উঠ্‌লেন, খাসা আছে। নইলে প্রাণখুলে কথা বলার অবসর পাবো কেমন ক'রে, বলুন !

বেয়ারা চা দিয়ে গেল। কাপে চুমুক দিয়ে শরৎচন্দ্র মুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন—আঃ, প্রাণটা এতক্ষণে জুড়োলো—কিন্তু বীরেনবাবু, আপনাকে আজ আমি সহজে ছাড়্‌ছি না। বহুদিনের বহু বিক্ষোভ, অন্তরে আমার জমা হ'য়ে আছে।

সুভাষচন্দ্র তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, ভয় পেয়েছো ত' ? কিন্তু তোমাদের মত বীরপুরুষদের ভয় দেখানোর মত শক্তি আমার নেই ! হ্যাঁ, শুনুন বীরেনবাবু, নদীর তীরে বাস করি, সুতরাং পারের খবর নিত্যই চোখে ভাসে। রূপনারায়ণের উচ্ছ্বাস আর গ্রামবাসীর হাহাকার—সত্য ব'ল্‌ছি, আমায় এত পীড়া

য়েয়—তা আপনাকে বুঝিয়ে বলি কেমন ক'রে?—এ ঘটনাটা তো একদিনের নয়—প্রতিটি বছরের। এর কি কোন বিহিত আপনারা ক'র্‌তে পারেন না? দেখুন, নিজের চোখে ত' দেখ্‌তে পাই—যারা গ্রামবাসী, তারা শুধু মূক ও বধির নয়, রোগ-শোকেও জরাজীর্ণ। তার উপর আছে রাজনীতির ঢেউ। সত্যই ও লোকগুলোর সহনশীলতাকে আমি শ্রদ্ধা করি, বীরেনবাবু! আপনারা ও-জেলার নেতা—যদি তাদের মুখের দিকে না তাকান তো, তাদের হ'য়ে কে প্রতিবাদ ক'র্‌বে বলুন?

বীরেনবাবু লজ্জায় কিছুক্ষণ মাথা নত ক'রে রইলেন। ব'ল্‌লেন, জানেন ত' আমি কাঁথির লোক, ওখানের ব্যাপার আমি ঠিক্ ভাল ক'রে জানি না—তবে আপনাকে কথা দিচ্ছি—এবিষয়ে আমি সমস্ত খোঁজ-খবর নিয়ে, যা হয় একটা ব্যবস্থার চেষ্টা ক'র্‌বো।

আবেগে শরৎচন্দ্র তাঁর হাতটা চেপে ধ'রে ব'ল্‌লেন, শুধু চেষ্টা নয় বীরেনবাবু, একটা বিহিত আপনাকে ক'র্‌তেই হ'বে! তারাও ত মানুষ! সহ্যের বাঁধটা যদি একবার ধ্বসে যায়—তাদের দ্বারা কি কোনদিন আর কাজ পাওয়া সম্ভব হ'বে?

বীরেন্দ্রনাথ ব'ল্‌লেন, বার বার ও-কথা স্মরণ করিয়ে লজ্জা দেবেন না দাদা, আমার চেষ্টার ত্রুটি হ'বে না—আপনাকে আমি আশ্বাস দিতে পারি।

শরৎচন্দ্র তখনও তাঁর হাতটা ধ'রে ছিলেন আপন মুষ্টির মধ্যে। একটু জোরে চাপ দিয়ে ব'ল্‌লেন, জানি, আমি অরণ্যে রোদন ক'র্‌ছি না, লোহার মানুষকে একটু তাতিয়েই দিচ্ছি—কাজটা বরং হ'বে একটু ভাল ক'রেই!

বেয়ারা পুনরায় চা দিয়ে গেল। সুভাষচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ক'র্‌লেন, ব্যাপার কি সুভাষ?

সুভাষচন্দ্র সহাস্যে উত্তর দিলেন—এ ত' বাঁধাধরা কথা, দাদা! এক কাপে আপনার মন বসে না!

শরৎচন্দ্র হেসে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, এর সঙ্গে যদি একটু আফিংএর ব্যবস্থা ক'রে রাখ্‌তে সুভাষ,—সত্যি ব'ল্‌ছি, তোমার এ ঘর ছেড়ে আমি একটি পা-ও আর ন'ড়্‌তাম না!

সবাই হেসে উঠ্‌লেন। শরৎচন্দ্র গম্ভীর হ'য়ে কাপটিতে শেষ চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, জানতো হাসির পরেই কান্না—এবার তোমার পালা।

সুভাষচন্দ্র সহাস্যে ব'ল্‌লেন, বলুন!

শরৎচন্দ্র একটু থেমে কি যেন ভেবে নিলেন। তারপর ব'ল্‌লেন, আমি তোমাদের কংগ্রেসের সঙ্গে কোন সম্পর্কই আর রাখ্‌বো না।

সুভাষচন্দ্র ও বীরেন্দ্রনাথ একসঙ্গে ব'লে উঠ্‌লেন, কেন?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, তোমাদের অহিংসার এই কচ্‌কচানি আমার আর ভাল লাগে না সুভাষ! এরা শুধু মুখেই রাজ্য জয় করে, আর এই মূর্খ দেশবাসীকে ঠকিয়ে দল পাকিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। বলত' বীরেন্দ্রনাথ—চোখ বুজিয়ে আর কতদিন এসব সহ্য করা যায়?

বীরেন্দ্রনাথ ব'ল্‌লেন—আপনারা যদি স'রে দাঁড়ান, এই মূক ও বধির দেশবাসীর হ'য়ে কে ল'ড়্‌বে দাদা?

শরৎচন্দ্র সহসা উত্তর দিতে পার্‌লেন না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে ব'ল্‌লেন, তাই ত তোমাদের এ অহিংসায় আমার বিশ্বাস নেই বীরেন্দ্রনাথ। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কেউ বাইরে গিয়ে আঘাত হান্‌বে, ততক্ষণ এদের মুক্তি আস্‌তে পারে না! এত অত্যাচার এ দেশবাসীর উপর দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে যে, তোমাদের ডাকে তাদের চেতনা ঠিকমত সজাগ হ'য়ে উঠ্‌তে পার্‌ছে না। তার কারণ কি

জানো? তারা এত ক্লান্ত ও শ্রান্ত যে, নিজের শক্তিকে উপলব্ধির অবকাশ তারা পাচ্ছে না। কিন্তু তোমরা কেউ যদি সেই শক্তির পরিচয় দিতে পারো—তাদের নিজেদের শক্তির প্রতি বিশ্বাস পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'বে। তোমাদের শক্তিকে তারা আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে সহস্র গুণ শক্তিশালী হ'য়ে উঠ্‌বে। তখন দেখ্‌বে—পরাধীনতার এই আবেষ্টনী চুর্‌মার্ হ'য়ে যাবে আপনা থেকেই। সেদিন ব্রিটীশ সিংহের দাঁতগুলো যাবে ভেঙে, পালাবে লেজ খাড়া ক'রে! পার্‌বে না সুভাষ?

সুভাষচন্দ্র মাথা নত ক'রে কি যেন তন্ময় হ'য়ে ভাব্‌ছিলেন। বীরেন্দ্রনাথের চোখ দু'টো জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বল্‌ছে।

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, হয়ত তোমরা আমায় আজ কেউ বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌বে না, কিন্তু আমার মন বার বার ব'ল্‌ছে—তোমাদের এই দু'টির মধ্যেই সেই শক্তি ঘুমিয়ে র'য়েছে। আমি জানি সরস্বতীর মানসপুত্র তোমরা,—তোমরা অজেয়। বিপ্লবীরা রেখে গেছেন তাঁদের পায়ের ছাপ—পার্‌বে না সুভাষ, সে স্বপ্নকে সফল ক'রে তুল্‌তে?

কক্ষটি নিস্তব্ধ। শরৎচন্দ্র উত্তেজনায় অধীরভাবে পদচারণা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। বীরেন্দ্রনাথ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলেন। সুভাষচন্দ্র মাথা নীচু ক'রে ব'সে তেমনি তন্ময় হ'য়ে কি যেন ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। কোন চেতনা যে তাঁর আছে, সহসা বোঝ্‌বার কোন উপায়ই রইলো না।

শরৎচন্দ্র স্থান-কাল-পাত্র সমস্তই ভুলে গেলেন। সুভাষচন্দ্রের পিঠে হাতখানি রেখে ব'ল্‌লেন—আমার "পথের দাবীর" সব্যসাচীর স্বপ্ন, কোন-দিন মিথ্যা হ'তে পারে না, সুভাষ! চলো, আমায় তোমরা একটু এগিয়ে দিয়ে আস্‌বে!

* * * *

শিবপুরে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলন হ'ল। শরৎচন্দ্রের

প্রিয়তম শিষ্য ও সহকর্ম্মীরা তাঁকে ঐ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানাতে এলেন। দলাদলির ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। শরৎচন্দ্র মনে-প্রাণে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, 'আমি যাবো না।'

কেন যাবেন না? হাওড়া জেলা কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলনী, আপনি যাবেন না কি রকম?

ওখানে সুভাষের নিমন্ত্রণ হয়নি। শিবহীন যজ্ঞে আমি যেতে পারিনে!

একজন সহসা মনের ক্রোধ প্রকাশ ক'রে ফেল্‌লেন—আপনার সুভাষ শিব নয়, ভূত!

শরৎচন্দ্র উত্তরে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন না। বরং স্মিতহাস্যে জবাব দিলেন—ভূত নয়—বলো ভূতনাথ!

কর্ম্মীর দল ক্ষোভ প্রকাশ ক'র্‌লেন—আমরা কি আপনার কেউ নই?

সজল-নয়নে শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন—তোমরাও আমার অনেকখানি! কতখানি যে তা মাপাও যায় না।

তবুও যাবেন না? সমস্বরে প্রশ্ন উঠ্‌লো।

শরৎচন্দ্র দৃঢ় অথচ নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন—সবাইকে ছাড়্‌তে পারি—সুভাষকে পারিনে!

* * *

ওপারের বাঁধ্ ভাঙার শব্দ মাঝে মাঝে আস্‌ছে ভেসে। বর্ষার সন্ধ্যা। রূপনারায়ণ মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে গর্জ্জে চ'লেছে। শরৎচন্দ্র তাঁর আরাম কেদারাটায় চুপ্‌চাপ্ শুয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছেন—সেই দুর্জ্জয় প্রকৃতির খেলা।

মাল বোঝাই নৌকোগুলো পাল উড়িয়ে চ'লেছে ধীরে ধীরে। পিছনের পাখা-ঘোরা ষ্টীমারটা ভোঁ দিয়ে চ'লেছে এগিয়ে—নির্জ্জীব

মেষ-শাবকের মত। তার আর সেই দুর্জ্জয় প্রতাপ নেই—কোন রকমে গন্তব্য স্থলে পৌছতে পার্‌লেই যেন বেঁচে যায় সে এযাত্রা।

বহুক্ষণ তামাক খাওয়া হয়নি। মনটা আন্‌চান্‌ ক'রে উঠ্‌লো। ডাক্‌লেন, কে আছিস্‌রে ?

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর আবার ডাক্‌ দিলেন—গোপাল, ও গোপাল—গেলি কোথায় রে ?

উত্তর আসার পূর্ব্বেই দেখ্‌তে পেলেন একটা ভাঙা ছাতা মাথায় দিয়ে আসছে গোপাল। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, কোথায় গিয়েছিলি রে ?

বাবুর মুখোমুখি হ'তে হ'বে, এতখানা গোপাল আশা করেনি। ব'ল্‌লো—আমার এক দুর-সম্পর্কের আত্মীয় মারা গেল, দেখ্‌তে গিয়েছিলাম।

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, হাত-পা ভাল ক'রে ধুয়ে একটু তামাক দিয়ে যা' !

গোপাল তামাক সেজে নিয়ে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, মারা গেল—কি হ'য়েছিল রে ?

গোপাল ব'ল্‌লো—অত নাম কি আমরা জানি বাবু ! একটু থেমে পুনরায় ব'ল্‌লো—এই বর্ষা বাদলে—পোড়ানোই কষ্টকর হ'বে।

শরৎচন্দ্র অন্যমনা হ'য়ে পড়েছিলেন। ব'ল্‌লেন, তা'ত হ'বেই ! তুই চলে এলি যে ? এ দুর্দ্দিনে দু'একজন লোক বেশী থাকা ত উচিত ! কাউকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিলেই ত পার্‌তিস্‌ !

গোপাল ব'ল্‌লো, পেরেশ্চিত্তি না ক'র্‌লে কি মড়া ছোঁয়া যায় ?

শরৎচন্দ্রের চমক্‌ ভেঙে গেল। খাড়া হ'য়ে ব'স্‌লেন। ব'ল্‌লেন, মড়ার আবার প্রায়শ্চিত্ত কিরে ? তাই বুঝি পালিয়ে এসেছিস্‌ ? যা—যা—কোন ভয় নেই—আমি ব'ল্‌ছি !

খুব খারাপ রোগ হ'য়েছিল বাবু !

কি হ'য়েছিল ?

গিন্নিণী না কি বলে! পেরেশ্চিত্তি না ক'র্লে ছুঁতে নেই—পড়্শীরা ব'ল্লে।

শরৎচন্দ্র ব্যাপারটা চকিতে বুঝেনিলেন। ব'ল্লেন, তাদের বাড়ীতে আর আছে কে রে ?

একটা দশ-বারো বছরের ছোট ছেলে।

তাহ'লে তারাও ছুঁবে না, বল ?

শুনে এলাম ত তাই !

শরৎচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। ব'ল্লেন—গামছাটা নিয়ে আমার সঙ্গে যাবি চল্ !

গোপালের মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল। এখানেও সেই আজন্মের সংস্কার! শরৎচন্দ্র আর জিদ্ ক'র্লেন না। বেরিয়ে প'ড়্লেন জলবৃষ্টির মধ্যেই।

শ্মশানে যখন গিয়ে পৌঁছলেন, তখন অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। দূরে দেখ্লেন, একটি ছোট ছেলে মৃতদেহটা কখনও কাঁধে, কখনও বা টান্তে টান্তে নিয়ে আসছে। শরৎচন্দ্র তার সাম্নে গিয়ে দাঁড়ালেন। ব'ল্লেন, তোমার ভয় নেই, তুমি বরং কোদালটা নিয়ে এগিয়ে চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি এঁকে।

শরৎচন্দ্র পরমুহূর্ত্তেই মৃতদেহটা কাঁধে তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে জলকাদার মধ্যে চ'ল্লেন এগিয়ে।

পড়্শীরা মৃতদেহ বইতে রাজী না হ'লেও, পোড়াবার ব্যবস্থাটা ক'রে রেখেছিল, তাও ছোট ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে।

যারা উপস্থিত ছিল তারা সবিস্ময়ে প্রশ্ন ক'র্লো—আপনি ?

শরৎচন্দ্র মৃদু হাস্লেন। ব'ল্লেন, না এলে ত' ছেলেটাকেও আর ঘরে ফিরে যেতে হ'ত না !

তাদের মধ্য থেকে কে একজন ব'লে উঠ্‌লো,—আপনি বামুন, আমরা যে দুলে! পাপ কি সইবে?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, মড়ার কি জাত আছেরে ভাই!

তারা উত্তর দিল না। দূরে ব'সে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি যেন বলাবলি ক'র্‌তে লাগ্‌লো। শরৎচন্দ্র ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে চিতার পাশে গিয়ে ব'স্‌লেন!

দম্‌কা হাওয়ার মধ্যেও তাদের একটা কথা স্পষ্টতর হ'য়ে উঠ্‌লো—সমাজ···?

শরৎচন্দ্র মুখ ফিরিয়ে হাস্‌লেন! ব'ল্‌লেন, ভয় নেই ভাই! যে একঘরে আছে, তাকে নতুন ক'রে ত' আর শাস্তি দেওয়া যাবে না—সে সব কিছুর যে বাইরে!

তারা কি যেন উত্তর দিতে গেল। ঠিক সেই সময়ে মড়ার মাথার খুলিটা 'ফট্' ক'রে ফেটে গেল। আগুনটা একটু জোরে জ্বলে উঠ্‌লো। ছেলেটা সভয়ে তাঁর হাতটা চেপে ধ'র্‌লো।

শরৎচন্দ্র মাথায় তার ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, ভয় কি খোকা? আমি ত তোমার সঙ্গে র'য়েছি!

* * *

শরৎচন্দ্রের শরীর খারাপ হ'তে সুরু ক'র্‌লো। তিনি সাহিত্য-সেবায় মন দিলেন। বেরুলো 'রমা'। ডাক্ প'ড়্‌লো সুরেন্দ্রনাথের। তাঁর সেবা নইলে, তিনি সুস্থ হ'তে পার্‌বেন না—এই হ'ল তাঁর শেষ অভিমত। সুতরাং চিঠি গেল, আমার শরীর খারাপ, তুমি চলে এসো সুরেন!

সুরেনবাবু, ভাগলপুর থেকে ছুটে এলেন। কিন্তু বড়-মা মোটেই খুশী হ'তে পার্‌লেন না। তিনি শরৎচন্দ্রকে ভালবাসেন অন্তরের চেয়েও

বেশী। এ পৃথিবীতে দেব-দেবী আছেন, তিনি বিশ্বাস করেন কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর কাছে, সাক্ষাৎ সেই প্রতিমূর্ত্তি। তাঁর সেবার অধিকার —তাঁর একার। অন্য কেউ সেখানে অংশ গ্রহণ ক'রে, তা' সহ্য ক'র্তে তিনি রাজি নন্। সুতরাং অন্তর-দ্বন্দ্ব সুরু হ'য়ে গেল। সকল কাজেই তিনি এগিয়ে যান—কোন কিছুই ক'র্তে দেন না সুরেন্দ্রনাথকে।

বিরক্তি-বোধ করেন শরৎচন্দ্র। মামার সেবা মন তাঁর চায়—কিন্তু বড়-বৌ তা হ'তে দেবে না! তিনি বোঝেন, দুর্ব্বলতা তাঁর কোথায়!

ডাক্তারের নির্দ্দেশ: ভেজিটেব্‌ল্ জুস্ তাঁকে খেতে হ'বে।

সুরেন্দ্রনাথ তৈরী ক'র্তে গেলেন—বড়-মা তা' ক'র্তে দিলেন না। স্বামীকে নিজের হাতে না খাওয়ালে, তৃপ্তি কি তিনি পেতে পারেন একটি মুহূর্ত্ত! সুতরাং সেইমত ব্যবস্থাও তিনি ক'র্লেন।

শরৎচন্দ্রের আহারে রুচি চলে গেল। ভাল লাগ্‌ছে না মোটেই! এসব অখাদ্য কি খাওয়া যায় কোনদিন?

সুরেন্দ্রনাথ আশ্বাস দিলেন—আচ্ছা, কাল আমি নিজের হাতে তৈরী ক'রে দেবো, কেমন না ভাল লাগে তোমার!

বড়-মা কিছুতেই রাজী হ'লেন না। শরৎচন্দ্র রাগ ক'রে গুম্ হ'য়ে ইজি-চেয়ারে শুয়ে রইলেন। অগত্যা রাজী হ'তে হ'ল বড়-মাকে!

সুরেন্দ্রনাথ, রোগীর পথ্য তৈরী ক'রে নিয়ে এলেন। বড়-মা পাশে ব'সে পাখার বাতাস ক'র্ছিলেন। মুখে তাঁর চাপা ব্যঙ্গ-হাসি। দেখাই যাক্—মামার রান্না কেমনতর লাগে? মনে অবশ্য একটা গর্ব্ব লুকানো ছিল, তাঁর মত রান্না রাঁধ্‌তে পার্‌বে না কেউ সহজে!

কিন্তু নিরাশ হ'তে হ'ল হিরণ্ময়ীদেবীকে। শরৎচন্দ্র পরম তৃপ্তি সহকারে সবটুকু শেষ ক'রে ব'ল্লেন—চমৎকার রেঁধেছো মামা! বার বার বড়-বৌকে বলি—মামাকে দাও—এসব কাজ তুমি পার্‌বে না—কিন্তু কথা কি আমার ও কাণে তুল্‌বে কোন সময়ে?

বড়-মা গম্ভীর হ'য়ে তেমনি পাখার বাতাস ক'রতে লাগ্‌লেন।

শরৎচন্দ্র সে মুখের দিকে তাকিয়ে একটু কৌতুক বোধ ক'রলেন। ব'ল্‌লেন, বেলা হ'য়েছে, এবার মামার খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রবে না বড়-বৌ?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালেন হিরণ্ময়ীদেবী।

শরৎচন্দ্র মৃদু অনুযোগ ক'রলেন—আমার অসুখের পর থেকে তুমি যেন কেমনতর হ'য়ে গেছ বড়-বৌ! এমন ত ছিলে না কোনদিন?

হিরণ্ময়ীদেবী উত্তর দিলেন না। শুধু আড়-চোখে শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে এক ঝলক অগ্নিবর্ষণ ক'রে উঠে গেলেন ভেতরে।

শরৎচন্দ্র এবার প্রাণখুলে হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—বুঝ্‌লে মামা—ও আমাকে ভালবাসে ঠিক্ পশু-পাখীর মত। একেবারে একান্তে! কোথাও এতটুকু ফাঁক পর্য্যন্ত নেই। দেখ্‌ছো না—তোমার সঙ্গে ব্যবহার ক'রছে ঠিক যেন সতীনের মত!

* * * *

ঘোষালবাড়ীর সঙ্গে মুখুজ্জে বাড়ীর একটা খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে গেল জলকর নিয়ে। জায়গাটা ঘোষালদের, কিন্তু মোক্‌রারী মৌরোসী স্বত্বে ভোগ-দখল ক'রছিলেন মুখুজ্জেরা। মোহিনী ঘোষালম'শাই চাইলেন বাঁধ কাটিয়ে নদীর সঙ্গে যোগ ক'রে দিতে, কিন্তু বাধা দিলেন মুখুজ্জেরা।

প্রথমে কথা কাটাকাটি, পরে লাঠালাঠি। শেষ পর্য্যন্ত কোর্টে গিয়ে মামলা রুজু ক'রলেন ঘোষালম'শায়। ১০৭ ধারা করা হ'ল মুখুজ্জে-ম'শায়দের বিরুদ্ধে, ৩৭৯ ধারা জেলেদের বিরুদ্ধে মাছ চুরি করার অপরাধে। আর যেহেতু, শরৎচন্দ্র মুখুজ্জেম'শায়ের আত্মীয়, জেলেদের পৃষ্ঠপোষক, সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা হ'ল ৫০৪ ধারা।

১০৭ ধারা ও ৩৭৯ ধারার নিষ্পত্তি হ'লে উলুবেড়ে কোর্টে, আর ৫০৪ ধারার কেশটি পানিত্রাস স্কুলের হেড-মাষ্টারম'শাই শরৎ মিত্র ম'শায়ের উপর সালিশী ক'রে মিটিয়ে দেওয়ার ভার প'ড়্‌লো। তিনিই অবশেষে আপোষে একটা মিট্‌মাট্‌ ক'রে দিলেন!

ক্ষয়-ক্ষতি হ'ল উভয় পক্ষের—তবে এই মামলাকে কেন্দ্র ক'রে গ্রামে যে আলোড়নের সৃষ্টি হ'য়েছিল—সেটা পল্লী-সমাজে রমা-রমেশের মামলার চেয়ে কোন অংশেই হীন নয়!

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালন শক্তি ১৯২৭ সালের পর কংগ্রেসী দলের হস্তগত হ'য়েছিল। প্রথমবারে, বরদা পাইনম'শায় হ'লেন চেয়ারম্যান, খগেন গাঙুলী ম'শাই হ'লেন ভাইস্‌-চেয়ারম্যান। দ্বিতীয়বারে, পাইনম'শায় চেয়ারম্যান ও বিজয় ভট্টাচার্য্য ম'শায় হ'লেন ভাইস্‌-চেয়ারম্যান। কিন্তু তৃতীয়বারের ইলেক্‌সানে মতভেদ দেখা দিল। কংগ্রেসী দলেও ভাঙন সুরু হ'ল। শিবপুর দল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগে গেল।

ইলেক্‌সানে জয়ী হ'লেন পাইনম'শায়, ভোলা রায়, বেণী দত্ত, বঙ্কিম দত্ত, বিজয় মুখুজ্জে, বিজয় ভট্টাচার্য্য, শৈলেন মুখুজ্জে। শরৎচন্দ্র, বরদা পাইন ম'শায়ের উপর ভার দিলেন, একটা মিট্‌মাট্‌ ক'রে নেওয়ার আশায়। কারণ আত্মকলহে দলগত স্বার্থ-ক্ষুণ্ণ হ'বে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হিসাবে লোক-চোখে হেয় হ'য়ে পড়্‌বে! সুতরাং যে-কোন উপায়েই হোক্‌ মিটমাট্‌ একটা ক'রে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়!

বরদা পাইন ম'শাই জরুরী সভার আহ্বান জানালেন—ব্যবস্থা হ'ল, পাইনম'শায় হবেন চেয়ারম্যান—বিজয় ভট্টাচার্য্য ম'শায় হবেন ভাইস্‌-চেয়ারম্যান, কিন্তু পাইন ম'শায় সভাতে উপস্থিত না থাকায়, শিবপুর দল চেয়ারম্যান ক'র্‌লেন বঙ্কিম দত্ত ম'শায়কে, আর ভাইস্‌-চেয়ারম্যান হ'লেন বিজয় মুখার্জ্জী। দলের শক্তি ক্ষুণ্ণ হ'ল। সংবাদ পাওয়া মাত্র,

শরৎচন্দ্র ফোনে বরদা পাইনম'শায়কে মনের ক্ষোভ জানালেন, হায় বরদা—ক'র্‌লে কি ?

ফোনটা বোধ হয় অন্য কোন লাইনের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে গিয়েছিল। কথাটা বিপক্ষ দলের কানে গিয়ে উঠ্‌লো। টিট্‌কারি সুরু হ'ল—'হায় বরদা ক'র্‌লে কি !…হায় বরদা ক'র্‌লে কি !'

শরৎচন্দ্র এই 'হায় বরদা ক'র্‌লে কি'র, জন্য ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। চ'ল্‌তে ফির্‌তে শুধু একটি কথা—"হায় বরদা ক'র্‌লে কি ?"

ঘোষালদের সঙ্গে মামলা মিটে গেলেও, মনের ক্ষোভ তখনও ম্লান হয়নি। কথাটা রাষ্ট্র হ'য়ে সুদূর সামতাবেড়ে গিয়েও পৌছালো। ফলে, শরৎচন্দ্রের রাস্তা চলা বন্ধ হ'ল। তখন রূপনারায়ণের জলপথই রহিল উন্মুক্ত। এই ঘটনার পর কিছুদিন তিনি নৌকাযোগে কোলাঘাট হ'য়ে রেলপথে যাতায়াত শুরু ক'র্‌লেন।

* * * *

১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাদ্র, ইউনিভার্‌সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে, শরৎচন্দ্রের ত্রি-পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে দেশবাসীর পক্ষ থেকে এক অভিনন্দন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল। তার উত্তরে তিনি ব'ল্‌লেন :—

'এই যে আমার জন্মতিথি উপলক্ষ্য ক'রে আনন্দ প্রকাশের আয়োজন—আমি জানি, এ আমার ব্যক্তিকে নয়। দরিদ্র গৃহে আমার জন্ম ; এইতো সেদিনও দূর প্রবাসে তুচ্ছ কাজে জীবিকা অর্জনেই ব্যাপৃত ছিলাম, সেদিন পরিচয় দেবার আমার কোন সঞ্চয়ই ছিল না। তাইতো বুঝ্‌তে আজ বাকী নেই—এ শ্রদ্ধা নিবেদন কোন বিত্তকে নয়, বিদ্যাকে নয়, এ শুধু আমাকে অবলম্বন ক'রে সাহিত্য-লক্ষ্মীর পদতলে ভক্ত-মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন।

জানি এ সবই, তবুও যে-সংশয় মনকে আজ আমার বারংবার নাড়া দিয়ে গেছে সে এই যে, সাহিত্যের দিক দিয়েই এ মর্য্যাদার যোগ্যতা কি আমি সত্যই অর্জন ক'রেছি! কিছু করিনি একথা আমি ব'লবো না। কারণ এত বড় অতিবিনয়ের অত্যুক্তি দিয়ে উপহাস ক'রতে আমি নিজেকেও চাইনে, আপনাদেরও না। কিছু আমি ক'রেছি। বন্ধুরা বলেন যে, শুধু কিছুই নয়, অনেক কিছু, তুমি অনেক ক'রছো। কিন্তু তাঁদের দলভুক্ত যাঁরা নয়, তাঁরা একটু হেসে ব'লবেন, 'অনেক নয়, তবে সামান্য কিছু ক'রেছেন, এইটিই সত্য এবং আমরাও তাই মানি। কিন্তু তাও বলি যে, সে সামান্যের উর্দ্ধস্থ বুদ্বুদ আর অধঃস্থ আবর্জনা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট যা থাকে কালের বিচারালয়ে তার মূল্য লোভের বস্তু নয়।' এ যাঁরা বলেন, আমি তাঁদের প্রতিবাদ করিনে, কারণ তাঁদের কথা যে সত্য নয় তা কোনমতেই জোর ক'রে বলা চলে না। কিন্তু এরজন্যে আমার দুশ্চিন্তাও নেই। যে কাল আজও আসেনি, সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার লেখার মূল্য থাকবে কি থাকবে না, সে আমার চিন্তার অতীত। আমার বর্ত্তমানের সত্যোপলব্ধি, যদি ভবিষ্যতের সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এক হ'য়ে মিলতে না পারে, পথ ত তাকে ছাড়তেই হ'বে। তার আয়ুষ্কাল যদি শেষ হ'য়েই যায়, সে শুধু এই জন্যেই যাবে যে আরও বৃহৎ, আরও সুন্দর, আরও পরিপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টিকার্য্যে তার কঙ্কালের প্রয়োজন হ'য়েছে। ক্ষোভ না ক'রে বরঞ্চ এই প্রার্থনাই জানাবো যে, আমার দেশে আমার ভাষায় এত বড় সাহিত্যই জন্মলাভ করুক, যার তুলনায় আমার হাতের লেখা যেন একদিন অকিঞ্চিৎকর হ'য়েই যেতে পারে।

নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে একদিন নানা ব্যক্তির সংশ্রবে আসতে হ'য়েছিল। তাতে ক্ষতি যে পৌঁছয়নি তা নয়, কিন্তু সেদিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তারা সকল ক্ষতি আমার পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছে। তারা

মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে—ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্ম্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ, তাকে আত্মা বলাও যেতে পারে, সে তার সকল অপরাধের চেয়ে বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায় আমার হাতের লেখা কোনদিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা আমার অপরাধ ব'লে গণ্য ক'রেছেন এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র নাকি আমার তুলিতে মনোহর হ'য়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সবচেয়ে বড় এই অভিযোগ।

এ ভাল কি মন্দ আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হয় কিনা এ বিচার ক'রেও দেখিনি, শুধু সেদিন যাকে সত্য ব'লে অনুভব ক'রেছিলাম, তাকেই অকপটে প্রকাশ ক'রেছি। এ সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কিনা এ চিন্তা আমার নয়। কাল যদি সে মিথ্যা হ'য়ে যায়, তা নিয়ে কারো সঙ্গে আমি বিবাদ ক'রতে যাবো না। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আমার সর্ব্বদাই মনে হয়, হঠাৎ শুনলে মনে ঘা লাগে, তথাপি এ কথা সত্য ব'লেই বিশ্বাস করি যে, কোন দেশের কোন সাহিত্যই কখনো নিত্য কালের হ'য়ে থাকে না। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মত তারও জন্ম আছে, পরিণতি আছে, বিনাশের ক্ষণ আছে। মানুষের মন ছাড়া তো সাহিত্যের দাঁড়াবার স্থান নেই, মানবচিত্তেই তো তার আশ্রয়! তার সকল ঐশ্বর্য্য বিকশিত হ'য়ে ওঠে যেখানে, সেই মানবচিত্তই যে একস্থানে নিশ্চল হ'য়ে থাকতে পারে না। তার রসবোধ ও সৌন্দর্য্য বিচারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই একযুগে, যে মূল্য মানুষ খুশী হ'য়ে দেয়, আর এক যুগে তার অর্দ্ধেক দিতেও তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না।

মনে আছে দাশুরায়ের অনুপ্রাসের ছন্দে গাঁথা দুর্গার স্তব পিতামহের

কণ্ঠহারে সেকালে কত বড় রত্নই না ছিল! আজ পৌত্রের হাতে বাসি মালার মত তারা অবজ্ঞাত, আজ এতখানি অনাদরের কথা সেদিন কে ভেবেছিল? কিন্তু কেন এমন হয়? কার দোষে এমন ঘট্‌লো? সেই অনুপ্রাসের অলংকার তো আজও তেমনি গাঁথা আছে! আছে সবই, নেই শুধু তাকে গ্রহণ করার মত মানুষের মন। তার আনন্দবোধের চিত্ত আজ দূরে সরে গেছে। দোষ দাশুরায়ের নয়, তাঁর কাব্যেরও নয়, দোষ যদি কোথাও থাকে তো সে যুগধর্ম্মের। তর্ক উঠ্‌তে পারে, শুধু দাশুরায়ের দৃষ্টান্ত দিলেই তো চ'ল্‌বে না। চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলী তো আজও আছে, কালিদাসের কাব্য তো আজও তেমনি জীবন্ত! তাতে শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, তার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ, কিন্তু এর থেকে তার অবিনশ্বরতাও সপ্রমাণ হয় না। তার দোষ-গুণের শেষ নিষ্পত্তি করা যায় না।

সমগ্র মানবজীবনে কেন, ব্যক্তিবিশেষের জীবনেও দেখি এই নিয়মই বিদ্যমান। ছেলেবেলায় আমার "ভবানী পাঠক" ও "হরিদাসের গুপ্ত-কথা"ই ছিল একমাত্র সম্বল! তখন কতরকম কত আনন্দই যে দু'খানি বই থেকে উপভোগ ক'রেছি, তার সীমা নেই। অথচ আজ সেগুলো আমার কাছে নীরস। কিন্তু, এ গ্রন্থের অপরাধ, না আমার বৃদ্ধত্বের অপরাধ, বলা কঠিন। অথচ এমনিই পারিহাস, এমনিই জগতের বদ্ধমূল সংস্কার যে, কাব্য-উপন্যাসের ভালমন্দ বিচারের শেষ ভার গিয়ে পড়ে বৃদ্ধের উপরেই। কিন্তু একি বিজ্ঞান, না ইতিহাস, একি শুধু কর্ত্তব্য, শুধু শিল্পকার্য্য যে, বয়সের দীর্ঘতাই হ'বে বিচার করবার সবচেয়ে বড় দাবী?

বার্দ্ধক্যে নিজের জীবন যখন 'বিস্বাদ', কামনা যখন শুষ্কপ্রায়, ক্লান্তি-অবসাদে জীর্ণ দেহ যখন ভারাক্রান্ত, নিজের জীবন যখন রসহীন, রসের বিচারে যৌবন কি বার বার দারস্থ হ'বে গিয়ে তারই?

ছেলেরা গল্প লিখে নিয়ে গিয়ে যখন আমার কাছে উপস্থিত হয়, তারা ভাবে এই বুড়ো লোকটার রায় দেবার অধিকারই বুঝি সবচেয়ে বেশী। তারা জানে না যে আমার নিজের যৌবনকালের রচনারও আজ আমি আর বড় বিচারক নই। তাদের বলি, তোমাদের সমবয়সী ছেলেদের গিয়ে দেখাও। তারা যদি আনন্দ পায়, তাদের যদি ভাল লাগে, সেইটেই জেনো সত্য বিচার। তারা বিশ্বাস করে না। ভাবে, দায় এড়াবার জন্যই বুঝে একথা ব'ল্‌ছি। তখন নিঃশ্বাস ফেলে ভাবি, বহুযুগের সংস্কার কাটিয়ে উঠাই কি সোজা? সোজ না জানি, তবুও ব'ল্‌বো রসের বিচারে এইটেই সত্য বিচার!

বিচারের দিক্ থেকে যেমন, সৃষ্টির দিক্ থেকেও ঠিক্ এই একই বিধান! সৃষ্টির কালটাই হ'ল যৌবনকাল—কি প্রজা-সৃষ্টির দিক্ দিয়ে, কি সাহিত্য-সৃষ্টির দিক্ দিয়ে। এই বয়স অতিক্রম ক'রে মানুষের দূরের দৃষ্টি হয়ত তীক্ষ্ণতর হয়, কিন্তু কাছের দৃষ্টি তেমনি ঝাপসা হ'য়ে আসে। প্রবীনতার পাকা বুদ্ধি দিয়ে তখন নীতিপূর্ণ কল্যাণকর বই লেখা চলে, কিন্তু আত্মভোলা যৌবনের প্রস্রবণ বেয়ে যে রসের বস্তু ঝরে প'ড়ে, তার উৎসমুখ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। আজ তিপান্ন বছরে পা দিয়ে আমার এই কথাটাই আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন ক'র্‌তে চাই— অতঃপর রসের পরিবেশনে ত্রুটি যদি আপনাদের চোখে পড়ে, নিশ্চয় জান্‌বেন তার সকল অপরাধ আমার, এই তিপান্ন বছরের।'

প্রেসিডেন্সী কলেজে ত্রি-পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উৎসবে প্রেসিডেন্সী কলেজে 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' কর্ত্তৃক যে উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল তার উত্তরে তিনি ছাত্রদের সম্ভাষণ ক'রে ব'ল্‌লেন :

'আপনারা অভিযোগ করিয়াছেন আমি আসি না, তাহার কারণ, বক্তৃতা দিতে হইবে মনে হইলেই আমার হৃৎকম্প হয়। আমি কিছু

বলিতে পারি না, কিন্তু লিখিতে পারি, কিছু কিছু লিখিয়াছিও, তাহাতে যদি খুশী হইয়া থাকেন সুখী হইব। মুখে কিছু বলিয়া উপদেশ দিব, কোন বইয়ের সমালোচনা করিব, কি নতুন কোন মানে প্রকাশ করিব, সে শক্তি আমার নাই। যা আছে বইয়ের মধ্যেই আছে, সেখানে খুঁজুন, আমার বইয়ের সম্বন্ধে ইহার বেশী বলিবার কিছু নাই।

অন্যের বই সম্বন্ধে আমার বিশেষ জানা নাই। নিজে লিখিয়াছি বলিয়া নিজের বই সম্বন্ধেও আমি বড় অথরিটি নই। অন্যান্য গ্রন্থাকারের যা নিয়ে বিপদ ঘটে—প্লট পায় না—সেই প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া লই, তাহাদিগকে ফোটাইবার জন্য যাহা দরকার, আপনি আসিয়া পড়ে। মনের পরশ বলিয়া একটি জিনিষ আছে। তাহাতে প্লট কিছু নাই। আসল জিনিষ কতকগুলি চরিত্র। তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য মনের দরকার। তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়। সে সব আপনি আসিয়া পড়ে। আমার শক্তি কম, তবু, নিজের দেশটিকে আমি বাস্তবিক ভালবাসিয়াছি। এ-কথার মধ্যে কোন প্রবঞ্চনা নাই, যথার্থ ভালবাসিয়াছি। ইহার ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, ইহার জলবায়ু, ইহার দোষ, গুণ, ত্রুটি, দলাদলি—যা কিছু বলো সব নিয়েই বাস্তবিক আমি ভালবাসিয়াছি।

নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া নানা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। মানুষকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে তার ভিতর হইতে অনেক জিনিষ বাহির হয়, তখন তাহার দোষ-ত্রুটিতেও সহানুভূতি না করিয়া থাকা যায় না। অনেকে বলেন, যাহারা সমাজের নিম্ন স্তরে পড়িয়া আছে, তাহাদের উপর আমার সহানুভূতি বেশী! সত্যই তাই!'

* * * *

দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু হ'ল। স্থির হ'য়ে তিনি ব'সে থাকতে পারলেন না। ছুটলেন সুভাষচন্দ্রের কাছে। তখন তাঁর শরীর প'ড়েছে ভেঙে। চেয়ারটায় কিছুক্ষণ নীরবে ব'সে থেকে শরৎচন্দ্র ব'লে উঠ্‌লেন—তোমার শরীর ক্রমশঃই ভেঙে যাচ্ছে, যত্ন নাও সুভাষ!

সুভাষচন্দ্র মৃদু হাস্যে উত্তর দিলেন, অনিয়ম হ'লেও অযত্ন হ'চ্ছে বলাতো চলে না, দাদা!

শরৎচন্দ্র মাথা দুলিয়ে ব'ল্‌লেন—নিশ্চয় হ'চ্ছে। তুমি খেয়াল ক'র্‌ছো না সুভাষ! কিন্তু মনে রেখো, এ বুড়োর কথা এতটুকুও মিথ্যে নয়।

সুভাষচন্দ্র প্রতিবাদ ক'র্‌লেন না, নীরবে শুধু হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—তোমার সুস্থ থাকার প্রয়োজন যে কত, সে কথা তোমায় বোঝানো নিরর্থক। তবুও বলি, সেই সুদিন ওই আগতপ্রায়!

* * *

ডাক এলো মালিকান্দা অভয় আশ্রমে, বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মেলনীর সভাপতিত্ব করার। সেখান থেকে ফেরার পরই তাঁকে ছুটতে হ'ল রংপুরে বঙ্গীয় যুবসম্মেলনীর সভাপতিত্ব করার উদ্দেশ্যে।

বেরুলো "তরুণের বিদ্রোহ"। সুভাষচন্দ্র ও জে. এম. সেনগুপ্ত তিন নম্বর রেগুলেশনে হ'লেন বন্দী।

প্রেসিডেন্সী জেলে খবরের কাগজ সরবরাহ নিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে বাঁধ্‌লো লড়াই।

সুভাষচন্দ্র প্রতিবাদে অনশন সুরু ক'র্‌লেন। শরীর তাঁর ক্রমশঃই ভেঙে প'ড়তে লাগ্‌লো। গান্ধীজীকে টেলিগ্রাম করা হ'ল। তাঁর উত্তরে হতাশ হ'য়ে শরৎবাবু (বসু) অগত্যা শরৎচন্দ্রকে গিয়ে ধ'র্‌লেন—এখন আপনি ছাড়া আর উপায় ত' দেখ্‌ছি না!

শরৎচন্দ্র ছুটলেন প্রেসিডেন্সী জেলে। ডাক্তাররাও তাঁর শরীর সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছেন।

সুভাষচন্দ্র খাটের উপর কাত্ হ'য়ে শুয়ে আছেন। দেহটা তাঁর প্রায় শয্যার সঙ্গেই মিলিয়ে আছে। শরৎচন্দ্র তাঁর পাশের শূন্য চেয়ারটায় চেপে ব'স্‌লেন। ব'ল্‌লেন—শেষে জীবন নিয়ে একি ছিনিমিনি খেলা সুরু ক'র্‌লে সুভাষ?

সুভাষচন্দ্র প্রতিবাদ ক'র্‌তে গেলেন। বাধা দিয়ে শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—রবীন্দ্রনাথের "তাসের-দেশের" নায়ক, শরৎচন্দ্রের "পথের-দাবীর" সব্যসাচী, এই কি তার সাধনা? কোথায় সে শোনাবে ঘুম ভাঙ্গানি গান, ভাঙাবে মোহাচ্ছন্ন দেশবাসীর মোহনিদ্রা, কোথায় ক'র্‌বে রক্তের সাধনা—তার পরিবর্ত্তে একি তুমি ক'র্‌ছো সুভাষ? ওঠো, তাজা রক্ত নিয়ে তোমায় ক'র্‌তে হ'বে খেলা! ভুল্‌লে আজ চ'ল্‌বে না—তুমি বীর। বীরের মৃত্যু তোমায় গ্রহণ ক'র্‌তেই হ'বে। দ্বন্দ্ব তোমার সিংহের সঙ্গে—আর লড়াই সুরু ক'র্‌লে কি না মুষিকের সঙ্গে? ছিঃ ছিঃ, সুভাষ, এ সব কি তোমার শোভা পায়—না মানায়?

সুভাষচন্দ্র নির্ব্বাক! শরৎচন্দ্র তাঁর হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে ব'ল্‌লেন, অনশন ত সারা ভারতবাসী দিনের পর দিন ক'রেই চ'লেছে, তার আবার নতুনত্ব কি? একান্তই যদি ম'র্‌তে হয়, বীরের মত ম'রো। তা'তে আমাদের দুঃখ ক'রার থাক্‌বে না কিছুই! এই যে শুকিয়ে মরা, এর চেয়ে দৈন্য ত এ দুনিয়ায় আর কিছু নেই। বিশ্বাস করো, এটা আমার নিজস্ব স্তুতিবাক্য নয়—আমার অন্তরের অন্তরতমের বাণী। তুমি বাংলা তথা সারা ভারতের বরপুত্র, তোমার বেঁচে থাকার একান্ত প্রয়োজন। ওঠো, আমি নিজের হাতে তোমায় খাওয়াবো আশা নিয়ে এসেছি—নিরাশ ক'রো না ভাই—

সাদরে শরৎচন্দ্র লেবুর রসটি তাঁর মুখের কাছে ধ'র্‌লেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁকে এতখানি শ্রদ্ধা ক'র্‌তেন যে, সহসা প্রতিবাদ ক'র্‌তে পার্‌লেন না। নীরবে গ্লাসে চুমুক দিলেন।

শরৎচন্দ্র সেই সঙ্গে অনশন ভঙ্গ-সর্ত্তের একখানা টাইপ করা কাগজ বা'র ক'রে ব'ল্‌লেন, শুধু তোমার কাছে দাবী আদায় ক'র্‌তে আসিনে ভাই, ভায়ের প্রতিজ্ঞা রাখার ব্যবস্থাও ক'র্‌ছি সেই সঙ্গে।

সুভাষচন্দ্র কাগজখানা তুলে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগ্‌লেন।

আনন্দ-মুখর শরৎচন্দ্র ব'লে উঠ্‌লেন—বাংলার ছেলে, শুকিয়ে ম'র্‌তে যাবে কোন্ দুঃখে? তারা ত কাপুরুষ নয়!

* * *

ভাগলপুরের মায়া তিনি মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত কাটাতে পারেননি। তাই একটু অবকাশ পেলেই ছুট্‌তেন সেখানে। সেবার জগদ্ধাত্রী পূজার পর ক'ল্‌কাতায় ষ্টীমারে ক'রে সুন্দরবন ঘুরে, তবে ফির্‌বেন স্থির হ'ল।

সে পার্টির ম্যানেজার হ'লেন সুরেনবাবু (গঙ্গোপাধ্যায়)। ষ্টীমার চ'লেছে। কাহাল-গাঙের কাছে এসেই শরৎচন্দ্র সহসা চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন, আরে—থামো, থামো।

সুরেনবাবু ছুটে এলেন—ব্যাপার কি শরৎ?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—সারেঙকে ষ্টীমার কয়েক ঘণ্টার জন্যে বাঁধ্‌তে বল!

সুরেনবাবুও নাছোড়বান্দা। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, তোমার হ'ল কি?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন—বেচারা কুকুরগুলো হাঁ ক'রে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় ওদের আহার জোটেনি। সামনেই ত বাজার—একটু বাঁধ্‌তে বলো। দই-চিঁড়ে-মুড়্‌কি কিনে ওদের খাওয়াতে আর কতক্ষণই বা যাবে?

সুরেনবাবু জান্‌তেন শরৎচন্দ্রের কুকুর-প্রীতির দুর্ব্বলতা। থামানো হ'ল ষ্টীমার। তিনি ছুটলেন বাজারে।

বস্তা বস্তা এলো চিঁড়ে-মুড়্‌কি। চাকর গোপাল, নিয়ে এলো কয়েক হাঁড়ি দই। তিনি পরমানন্দে নিজের হাতে মেখে তাদের ভোজন করালেন।

কুকুরগুলো সত্যই অভুক্ত ছিল। তারা একবার শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে তাকায়—আর লেজ নাড়্‌তে নাড়্‌তে তৃপ্তিতে আহার ক'রে চলে।

খাওয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শেষ হ'ল—ততক্ষণ তিনি তাদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলেন। খাওয়া শেষ হ'ল—তিনি ষ্টীমারে উঠে এসে ব'স্‌লেন। ব'ল্‌লেন—সুরেন, এবার তোমরা ষ্টীমার ছাড়্‌তে পারো।

ষ্টীমার ছাড়্‌লো। সুরেনবাবু তখনও তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ স্থিরদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ষ্টীমারটা মোড় ঘুরতেই তাদের আর দেখা গেল না। শরৎচন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন, আজও আমি ভেলির কথা ভুল্‌তে পারিনে, সুরেন! মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় তার নামে একটি কুকুরের আশ্রম করি!

সুরেনবাবু লাফিয়ে উঠ্‌লেন—সেই ভাল! বলতো আমি এখানেই একটা জায়গা দেখি!

শরৎচন্দ্র বুঝ্‌লেন সুরেনবাবু তাঁকে উপহাস ক'র্‌ছেন। ব'ল্‌লেন—ঠাট্টা নয় সুরেন, কথাটা একবার সত্যই ভেবে দেখো!

* * *

হাওড়ার এইচ.এস.পি.সি.-এর অফিসে সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে ব'সে আছেন শরৎচন্দ্র। তিনি সেখানকার সভাপতি। সুভাষচন্দ্র সেখানে

গিয়ে হাজির হ'লেন। কথায় কথায় সুভাষচন্দ্র তাঁর মনের কথা ব্যক্ত ক'রে ব'ল্লেন,—যদি ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কোনদিন হ'তে পারি, তা হ'লে কংগ্রেসকে নোতুন ক'রে ঢেলে সাজাবো!

শরৎচন্দ্র একথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ব'ল্লেন—মিথ্যা দুরাশা!

সবিস্ময়ে সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞাসা ক'র্লেন—কেন?

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—দেশবন্ধুর অবস্থা ত নিজের চোখে দেখেছি, তার পর আর ভরসা কুলোয় না!

সুভাষচন্দ্র ব'ল্লেন—দেশ তখনের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, এ-কথা ত বিশ্বাস করেন!

ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে ব'ল্লেন—সবই বুঝি—সবই দেখ্ছি, কিন্তু মাকাল ফলের রূপ পাল্টায়নি, ভাই!

তার মানে? সুভাষচন্দ্র সকৌতুকে প্রশ্ন ক'র্লেন।

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—যে খোল-নল্‌চের উপর তোমার কংগ্রেস দাঁড়িয়ে র'য়েছে, সেখানে হালে পানি পাওয়া, সত্যই শুধু কষ্টকর নয়—দুরাশাও বটে অনেকখানি! যদি কোন রকমে জিতে যাও, এমন বেড়াজালের সৃষ্টি হ'বে—যেখানে পদত্যাগ ছাড়া দ্বিতীয় পথ আরখোলা থাক্‌বে না কোনদিন।

সুভাষচন্দ্র অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠ্লেন।

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—এই ত' ব'লে রাখ্লাম, ভবিষ্যৎ এর সাক্ষ্য দেবে। তার চেয়ে যা বলি তাই ক'রো—হ্যাঁ, কাজের মত একটা কাজ হ'বে নিঃসন্দেহ!

সবিস্ময়ে সুভাষচন্দ্র ও নীলরতনবাবু তাঁর মুখের দিকে ফিরে তাকালেন।

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—যদি পারো এদেশ ছেড়ে চ'লে যাও। অবশ্য

নীলরতনের সে অবস্থা নেই—পারো একা তুমিই। কারণ তোমার শক্তি ও সুযোগ আছে যথেষ্ট এবং পার্‌বে এ বিশ্বাসও আমি রাখি।

এর উত্তর সুভাষচন্দ্র দিলেন না, নীরবে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে ব'ল্‌লেন, আপনার আশীর্ব্বাদ যেন সত্যই সফল হয়, দাদা!

* * *

রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর যত শ্রদ্ধা, অভিমানও ছিল ঠিক ততখানি। তাই পাশাপাশি দাঁড়াতে বিশেষ সময়ও লাগেনি, আবার সামান্য কারণে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে তাঁদের বাধ্‌তোও না এতটুকু!

সেবার রবীন্দ্রনাথ ক'ল্‌কাতায় এসেছেন। পাড়ার ছেলেরা ধ'র্‌লো, আমরা রবিবাসরের আয়োজন ক'রেছি—বিশ্বকবিকে নিয়ে আসার ভার আপনার।

শরৎচন্দ্র রাজি হ'লেন এক-কথায়। তিনি ফোন ক'র্‌লেন ঠাকুর-বাড়ীতে। কিন্তু সময়ের অভাবে কবিগুরু (রবীন্দ্রনাথ) উপস্থিত হ'তে পার্‌বেন না জানিয়ে দিলেন।

এপাশে, এ সংবাদটা পাড়াময় রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। অগত্যা ঠিক হ'ল, রবিবাসরের আয়োজন যেরূপ চলেছে, সেইরূপই চলুক, কাজ চালিয়ে নেবেন শরৎচন্দ্র।

কবিতা পাঠ ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আয়োজন হ'য়েছিল। সেই মতই কাজ চ'ল্‌লো।

রবীন্দ্রনাথের একটি ফটো যথারীতি পুষ্প ও চন্দনে সাজিয়ে, সভার কাজ আরম্ভ করা হ'ল: কবিতা পাঠ শেষ হ'ল। গান আরম্ভ হ'ল। তাকিয়া হেলান দিয়ে ব'সে আছেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু ভাল তবলচী না থাকায় গান ঠিক মত জমলো না। তখন শরৎচন্দ্র নিজেই আর স্থির হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে পার্‌লেন না। হাই তুলে ডাক দিলেন—নীলু!

নীলরতনবাবু ছুটে এলেন। শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, একটু আফিং নিয়ে এসো। আর মাঝে মাঝে চা বরং একটু যোগিয়ো!

গান সুরু হ'লো। আসর জমে উঠ্‌লো।

সভা ভাঙলো, বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে।

বয়োবৃদ্ধ একজন মুগ্ধ উৎসাহী জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—এমন সুন্দর বাজাতে শিখ্‌লেন আপনি কোথায়?

শরৎচন্দ্র সহাস্তে উত্তর দিলেন, যা' কিছু সঞ্চয়, সবই আমার বর্ম্মা-মুলুকে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠ্‌লো—কার কাছে?

উত্তর না দিয়ে প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে চাইলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু ধরে ব'স্‌লেন নীলরতনবাবু, হেসে এড়িয়ে গেলে চ'ল্‌বে না! ব'ল্‌তে আপনাকে হবেই।

মৃদুহাস্যে উত্তর দিলেন শরৎচন্দ্র, শিখেছিলাম লক্ষ্ণৌর এক তবলচীর কাছে। তিনি ব'ল্‌তেন, এটা হ'লো, হয় আমীর, না হয় ফকিরের কাজ, আমি ত সেখানে ফকিরই ছিলাম নীলু!

উপস্থিত সকলেই তাঁর স্মিতহাস্যোজ্জ্বল সেই মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বিমোহিত হ'য়ে প'ড়্‌লেন।...[অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এ-সভাতে যোগদান ক'র্‌তে না পার্‌লেও,—তাঁর বালিগঞ্জের বাড়ীতে একদিন পদার্পণ ক'রেছিলেন।]

* * *

শরৎচন্দ্র যে অপরাজেয় কথা-শিল্পী, শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক, একথা যেরূপ দেশবাসীর কাছে পরিচিত ছিল, তাঁহার অন্যান্য গুণাবলীর সঙ্গে সেরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় খুব কম লোকেরই ছিল। যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁরাই জানতেন, তিনি শুধু উপন্যাসিক নন, ভাল শিকারীও। পাকা রাজনীতিকও। ভাল দাবা ও বিলিয়ার্ড খেলোয়ার্ডও।

এককালে তাঁর গানই ছিল একমাত্র জীবিকা, ভবিষ্যতে লেখনীই হ'য়েছিল, চলার পথের সাথী। তবুও গান তাঁর একান্ত প্রিয়-বস্তু ছিল।

তাঁকে একালে গাইতে প্রায় শোনা যেতো না সত্য, কিন্তু শুনতেন প্রচুর। তাই সামতাবেড়ের বাড়ীতে, সেকালেও রেডিও শোনা যেতো।

একদিন তাঁর প্রিয় অনুচরবৃন্দরা ধ'রে ব'স্লেন, আজ আমাদের সেতার শোনাতে হবে!

শরৎচন্দ্র সহজ হাস্যে উত্তর দিলেন, বহুদিনের অনভ্যাস, ভুলে গেছি সব। সাঙ্গপাঙ্গোরদল কিন্তু নাছোড়বান্দা। বল্লো—ওসব কথা আমরা শুন্ছিনে। শোনাতে আমাদের হবেই।

শরৎচন্দ্র সহজে রাজি হ'লেন না। আর রাজি না হওয়াটাই তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস। অনুচরবৃন্দও তা ভাল ক'রেই জান্তেন। সুতরাং সাধ্যসাধনাও চ'ল্লো সেইরূপ।

সাধনায় শিবের মন গলে। দেবতাকে তুষ্ট করা যায়। শরৎচন্দ্রও শেষ পর্য্যন্ত রাজী হ'লেন: শোনাবেন মাত্র কয়েক মিনিট! কিন্তু—

'কিন্তু'র অর্থ বুঝ্লেন অনুরূপবাবু। সামনে আফিমের কৌটোটা এগিয়ে ধর্লেন—নীলরতনবাবু চায়ের কাপটি এগিয়ে দিলেন।

সেটুকু গলধঃকরণ ক'রে সেতারখানা তুলে নিলেন কোলে। ঘরটা মুর্চ্ছনায় ভরে উঠ্লো।

বহুক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র সেতারখানা নামিয়ে রাখ্লেন। কয়েক মিনিটের পরিবর্ত্তে প্রায় একটি ঘণ্টা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। বিমোহিত শ্রোতৃবৃন্দ সচেতন হ'য়ে উঠে ব'ল্লো—এতগুণের অধিকারী আপনি! সরস্বতীর বরপুত্রই বটে!

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন না,—শুধু মৃদু হাস্লেন মাত্র।

* * * *

অসহযোগ আন্দোলন পূরোদমে চ'ল্ছে। সুভাষচন্দ্র তখনও কারারুদ্ধ। তাঁর দলবল তাঁকে কুমিল্লায় পাঠালেন, একটি বিশেষ অধিবেশনের সভাপতিত্ব ক'র্তে। আন্দোলন চ'ল্লেও ঘরোয়া রাজনৈতিক মনোমালিন্য তখনও চলেছে অবাধ গতিতে। শরৎচন্দ্র চলেছেন ট্রেনে। পথে একদল লোক "শেম্" "শেম্" কর্তে লাগ্লো। আবার কেউ ধৈর্য্যের বাঁধ হারিয়ে কয়লার গুঁড়ো ছুঁড়ে মার্লো।

শরৎচন্দ্র নিরাশ হ'য়ে পড়্লেন। দলবল সঙ্গে যা আছে, তাদের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। তাছাড়া রাজনীতির চর্চ্চা কর্লেও প্রকাশ্যে

কোন আন্দোলন চালানোর ভরসা তিনি রাখ্‌তেন না; সাম্‌নে কাউকে নেতা খাড়া ক'রে যুক্তি বাৎলাতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মনে মনে তাঁর সুভাষচন্দ্রের উপর রাগ হ'তে লাগ্‌লো। শেষে কিনা তাঁর ইচ্ছা ও আশা পূর্ণ ক'র্‌তে এসে শুধু কয়লার ধুলো খেয়ে ফিরে যেতে হবে?

কুমিল্লা ষ্টেশনে গাড়ী থামলো। বিরাট আয়োজন দেখে তিনি প্রথমেত হতবাক হ'য়ে পড়লেন! বারো ঘোড়ার গাড়ী তৈরী। দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা। এসব কি তাঁর ধাতে সহ্য হয়। তিনি সাহিত্যিক মানুষ, নির্জ্জনে বসে মানুষের মনের সুখ-দুঃখের গাথা রচনা কর্‌তে পারেন। বিজ্ঞ রাজনীতিকদের সঙ্গে গোপন-বৈঠকে যোগ দিয়ে ন্যায়-অন্যায়ের প্রতিবাদ কর্‌তে পারেন। দেশের ভালমন্দের কথা প্রাণ খুলে বল্‌তে পারেন, কিন্তু প্রকাশ্য সভায় ভেতর থেকে কে যেন তাঁকে আড়ষ্ঠ করে বেঁধে রাখে। দ্বিধা-মিশ্রিত চিত্তে তিনি গাড়ীতে উঠে বস্‌লেন। লজ্জায় মাথাটা তাঁর আপনা থেকে নত হ'য়ে এলো।

গাড়ী চল্‌তে সুরু হ'ল। তিনি মনে মনে চিন্তা কর্‌তে লাগলেন, এসব কি তাঁর পোষায়? না এতখানি সৌভাগ্যের বোঝা বইবার *শক্তি তাঁর আছে? এর চেয়ে বোধ হয় কয়লার গুঁড়োই ছিল ভাল!*

কোনরকমে সভাপতির ভাষণ শেষ করে, সেযাত্রা মুক্তি পেয়ে ফিরে এলেন ক'লকাতায়। "শেষ প্রশ্ন" বাজারে আত্ম-প্রকাশ করেছে। ইতি-মধ্যে বাজারে একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে। "শেষ-প্রশ্নের" সত্যকার প্রশ্নটাই বা কি? কেউ বল্‌ছে, "শেষের কবিতার" অনুকরণ, কেউ বল্‌ছে, রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা"র ব্যঙ্গোক্তি। আবার কেউ বল্‌ছে—এসব বই যদি বাজারে চলে, হিন্দু-সমাজ ব'লে কিছুই আর থাক্‌বে না কোনদিন!

শরৎচন্দ্র নীরবে বসে বসে সমস্ত আলোচনা শোনেন আর হাসেন। মানুষের জীবনে যে প্রশ্নটা চিরদিন অজানাই র'য়ে গেল, তার রূপ দেখে এরা এত আঁৎকে ওঠে কেন? আর যা' সত্য, যা প্রতি-মুহূর্ত্তেই মানুষ করে অনুভব, তাকে অস্বীকারের জন্য তারা এত ব্যাকুলই বা হয় কেন?

* * * *

ডাক্ পড়লো রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব

করার। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব "রবীন্দ্র-জয়ন্তী" উপলক্ষ্যে যে মানপত্র রচিত হ'য়েছিল তার ভার শরৎচন্দ্রের উপর দেওয়া হ'ল। তিনি ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ (নভেম্বর ১৯৩১) তারিখে, অমল হোম ম'শায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তখন তাঁর শরীর ছিল অসুস্থ।

এই জয়ন্ত-উৎসবে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'য়ে ছিলেন প্রমথ চৌধুরীম'শায়। পরে যে কোন কারণেই হোক্ শরৎচন্দ্রকে সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচন করা হ'ল। তিনি তাঁর ভাষণে ব'ল্‌লেন :

"কবির জীবনের সপ্ততি বৎসর বয়স পূর্ণ হোলো, বিধাতার এই আশীর্ব্বাদ কেবল আমাদিগকে নয়, সমস্ত মানবজাতিকে ধন্য ক'রেছে। সৌভাগ্যের এই স্মৃতিকে আনন্দোৎসবে মধুর ও উজ্জ্বল ক'রে আমরা উত্তরকালের জন্য রেখে যেতে চাই, এবং সেইসঙ্গে নিজেদেরও এই পরিচয়টুকু তাদের দিয়ে যাবো যে, শুধু কবির কাব্যই নয়, তাঁকে আমরা চোখে দেখেছি, তাঁর কথা শুনেছি, তাঁর আসনের চারিধারে ঘিরে বসবার ভাগ্য আমাদের ঘটেছে। মনে হয়, সেদিন আমাদের উদ্দেশ্যেও তারা নমস্কার জানাবে।

সেই অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ, আজকের এই সাহিত্য-সভা। সাহিত্যের সম্মেলন আরও অনেক ব'স্‌বে, আয়োজনে প্রয়োজনে তাদের গৌরবও কম হবে না, কিন্তু আজকের দিনের অসামান্যতা তারা পাবে না। এতো সচরাচরের নয়, এ বিশেষ একদিনের—তাই এর শ্রেণী স্বতন্ত্র।

সাহিত্যের আসরে সভা-নায়কের কাজ ক'র্‌বার ডাক ইতিপূর্ব্বে আমার আরও এসেছে, আহ্বান উপেক্ষা ক'র্‌তে পারিনি, নিজের অযোগ্যতা স্মরণ ক'রেও সসঙ্কোচে কর্ত্তব্য সমাপন ক'র্‌তে এসেছি। কিন্তু এই সভায় শুধু সঙ্কোচ নয়, আজ লজ্জা বোধ ক'র্‌ছি। আমি নিঃসংশয় যে, এ গৌরব আমার প্রাপ্য নয়, এ ভার বহনে আমি অক্ষম।

এ আমার প্রচলিত বিনয়বাক্য নয়, এ আমার অকপট সত্য কথা। তথাপি আমন্ত্রণ অস্বীকার করিনি। কেন যে করিনি, আমি সেইটুকুই শুধু ব্যক্ত ক'র্‌বো।

আমি জানি, বিতর্কের স্থান এ নয়, সাহিত্যের ভালমন্দ বিচার, এর জাতিকুল নির্ণয়ের সমস্ত নিয়ে এ পরিষদ আহূত হয়নি—তার প্রয়োজন যথাস্থানে। আমরা সমবেত হ'য়েছি বৃদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে দিতে, তাঁকে সহজভাবে ব'ল্‌তে, কবি, তুমি অনেক দিয়েছো, এই দীর্ঘকালে তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েছি। সুন্দর, সবল, সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী ভাষা দিয়েছো তুমি, দিয়েছো বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েছো অপরূপ সাহিত্য, দিয়েছো জগতের কাছে বাঙলার ভাষা ও ভাব সম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েছো যা' সকলের বড়—আমাদের মনকে দিয়েছো তুমি বড় ক'রে। তোমার সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আমার সাধ্যাতীত—এ আমার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ; প্রাজ্ঞমান যাঁরা, যথাকালে তাঁরা এর আলোচনা ক'র্‌বেন; কিন্তু তোমার কাছে আমি নিজে কি পেয়েছি সেই কথাটাই ছোট ক'রে জানাবো ব'লেই এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'র্‌লাম।

ভাষার কারুকার্য্য আমার নেই। ওতে যে পরিমাণ বিদ্যা এবং শিক্ষার প্রয়োজন, সে আমি পাইনি; তাই মনের ভাব প্রচলিত সহজ কথায় বলাই আমার অভ্যাস; এবং এমনি ক'রেই ব'ল্‌তে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুগ্রহ এসে বিঘ্ন ঘটালো। একে আমি বিখ্যাত কুড়ে, তাতে বায়ু-পিত্ত-কফ-আদি আয়ুর্ব্বেদোক্ত চরের দল একযোগে কুপিত হ'য়ে, আমাকে শয্যাশায়ী ক'রে দিলে। এমন ভরসা ছিল না যে, ন'ড়্‌তে পার্‌বো। কিন্তু একটা বিপদ এই যে, চিরকাল দেখে এসেছি, আমার অসুখের কথা কেউ বিশ্বাস করে না; যেন ও আমার হ'তে নেই। কল্পনায় স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম, সবাই ঘাড় নেড়ে স্মিতহাস্যে

ব'লছেন, উনি আসেননি ত ? এ আমরা জানতাম। সেই বাক্য-বাণের ভয়েই আমি কোনমতে এসে উপস্থিত হ'য়েছি। এখন দেখছি ভালই ক'রেছি। এই না-আসতে-পারার দুঃখ আমার অমারণ ঘুচতো না। কিন্তু যা লিখে আনবার ইচ্ছে ছিল, সে হ'য়ে ওঠেনি। একটা কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ ক'রেছি, তার চেয়েও বড় কৈফিয়ৎ আছে। মানুষের অল্পসল্প পাওয়ার কথাই মনে থাকে, তাই লিখতে গিয়ে দেখলাম, কবির কাছ থেকে পাওয়ার হিসাব দিতে যাওয়া বৃথা; দফা-ওয়ারি ফর্দ্দ মেলে না।

ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধ'রে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে, তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বা'র হই। ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হ'লে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জ্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর-অভ্যর্থনার পালা শেষ হ'লে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান ক'রে দেন। সেখানে আর-এক দফা সম্বর্দ্ধনা লাভের পর আবার বোধোদয়, পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্টসরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাগরেদি সুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা, আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি তাঁদের আপ্যায়ন-সম্বর্দ্ধনার ঘটা—এমনি ক'রে বোধোদয়, পদ্যপাঠ ও বাল্য-জীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হ'ল।

এলাম সহরে। একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্ত্তি ক'রে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাশে, তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাব-শতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু প'ড়ে যাওয়া নয়, মাসিকে, সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের

সঙ্গে আমার পরিচয় ঘ'ট্‌লো চোখের জলে। তারপর বহুদুঃখে আর-এক দিন সে-মিয়াদ্‌ও কাট্‌লো। তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে।

যে-পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য-উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য, সেখানে সবাই চায় পাশ ক'র্‌তে এবং উকীল হ'তে; এরই মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্য্যয় ঘ'ট্‌লো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে প'ড়্‌তেন, তিনি এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ; কাব্যে আসক্তি; বাড়ীর মেয়েদের জড় ক'রে তিনি একদিন প'ড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথের "প্রকৃতির প্রতিশোধ"। কে কতটা বুঝ্‌লে জানিনে, কিন্তু যিনি প'ড়েছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চ'লে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘট্‌লো, এবং বেশ মনে পড়ে এইবার পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়। এর পরে এ-বাড়ীর উকীল হ'বার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাঁতে সইলো না; আবার ফির্‌তে হ'ল আমাদের সেই পুরোনো পল্লী-ভবনে। কিন্তু এবার বোধোদয় নয়—বাবার ভাঙা দেরাজ থেকে খুঁজে বের ক'র্‌লাম, "হরিদাসের গুপ্তকথা" আর বেরোলো "ভবানী পাঠক"। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলপাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ্‌ছেলের অপাঠ্য-পুস্তক। তাই প'ড়্‌বার ঠাঁই ক'রে নিতে হ'লো আমাকে বাড়ীর গোয়াল-ঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে জানিনে।

একই স্কুলে বেশীদিন প'ড়্‌লে বিদ্যা হয় না; মাষ্টারম'শাই স্নেহবশে একদিন এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফির্‌তে হ'লো সহরে। বলা ভাল, এর পরে আর স্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয়নি। এইবার খবর

পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাব্‌তেও পার্‌তাম না, প'ড়ে প'ড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হ'য়ে গেল। বোধ হয়, এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না ক'রেছি যে নয়, লেখার দিক্ দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হ'য়েছে; কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তারপরে এলো বঙ্গদর্শনের নব পর্য্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হ'চ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নতুন আলো এসে যেন চোখে প'ড়্‌লো। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুল্‌বো না। কোন কিছু যে এমন ক'রে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখ্‌তে পায় এর পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক প'ড়্‌লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, একথা সত্য নয়। ওইতো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এতবড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন—তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হ'লো আমার ছাড়াছাড়ি। ভুলেই গেলাম যে, জীবনে একটা ছত্রও কোনদিন লিখেছি। দীর্ঘকাল কাট্‌লো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র ক'রে, কি ক'রে যে নবীন বাঙ্‌লা-সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভ'রে উঠ্‌লো, আমি তার কোন খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোনদিন ঘনিষ্ঠ হ'বারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন; এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক

বই—কাব্য ও সাহিত্য ; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বারবার ক'রে প'ড়েছি—কি তার ছন্দ, ক'টা তার অক্ষর, কাকে বলে আর্ট, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোন ত্রুটি ঘটেছে কিনা, এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হ'তেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হাঠৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ ক'রে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হ'য়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম, ভয়ের কথা মনেই হ'ল না। আর কোথাও না হোক্, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যা ক'রতে আমি পারিনে, কিন্তু ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ওর অন্তরের সন্ধান আমাকে দিয়েছে। পণ্ডিতের তত্ত্ববিচারে তাতে ভুল যদি থাকে তো থাক্, কিন্তু আমার কাছে সেই-ই সত্য হ'য়ে আছে।

জানি, রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় এসকল অবান্তর, হয়ত বা অর্থহীন ; কিন্তু গোড়াতেই আমি ব'লেছি যে, আলোচনার জন্য আমি আসিনি, এর সহস্র ধারায় প্রবাহিত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বিবরণ দেওয়াও আমার সাধ্যাতীত। আমি এসেছিলাম শুধু আমার ব্যক্তিগত গোটাকয়েক কথা এই জয়ন্তী-উৎসব সভায় নিবেদন ক'রে যেতে।

কাব্য, সাহিত্য, ও কবি রবীন্দ্রনাথকে আমি যেভাবে লাভ ক'রেছি, তা জানালাম। মানুষ রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আমি সামান্যই এসেছি।

কবির কাছে একদিন গিয়েছিলাম বাঙ্গালা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা প্রবর্ত্তিত করার প্রস্তাব নিয়ে। নানা কারণে কবি স্বীকার ক'রতে পারেননি, তার একটা হেতু এই দিয়েছিলেন যে, যার প্রশংসা ক'রতে তিনি অপারগ, তার নিন্দে ক'রতেও তিনি তেম্‌নি অক্ষম। আরও ব'লেছিলেন যে, তোমরা যদি একাজ কর, কখনো ভুলো না যে অক্ষমতা ও অপরাধ এক বস্তু নয়। ভাবি, সাহিত্য-বিচারে এই সত্যটা যদি সবাই মনে রাখ্‌তো!

কিন্তু, এই সভায় অনেকখানি সময় নষ্ট ক'রেছি, আর না। অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্ব্বাচন করারই এটা দণ্ড। এ আপনাদের সইতেই হ'বে। সে যাই হোক্‌, রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে এ সমাদর ও সম্মান আমার আশার অতীত। তাই সকৃতজ্ঞচিত্তে আপনাদিগকে নমস্কার জানাই!

* * * *

১৩৩৯ সাল, ৩১শে ভাদ্র। দেশবাসীর পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে টাউন হলে এক অভিনন্দন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল।

মেয়েরা অভিনন্দনপত্র দিলেন:

বাংলার বরেণ্য কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের করকমলে—

বাংলার সাহিত্যাকাশ যেদিন ধরণীর সর্ব্বোজ্জল রবিকরে সুপ্রদীপ্ত, সেই অদ্বিতীয় আদিত্যের অপূর্ব্ব কিরণচ্ছটায় সকল গ্রহনক্ষেত্রের আলোকরেখা যেদিন পরিম্লান, সেদিনের সেই রবিকরোদ্ভাসিত জ্যোতির্ম্ময় যুগে বঙ্গবাণীর দিকচক্রবালে যাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার অপরাজেয় দীপ্তি আপনার দিব্য মহিমায় সকলজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, হে শুভ্রসুন্দর শরৎচন্দ্র! তুমিই সেই জ্যোতিষ্মান, আমরা তোমায় বন্দনা করি॥

শরতের পূর্ণচন্দ্রের অফুরন্ত জ্যোৎস্নাপ্লাবনেরই মত তোমার কথা-সাহিত্যের কনক-কৌমুদী এদেশের নরনারীর মর্ম্মে সুগভীর আনন্দ-বেদনার বিচিত্র তরঙ্গ তুলিয়াছে, তোমার প্রাণবন্ত সৃষ্টি তাহাদের দীর্ঘ তন্দ্রাহত অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে, স্পন্দিত করিয়াছে, সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে বাংলার কথা-সাহিত্যের অসামান্য শিল্পী! আমরা তোমার বন্দনা করি॥

পরাধীন বাংলার অধঃপতিত সমাজের অসহায়া অন্তঃপুরচারিণীদের অন্তরের মূক আনন্দবেদনাকে তুমি ভাষায় মূর্ত্ত করিয়া ধরিয়াছ। তাহাদের দুর্গত জীবনের সকল দুঃখ-সুখের অনুভূতিগুলিকে নিবিড় সহানুভূতির পরম রসরাগে সাহিত্যে বাস্তবরূপে সত্য করিয়া তুলিয়াছ। তোমার অনাবিষ্ট দৃষ্টি সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সুগভীর উপলব্ধি শক্তি, বিচিত্র মানব-চরিত্রের অতুল অভিজ্ঞতা, নিখিল নারীচিত্তের নিগূঢ় প্রকৃতির গোপনতম সন্ধান লাভ করিয়াছে। হে নারীচরিত্রের নিবিড় রহস্য-জ্ঞাতা! আমরা তোমায় বন্দনা করি॥

সর্ব্ববিধ আত্মাবমাননা, সর্ব্ববিধ হীনতার অবস্থার মধ্যেও নারীর সহজ প্রকৃতি-জাত যে বৈশিষ্ট্যগুলি সকল দেশের, সকল কালের, সকল সমাজে বর্ত্তমান, তুমি তাহার অকৃত্রিম রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছ, তাহার সত্য-প্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহার মৌনভাষা বুঝিতে পারিয়াছ। হে সকল নারীর অন্তর্য্যামি! আমরা তোমার বন্দনা করি॥

আজ তোমার এই সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মোৎসবের অভিনন্দন বাসরে আমরা আমাদের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতে আসিয়াছি। আমাদের মনের ভাব সুস্পষ্ট ও সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়া বলিতে শিখি নাই; তবুও আজিকার এই বিশেষদিনে তোমাকে আমরা কেবল এই কথাই জানাইতে আসিয়াছি, তোমার প্রতিভাকে আমরা বরণ করি। তোমাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তোমাকে আমরা

ভালবাসি। তোমাকে আমরা আমাদের একান্ত আপনজন বলিয়াই জানি। হে নারীর পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু! আমরা তোমার বন্দনা করি॥

তুমি আমাদের সকৃতজ্ঞ প্রণিপাত গ্রহণ কর। তুমি আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। আমাদের পরম প্রিয় তুমি, পরম আত্মীয় তুমি! তোমার এই শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠান বাংলার গৃহে-গৃহে বর্ষে-বর্ষে যোগ্য সমারোহে প্রতিপালিত হউক্।

তোমার যশঃ ও আয়ু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক্। তোমার সুখ ও স্বাস্থ্য চির অব্যাহত থাকুক্। তোমার জীবন আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যে হেম-বিমণ্ডিত হউক্—অন্তরের এই ঐকান্তিক কামনা লইয়া হে নারীহৃদয়ের মরমী ঋষি! আমরা তোমার বন্দনা করি।

তোমার—স্বদেশবাসিনিগণ

* * * *

স্বদেশবাসীগণ দিলেন :

হে বঙ্গবাণীর বরপুত্র!

তোমার সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মদিবসে সমবেত স্বদেশবাসীর বন্দনা গ্রহণ কর। আমরা আজ আমাদের হৃদয়ের পাত্রে যে প্রগাঢ় প্রীতির অর্ঘ বহন করিয়া আনিয়াছি, তোমার নিরভিমান স্নেহসিঞ্চিত প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে তাহা সার্থক কর।

বঙ্গ-সাহিত্যে তোমার আবির্ভাব শরতের পূর্ণচন্দ্রের মতই পরিপূর্ণ ও প্রভা-সুদীপ্ত। তোমার প্রথম উদয়-ক্ষণে বাঙ্গালী-হৃদয় চন্দ্রাকর্ষিত সমুদ্রের মতই উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে আমরা সেদিন দেখিয়াছিলাম তুমি তোমার জ্যোতির্ম্ময় প্রতিভার দ্যুতিতে অন্তরের সুনিবিড় অনুভূতিকে জাগ্রত করিয়া দুঃখের মিলন মূর্ত্তিকে ভাস্বর করিয়া তুলিলে। ইহা তোমারই পক্ষে সম্ভব, যেহেতু তুমি

সত্যের সাধনায় বহু অন্ধকার রাত্রি অতন্দ্র থাকিয়া দুঃখের সমগ্র রূপকে ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছ।

হে দুঃখ-বেদনার রহস্যবিৎ! বঞ্চিত-স্নেহ এবং উপেক্ষিত-প্রেমের নির্দ্দয় আঘাতে বিপর্য্যস্তা বঙ্গনারীর সংযত ধৈর্য্যের মহিমাকে তুমি বিনম্র শ্রদ্ধার অজিনাসনে বসাইয়া মহীয়সী করিয়াছ। পৌরুষহীন সমাজের অচেতন মনকে তুমি তার বিগত গৌরবের মূঢ় মোহ হইতে জাগ্রত করিয়াছ। আমাদের জীবনের যত কিছু সঞ্চিত লজ্জা, অপমান ও উৎপীড়নের ব্যথাকে তুমি কেবল ভাষা দাও নাই, আশা দিয়াছ। তোমার প্রতিভার আলোকে বাঙালী নিজের পরিচয় পাইয়াছে।

হে ঐন্দ্রজালিক শিল্পী! অতি সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের বিক্ষিপ্ত ও অকিঞ্চিৎকর উপকরণ লইয়াই তুমি স্বকীয় মৌলিকতায় স্বতন্ত্র, অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব ভাবরস-সমৃদ্ধ যে কথা-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছ, কেবলমাত্র বাঙ্গালীরই নহে, তাহা সর্ব্ব দেশের, সর্ব্বকালের অক্ষয় সম্পদরূপে অভিনন্দিত হইবে! মানব-মহত্বের তুমি মহীয়ান্ উদ্গাতা, তোমার দুর্লভ দান কেবল প্রসাদ-লব্ধ লঘু চিত্তের শূন্য অহঙ্কারের জন্য উৎসর্গিত নয়; ইহাকে শুধু অবসরের বিলাস-বস্তু রূপে ব্যবহার করিলে আত্ম-বঞ্চনাই হইবে। অতএব তোমার সৃষ্টির যথার্থ মাহাত্ম্য উপলব্ধির দ্বারা আমরা যেন বল লাভ করি, ফল লাভ করি—এই আশীর্ব্বাদ করিয়া, হে শক্তিমান স্রষ্টা! তুমি তোমার স্বদেশবাসীর প্রীতি-উৎসারিত বন্দনা গ্রহণ কর।

শরৎ-বন্দনা সমিতি — তোমার গুণমুগ্ধ

৩১ ভাদ্র, ১৩৩৯ — স্বদেশবাসীগণ

রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হ'তে পার্‌লেন না। আশীর্ব্বাণী পাঠালেন :—

ওঁ উত্তরায়ণ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

শরৎচন্দ্র, বিশেষ উদ্বেগজনক সাংসারিক ঘটনায় তোমার জন্মদিনের উৎসবে সম্মাননা সভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হোলো না। অগত্যা আমার আন্তরিক শুভ-কামনা এই উপলক্ষ্যে পত্রযোগে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই।

তোমার বয়স অধিক নয়, তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র এখনো সম্মুখে দীর্ঘ প্রসারিত, তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয়নি। সেই অসমাপ্ত যাত্রা-পথের মাঝখানে অকস্মাৎ তোমাকে দাঁড় করিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া আমার কাছে মনে হয় অসাময়িক। এখনো শুব্ধ হবার অবকাশ নেই তোমার, ফলশস্যবহুল দূর ভবিষ্যৎ এখনো তোমাকে সম্মুখে আহ্বান ক'র্‌ছে।

সত্তর বছর উত্তীর্ণ ক'রে কর্ম্ম-সাধনার অন্তিম পর্ব্বে আমি পৌঁচেছি। কর্ত্তব্যের চক্রপথ প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করার পরেও এখনো যদি আমাকে চ'ল্‌তে হয় সেটা পুনরাবর্ত্তনমাত্র। এই কারণেই অল্পদিন হোলো আমার দেশ—আমার জীবনের শেষ প্রাপ্য সমারোহ ক'রে চুকিয়ে দিয়েছে! সাধারণের কাছে আমার পরিচয় সমাপ্ত হ'য়ে গেছে ব'লেই এই শেষকৃত্য সম্ভবপর হ'য়েছে। আকাশ থেকে শ্রাবণের মেঘ তার দান যখন নিঃশেষ ক'রে দেয় তখনি ধরাতলে প্রস্তুত হয় শরতের পুষ্পাঞ্জলি। তার পরেও মেঘ যদি সম্পূর্ণ বিশ্রাম না করে সেটা হয় বর্ষার পুনরুক্তিমাত্র, সেটা বাহুল্য।

সেই দাঁড়ি-টানা সময় তোমার নয়,—এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান ক'র্‌বে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি ক'র্‌তে থাক্‌বে। পথে পথে

পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুইপাশে যে-সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠ্‌বে তারা তোমার; অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্ব্বজন হস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সেদিন বহুদূরে থাক্। আজ দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী ক'র্‌বে; তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ ক'র্‌তে থাকো, পথের চরম প্রান্তবর্ত্তী আমি সেই কামনা করি। জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তি-বাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয় একথা নিশ্চিত মনে রেখো।

তোমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে "কালের যাত্রা" নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ ক'রেছি। আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই—রথ-যাত্রার উৎসবে নর-নারী সবাই হঠাৎ দেখ্‌তে পেল মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি প'ড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হ'য়ে গেছে, তাই চ'ল্‌ছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত ক'রেছে, অবমানিত ক'রেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান ক'রেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচ্‌লে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হ'য়ে রথ সম্মুখের দিকে চ'ল্‌বে।

কালের রথ-যাত্রার বাধা দূর ক'র্‌বার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক্, এই আশীর্ব্বাদসহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশবরেণ্য সাহিত্যসেবীগণ একটি শরৎ-বন্দনা সমিতি গঠন ক'রে তাঁকে অভিনন্দন জানাবার যে আয়োজন ক'রেছিলেন, রাজনৈতিক দলের গোপন ষড়যন্ত্রে তা' পণ্ড হ'য়ে গেল। (বাংলায় তখন রাজনীতিক্ষেত্রে দুটি দল—সুভাষ-পন্থীরা হ'লেন "ফরওয়ার্ড," আর অপরটি ছিল সেনগুপ্তের দল "য়্যাড্‌ভান্স"। শরৎচন্দ্র দলাদলির উর্দ্ধে থাক্‌লেও তাঁর প্রিয় ছিল সুভাষচন্দ্র। কমিটিতে প্রাধান্য পেয়েছিল ফর্‌ওয়ার্ড দল। সুতরাং হিজ্‌লী বন্দীদ্বয়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ সভা পণ্ডের আয়োজন করা হ'য়েছিল অত্যন্ত গোপনে। পরে সেই ভাঙা হাট জোড়া দিয়ে একদিন আবার মুল্‌তুবি "শরৎ-বন্দনা" সম্পন্ন করা হ'য়েছিল।

* * * *

"স্বদেশ ও সাহিত্য" (১৯৩২) ও "শ্রীকান্ত, চতুর্থ পর্ব্ব" (১৯৩৩) কয়েক মাসের ব্যবধানে পাঠক-সমাজে আত্মপ্রকাশ ক'র্‌লো। শরৎ-প্রতিভার দীপ্তিই প্রকাশিত হ'ল।

ঠিক সেই সময়েই সুভাষচন্দ্র স্বাস্থ্যের দোহাই-এ ইউরোপে নির্ব্বাসিত হ'লেন। স্বাস্থ্য তাঁর ভেঙে গেছে। গুজোব শোনা গেল, যক্ষা রোগে নাকি তিনি আক্রান্ত হ'য়েছেন।

শরৎচন্দ্রের মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল। তবে কি তাঁর সব্যসাচীর স্বপ্ন সফল হ'বে না? তাঁর আশা ও আকাঙ্ক্ষা কি তবে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে?

দেবতাকে তিনি কোনদিন অস্বীকার করেননি, কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর এই নির্ম্মম হৃদয়হীনতার পরিচয়, প্রতিটি মুহূর্ত্তে তাঁর অবস্থিতি সম্বন্ধে তাঁকে সন্দিহান ক'রে তুলেছিল। তাই তিনি সকল সময়ে তাঁকে অন্বেষণই ক'রে এসেছিলেন। যে গোবিন্দজীকে তিনি পরীক্ষার ছলে দেশবন্ধুর কাছ থেকে একদিন নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন, আজ তিনি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ক'র্‌লেন। সাশ্রুনয়নে জিজ্ঞাসা

ক'র্লেন, এত বড় সাধকের এমনি অসহায় মৃত্যু—সত্যই কি তোমার প্রকৃতির নিয়ম, গোবিন্দজী? তাই যদি হয়—দেশবন্ধুকে কেন তুমি পথের ভিখারী ক'র্লে? রাজার দুলালকে বিবাগী কেন ক'র্লে? তার পিছনে কি তোমার কোন উদ্দেশ্য নেই?

* * * *

সুভাষচন্দ্র দেশ ত্যাগ ক'র্লেন। শরৎচন্দ্র রাজনীতির সম্পর্ক ত্যাগ ক'র্লেন। ক্ষুব্ধচিত্তে তিনি পুনরায় তাঁর সাহিত্যিক জীবনে ফিরে এলেন। কারণ তাঁর মনের মত সাথী ত আর এদেশে কেউ নেই। যাঁরা আছেন, তাঁরা কেউ স্বার্থত্যাগী নন, নিজের স্বার্থের বেড়জাল্টা দেশসেবার মুখোস দিয়ে ঢাকা রেখে, এগিয়ে চ'লেছেন ধীরে ধীরে। তাঁদের সঙ্গে কি তাঁর খাপ খায় কখনও?

কাজী নজরুল এলেন দেখা ক'র্তে। ব'ল্লেন, একি ক'র্লেন দাদা? আমাদের এম্নি ক'রে ত্যাগ ক'র্লেন?

শরৎচন্দ্র মৃদু হাস্লেন। ব'ল্লেন, তোমরা ত্যাগ না ক'র্লে আমার সাধ্য কি তোমাদের ত্যাগ করি!—কিন্তু সত্যই আমি নিরাশ হ'য়েছি, কাজি। দেশের লোক অমন একটা স্বার্থত্যাগীকে চিন্লো না? রাম-কৃষ্ণকে আমি শ্রদ্ধা করি, বিবেকানন্দকে ভারতের আত্মা ব'লে সম্মান দিই—সেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দেশ, যে এত স্বার্থপর ও নীচ হ'তে পারে, নিজের চোখে দেখেও তা বিশ্বাস ক'র্তে পারিনে! কিন্তু ওসব আলোচনা বন্ধ করো কাজি, চিন্তা ক'র্লে মাথা কুটে ম'র্তে ইচ্ছা করে। তার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা একটু শোনাও ভাই—

"পথের পথিক—ক'রেছ আমায়
সেই ভালো যে সেই ভালো
আলেয়া জ্বালালে প্রান্তর ভালে
সেই আলো মোর সেই আলো।…"

কাজী নজরুল গাইলেন। শরৎচন্দ্র পদচারণা ক'র্‌তে ক'র্‌তে সেই সুরে সুর মিলিয়ে চ'ল্‌লেন,—সেই আলো মোর সেই আলো……

* * * *

শরৎচন্দ্রের শরীরে ভাঙন ধ'র্‌লো। একযোগে বেরুলো তাঁর "অনুরাধা," "সতী ও পরেশ," "বিরাজ বৌ" (নাটক), "বিজয়া" (নাটক)।—কয়েকটা বই সিনেমাতেও উঠ্‌লো।—আর্থিক স্বচ্ছলতা তাঁর বাড়্‌লো। অশ্বিনী দত্ত রোডে জমি কিন্‌লেন—বাড়ী ক'র্‌বেন ব'লে। কারণ রূপনারায়ণের শান্ত তীরেও মনটা তাঁর অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল।

* * * *

একবার শরৎচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ দেবানন্দপুরে রওনা হ'লেন। প্রথমে উঠ্‌লেন লাইব্রেরী বাড়ীতে। কিছুক্ষণ পরে তাঁর প্রিয় ছোড়দার (অতুলচন্দ্র দত্ত ম'শায়ের) বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লেন। সেখানে গ্রামের ছেলেরা এসে ধ'র্‌লো তাদের লাইব্রেরীতে কিছু বই দিতে হবে।

দেবো—বেশী কথার কি ? শরৎচন্দ্র ম্লান একটু হাস্‌লেন।

ছেলের দল একটু উৎসাহভ'রে ব'ল্‌লো—আমরা গ্রাম সংস্কার ক'র্‌ছি, রবিবারে সকলে মিলে গাছ কাটি—রাস্তাঘাট উদ্ধার করি—

বেশ, বেশ—এই তো চাই ! শরৎচন্দ্র উৎসাহ দিলেন।

ছেলের দল চ'লে গেল। শরৎচন্দ্র রীতিমত গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লেন। সারা পথ নীরবেই কাটালেন—বড় একটা কথা কইলেন না—শুধু সুরেন্দ্রনাথের কথার জবাবে—হ্যাঁ কিংবা না দিয়েই নিজের চিন্তা রাজ্যে ডুবে রইলেন।

বাড়ী ফিরে চেয়ারখানায় চিৎ হ'য়ে শুয়ে নিজের মনে গুড়্‌গুড়ি টান্‌ছেন।

সুরেন্দ্রনাথ এসে পাশের চেয়ারে ব'স্‌লেন। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, তোমার কি হ'ল শরৎ? সেই যে দেবানন্দপুরে গিয়ে গম্ভীর হ'লে, তারপর তোমার আর সেই মনের সহজ স্ফূরণ নেই—কেমন যেন আনমনা!

শরৎচন্দ্র সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, ভাব্‌ছি।

এত কিসের ভাবনা? আর সে বিষয়টাই বা কি শুনি?

দেবানন্দপুরের কথাই ভাব্‌ছিলাম!

জন্মভূমির প্রতি টান থাকাই স্বাভাবিক!

শরৎচন্দ্র একটু জোরে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'র্‌লেন। ব'ল্‌লেন—স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক ঠিক্ জানি না—তবে ও গ্রামটা আমার প্রিয়! একটু থেমে ব'ল্‌লেন—কখনও কখনও মনে হয় যত টাকাই লাগুক্, আমাদের বাড়ীখানা কিনে ফেলি!

কেনো না কেন?

পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু মনে হয়—কিই-বা হবে! বিস্মৃতির আড়ালে যে কথা চাপা প'ড়ে গেছে, তাকে জাগিয়ে তুলে লাভ কি?

তোমার জন্মস্থান—তার ওপর তোমার কর্ত্তব্যও একটা আছে!

সে ঋণ আমি বহুদিন আগে শোধ ক'রেছি!

কবে ক'র্‌লে? আমায় ত বলনি কিছু? সুরেন্দ্রনাথ বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে প'ড়্‌লেন। বলনি অথচ সব ঋণ শোধ ক'রে ব'সে আছো—সব যেন হেঁয়ালি ব'লে মনে হ'চ্ছে।

সেকথা কাউকে বলা যায় না—কিন্তু তুমি জান, আমি হলপ্ ক'রে ব'ল্‌তে পারি! মৃদু হাস্যে উত্তর দিলেন, শরৎচন্দ্র!

উভয়েই হেসে উঠ্‌লেন। পরক্ষণে সুরেন্দ্রনাথ ব'ল্‌লেন—কৈ মনে ত প'ড়্‌ছে না!

"চরিত্রহীন" রিভাইজ্ করার সময় এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে অনেক কথা হ'য়েছিল!

বলো কি? বিস্ময়ের অভিনয় ক'র্‌লেন সুরেন্দ্রনাথ।

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, ব'লেছিলাম—দেবানন্দপুরে জীবনের সবচেয়ে বড় কথা, যাঁর কাছে শিখেছিলাম,—যাঁর জন্যে ওদেশকে এত ভালবাসি, তাঁর ঋণশোধ আমার করা হ'য়ে গেছে! একটু থেমে ব'ল্‌লেন দেখো, জন্মভূমি ব'লে হৈ-হৈ করা স্বভাব আমার নয়—নিজেকে বড় ক'রে ভেবে জন্মভূমিকে বড় করার ইচ্ছাও আমার নেই,—তাই এত বয়েসেও আত্মচরিত লেখার সাহস আমার হয়নি! ও ধৃষ্টতা আমি কোনদিনই ক'র্‌বো না!

কিন্তু তুমি কিরণশশীকে কিরণময়ী ক'র্‌লে কেন?

সে কথা ত তোমায় ব'লেছি।...আবার যদি নোতুন ক'রে শুন্‌তে চাও তো ব'ল্‌তে হয়: অল্পবয়সে ছেলেদের প্রবৃত্তির দিক্‌টা জাগিয়ে দেওয়ার গুরু হ'ল তাদের চেয়ে ঢের বেশী বয়সের মেয়েরা। অন্ততঃ সুরবালাই ছিলেন সেদিন আমার গুরুপদবাচ্য! তাই ও চরিত্রটার বাইরের দিক্ আঁক্‌তে আমায় প্রায় কিছুই পরিশ্রম ক'র্‌তে হয়নি! সতী, সাবিত্রী, স্বামীর উপর যেমন ভক্তি, তেমনি ভালবাসা, তেমনি আকর্ষণ। আর শেষও হ'ল তেমনি! চারিদিকে ধন্যি ধন্যি প'ড়ে গেল। এমন আর হয় না। স্বামীর পায়ে মাথা রেখে সুরবালাও চ'লে গেল। কিন্তু কিরণময়ীকে আমি তারই—মানে সুরবালার, শিক্ষায় যে জ্ঞানলাভ ক'রেছিলাম, সেই উপকরণ দিয়েই গ'ড়ে তুলেছি। ওতে যদি কোন ভুল থেকে থাকে তো, সে নিছক আমারই—। সুরবালার আগাগোড়া কনট্রাস্ট ক'র্‌তে গিয়ে ঐরকম ক'র্‌তে বাধ্য হ'য়েছি...মোট কথা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার যে সজাগ্রতা দেখ্‌তে পাও,—সে ওই সুরবালারই জন্যে! তাঁকে আমি চিরদিন শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি,...গুরুদক্ষিণা আমার ঐ চরিত্র-চিত্রণ...

বড়মা এসে পাশে দাঁড়ালেন। ব'ল্‌লেন রাত দশটা বাজে—খাবে কখন ? গল্প কি পরে ক'র্‌লে চলে না ?

দশটা ? বলো কি বড়-বৌ ? চলো সুরেন, তোমার রাত হ'য়ে গেল নিশ্চয় !

উত্তরে সুরেনবাবু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, রাত আমার নয় শরৎ—ভয় যাঁর কাছে, মহা অপরাধ ক'রেছো তুমি তাঁরই কাছে—চলো বড়মা—আমরা যাচ্ছি !··

[শরৎ-পরিচয়, সু. না. গ., পৃঃ ১০০-১০৩]

নীলরতনবাবু, অনুরূপবাবু ও অন্যান্য ভক্তের দল ঘিরে ধ'র্‌লেন, আপনার জীবনী রচনা ক'র্‌তে হ'বে।

শরৎচন্দ্র বিস্ময়ে ফেটে প'ড়্‌লেন। ব'ল্‌লেন, সে কিরে ? জীবন ত হ'ল রাজার ! তার কত বিচিত্র রকমের সখ, কত রকমের ভোগ-উপভোগের নেশা, কত রকমের স্বপ্ন-বিলাস ও সাজসজ্জা—লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ত হ'বে সেইদিকে। একটু হেসে ব'ল্‌লেন—যার জীবনে পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক—যার কামনা চকিতে হয় নিবৃত্ত—তার প্রতিই মানুষের দৃষ্টি হয় আকৃষ্ট—তাদের দেখ্‌তে সবাই ছোটে, কিন্তু যারা আস্তাকুঁড়ের মধ্যে মানুষ, তাদের জীবনের ইতিহাস কি একটা ইতিহাস ? না লোকে প'ড়্‌বে শ্রদ্ধার সঙ্গে ? তার চেয়ে যা আছি সেই ভাল রে বাপু, সেই ভাল !

শিষ্যের দল নাছোড়বান্দা ! ওসব কথা তাঁরা তুল্‌ছেন না কানে। ব'ল্‌লেন, লোকে পড়ুক্ না পড়ুক্—আমাদের ত একটা কর্ত্তব্য আছে ! বলুন—

শরৎচন্দ্র হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, তোমাদের লেখার মত কোন বস্তু ত নেই আমার জীবনে। ছেলেবেলায় মোড়ল্‌পনা ক'রেছি।—একটু বড় হ'য়ে

মাছ চুরি ক'রেছি, মড়া পুড়িয়েছি, দুঃস্থদের সেবা ক'রেছি—কখনও সখনও, আর খেয়েছি, মদ, গাঁজা, চরস, কোনটিই বাদ পড়েনি! তার আবার কি ইতিহাস বলতো?

তার চেয়ে শোন্—আমার "চরিত্রহীনের" কিরণময়ীর কথা! ওর সৃষ্টি হ'ল কবে জানো? তখন আমার বয়স তের কি চৌদ্দ—সকলের অবজ্ঞার বস্তু—বিশেষতঃ যুবমহলে। এক দাদা গেলেন জেলে, আর অন্য ভাইয়ের দল চাইলো সেই দাদার স্ত্রীকে নষ্ট ক'রতে। কি রূপই না ছিল তাঁর! চোখ যেন ঝলসে যায়। মেয়েটি আমায় ভীষণ ভালবাসতেন, আদর-যত্ন ক'রতেন নিজের ছেলের মত। শেষে নিরুপায় হ'য়ে বাপের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে—অথচ এই দেবরদের তিনি কতই না স্নেহ-যত্ন ক'রতেন! সে আজ বহুদিনের কথা, তিনি আজ আর জীবিত নেই, কিন্তু তাঁর স্নেহ-প্রীতির আন্তরিকতা আজও ভুলতে পারিনি। তাই তাঁর চরিত্রকে রূপ দিয়েছি,—কিরণময়ীর চরিত্রে! কি দৃঢ়চেতাই না ছিলেন তিনি!

শিষ্যের দল তাঁর গল্প শুনে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। খাতার পাতা খোলাই রইলো—জীবনী রচনা আর হ'ল না কোনদিন।

একদিন নীলরতনবাবু জিজ্ঞাসা ক'রলেন, কেন নিজেকে এত গোপন ক'রতে চান বলুন ত?

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন—জীবনে যার কোন গুণ নেই, তার আবার দেবার কি আছে বলতো? তার চেয়ে বরং শোন—সাম্‌তাবেড়ের বাড়ীতে আমার পোষা আছে তিনটে ঢোড়া সাপ। যদি কোনদিন ওপাশে যাও, দেখে আসবে তাদের নিজের চোখে। ভারী ভাল লাগে ওদের। জানি না কেন, ছেলেবেলা থেকেই ওদের প্রতি আমার একটা অতিরিক্ত আসক্তি র'য়ে গেছে। সবার উপর কি ভাল লাগে আমার জানো? ওদের ওই স্বাধীন বিচরণ। তাইত তাদের খেলা দেখি বারে বারে।

শরৎচন্দ্র উঠে প'ড়্লেন। এমনি একটা না একটা অজুহাতে তিনি এড়িয়ে চ'ল্তে লাগ্লেন—এ বিষয়টি। একদিন সবাই চেপে ধ'র্লেন, ওসব আমরা শুন্‌ছিনে। আপনাকে ব'ল্তেই হবে!

উত্তরে তেমনি মধুর হাসি হাস্‌লেন। ব'ল্লেন—সময় এলেই সব হ'বে—মিছে কেন সব ব্যস্ত হও বলতো?

*   *   *   *

শরীর খারাপ—নিজেই উপলব্ধি ক'র্ছেন। সুরেনবাবুকে ক'ল্‌কাতায় আসার জন্য চিঠি লিখলেন। কিন্তু সাম্‌তাবেড়ে এসে বিভ্রাটে প'ড়্লেন। লক্ষ্মণ ব'লে একটি গরীব জেলে তাঁর বাড়ীর পাশে বাস ক'র্তো। তিনি পূজার আগে যেমন দেশে যান, তেমনি গিয়েছিলেন—পাঁচশো টাকার আধুলি, সিকি, দুয়ানি, আনি ও পয়সা ভাঙিয়ে নিয়ে। কাউকেও তিনি হেয় চোখে দেখ্বেন না এই ছিল তাঁর পণ। সবাই প্রথামত এলো টাকা নিতে, এলো না লক্ষ্মণ। ছুট্‌লেন, তার বাড়ী। দেখ্লেন, তার মেয়ের ভারী অসুখ। চিকিৎসার অভাবে মেয়েটি মারা যেতে পারে। তিনি চিকিৎসার ভার নিলেন নিজের হাতে। এ-বিষয়ে তিনি শুধু দক্ষ নন, ডাক্তার হিসাবেও এ-সব মহলে তাঁর খ্যাতি ছিল যথেষ্ট।

শরীর ক্রমশঃই খারাপ হ'চ্ছে। তবুও রোগী ছেড়ে কোথাও একটি পা নড়্তে পা'র্লেন না। নিজের উপর বিশ্বাস ক'মে এসেছিল। ডাক্‌লেন, পাশের গ্রামের একজন এম. বি. পাস ডাক্তারকে।—তিনি রোগ স্থির ক'র্লেন, টায়্‌ফয়েড্।

ঠিক সেই সময়ে ক'লকাতার বাসায় এলেন সুরেনবাবু। সেখানে তাঁর দেখা না পেয়ে, ছুট্‌লেন সাম্‌তাবেড়ের বাড়ীতে।

শীর্ণকায় শরৎচন্দ্র উঠানটায় পায়চারী ক'রছেন। চোখে-মুখে ফুটে

উঠেছে একটা গভীর চিন্তার ছায়া। মেয়েটাকে কি তবে সত্যই বাঁচানো যাবে না!

সুরেনবাবু সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, এখন কেমন আছ, শরৎ?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, ভালই—তবে বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছি লক্ষ্মণের মেয়েটিকে নিয়ে!

সুরেনবাবু নিজেও চিকিৎসক। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, কি রোগ?

শরৎবাবু ব'ল্‌লেন, ডাক্তার ত ব'লে গেলেন টায়্‌ফয়েড্‌।

সুরেনবাবু ব'ল্‌লেন, জানো ত' কলেরা আর টায়্‌ফয়েড্‌ চিকিৎসায় আমি ধন্বন্তরি। কোন ভয় নেই—কিন্তু তোমার শরীর ত খুব ভাল দেখাচ্ছে না!

শরৎচন্দ্র মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—ভাল যে নেই, তা ত' বুঝ্‌ছি, সুরেন, কিন্তু মেয়েটাকে ফেলেও ত ক'ল্‌কাতায় ফিরে যেতে পারিনে!

* * * *

খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে উভয়ে চ'ল্‌লেন রোগী দেখ্‌তে। সুরেনবাবু রোগী দেখেই ব'ল্‌লেন, ভয় নেই, ওর টায়্‌ফয়েড্‌ হয়নি। আমি কথা দিচ্ছি—তিন দিনে ওকে সারিয়ে দেবো।

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, কি যে বলো মামা! এম. বি. ডাক্তার ব'লে গেলেন, টায়্‌ফয়েড্‌ আর তুমি ব'ল্‌ছো, না! তাকি কখনও সম্ভব?

সুরেনবাবু বাজি রাখ্‌লেন—বেশ, যদি তিন দিনে সারাতে না পারি, তোমার কাছে আজীবন দাসত্ব ক'র্‌বো—আর যদি পারি, তুমি কি ক'র্‌বে?

শরৎচন্দ্র ব'ল্‌লেন, তা হ'লে আমার সমস্ত বই (ডাক্তারী) তোমায় আমি দিয়ে দেবো!

কথামত তিন দিন সুরেনবাবুর চিকিৎসাধীনে রইলো লক্ষ্মণের মেয়ে। জ্বর ছেড়ে গেল। শরৎচন্দ্র খুশী হ'য়ে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন—আমার কথা ঠিক্ আমি রাখ্‌বো, সুরেন!

সুরেনবাবু ব'ল্‌লেন—সে সব পরে হ'বে। এখানে আর তোমার একটি মুহূর্ত্তও থাকা চ'ল্‌বে না। শরীর তোমার দিনের পর দিন কি হ'য়ে যাচ্ছে—সে খবর কি রাখো?

শরৎচন্দ্র উত্তরে মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, জীবনের সব কিছু ত ভোগ ক'রে নিয়েছি—শেষ হ'লেও তো দুঃখের কিছু থাক্‌বে না।

সুরেনবাবু বাধা দিয়ে উঠ্‌লেন—কি যে বলো! দেশ তোমার কাছে আরও অনেক কিছু আশা রাখে।

* * * *

ভাগলপুর থেকে কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হ'য়ে ফিরে এলেন। ডাক পড়্‌লো ফরিদপুর সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি হওয়ার জন্যে। বেরুলো "বিপ্রদাস"। হ'লেন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য। অশ্বিনী-দত্ত রোডে নতুন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ ক'র্‌লেন। তাঁর অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ তাঁকে সেই সময়ে নোবেল প্রাইজ প্রতিযোগিতায় কয়েকটি গল্প পাঠাতে অনুরোধ ক'র্‌লেন। কথাটা তাঁরও মনে লেগে গেল এবং সে বিষয়ে উদ্যোগী হ'লেন বুদ্ধদেববাবু (ভট্টাচার্য্য)। দিলীপবাবু (রায়) ছিলেন তাঁর একজন বিশেষ অনুগত শিষ্য (সাহিত্যে)। তাঁর উপর দিলেন ইংরাজীতে অনুবাদের ভার। তাঁরা "নিষ্কৃতি" ও আরও একটি গল্প অনুবাদ করাই যুক্তিযুক্ত মনে ক'র্‌লেন। কিন্তু তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল "শ্রীকান্ত"ই অনূদিত হোক্। অনুবাদ শেষ হ'ল বটে, কিন্তু সেগুলি আর পাঠানো সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌লো না। শরীর তাঁর একেবারে ভেঙে প'ড়েছে।

* * * *

শিশু-সাহিত্য রচনায় মন দিলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদকল্পে টাউন হলে উদ্বোধনী বক্তৃতা ও আল্‌বার্ট হলে ক'র্‌লেন সভাপতিত্ব। টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ১৫ই জুলাই যে উদ্বোধনী বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার কিয়দংশ :—

"রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধর্ম্মাবলম্বনই কি হ'য়ে দাঁড়ালো সবচেয়ে বড় ? আর মানুষ হ'ল ছোট ? যে ব্যবস্থা জগতের কোথাও নেই, কোথাও কল্যাণ হয়নি, এই দুর্ভাগাদেশে তাই কি হ'ল special and peculiar circumstances ? আর সেটা কেউ বোঝে না এক নাবালকের ট্রাষ্টিরা ছাড়া ? নোতুন শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা আগাগোড়াই মন্দ। সেই অপরিসীম মন্দের মধ্যেও বাংলার হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল সবচেয়ে বেশী। আইনের পেরেক ঠুকে তাদের ছোট করা হ'ল চিরদিনের মতো। এই অন্যায়ের জনক যারা, তাদের ব'ল্‌তে চাই—অন্যায়-অবিচার এক-জনের প্রতি হ'লেও সে অকল্যাণময়। তাতে শেষ পর্য্যন্ত না মুসলমানের, না হিন্দুর, না জন্মভূমির, কারো মঙ্গল হয় না।"

সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট্‌ ডিগ্রীতে (ডি. লিট্‌.) ভূষিত ক'র্‌লেন। ঢাকা মুস্‌লিম সাহিত্য সমাজে ক'র্‌লেন সভাপতিত্ব।

রবীন্দ্রনাথ ৬১তম জন্মদিনে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন—"কল্যানীয় শরৎচন্দ্র, তুমি জীবনের নির্দ্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হ'য়েছো। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে অভিনন্দিত ক'রবার জন্যে তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণ সভা।

"বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ ক'র্‌বার কারণ নেই। আনন্দ করি, যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয়নি। তোমার সাহিত্য-রসসত্রের নিমন্ত্রণ আজও

র'য়েছে উন্মুক্ত ; অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভ'রে উঠ্‌বে তোমার পরিবেষণপাত্র, তাই জয়ধ্বনি ক'র্‌তে এসেছে, তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।…

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ ক'রেছে, তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। ইতস্ততঃ যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালই, না থাক্‌লেই ভাব্‌বার কারণ, এই সহজ কথাটা লেখকরা অনেক সময়ে মনের খেদে ভুলে যায়।…যে লেখায় প্রাণ আছে, প্রতিপক্ষ তার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে, তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীত-পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান ক'রে বে'র করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি-সমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্ত্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়-রহস্যে। সুখে-দুঃখে মিলনে-বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন ক'রে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জান্‌তে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরাণ আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশী হ'য়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকরা অনেক প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্ব্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন—তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব ক'র্‌তে পার্‌তুম যদি তাঁকে ব'ল্‌তে পার্‌তুম, তিনি একান্ত আমারই আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারও স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞান-পত্রের জন্যে অপেক্ষা করেননি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে শত উচ্ছ্বসিত। শুধু কথা-সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে, চিত্রাভিয়ে, তাঁর প্রতিভার সংস্রবে

আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসক্য বেড়ে চ'লেছে। তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে; চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্য্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা, সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হ'য়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন, তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন, মানুষকে সত্য ক'রে দেখ্‌তে, স্পষ্ট ক'রে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে-গুণে ভালোয়-মন্দয়—চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোন দৃষ্টান্তকে নয়; মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন—তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।' (বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ '৪৩)

অর্থ ও সম্মান তাঁকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ ক'র্‌লেও তিনি নিজে প্রলুব্ধ হ'লেন না। কারণ তিনি বুঝ্‌তে পেরেছিলেন, সময় তাঁর শেষ হ'য়ে এসেছে। একদিন সামতাবেড় ত্যাগ ক'র্‌তে ব্যস্ত হ'য়েছিলেন, এখন আবার তাঁর মন সেই নির্জ্জন রূপনারায়ণ নদের তীরে ফিরে যেতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। মনটা সব সময়ে সেইখানেই প'ড়ে থাকে কিসের আকর্ষণে কে জানে ?

"শুভদাকে" সাজানো শেষ হ'ল—ধ'র্‌লেন "শেষের পরিচয়"। কিন্তু শরীরটা তাঁর সঙ্গে অসহযোগ আরম্ভ ক'র্‌লো। ফিরে এলেন সামতাবেড়ের বাড়ীতে।

ডাক প'ড়্‌লো প্রিয় সাথী, বন্ধু, সহচর ও শিষ্য সুরেন্দ্রনাথের। তাঁকেই আজ তাঁর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

সুরেন্দ্রনাথ ডাক পেয়ে ভাগলপুর থেকে চ'লে এলেন ক'ল্‌কাতায়। কিন্তু তাঁকে ক'ল্‌কাতায় না পেয়ে রওনা হ'লেন সামতাবেড়ের বাড়ীর দিকে। উঠানে পা দিয়ে দেখ্‌লেন শরৎচন্দ্র বাগানের কাজে ব্যস্ত।

সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা ক'র্লেন—শরীর খারাপ ত' ক'ল্কাতায় চ'লে গেলে না কেন ?

শরৎচন্দ্র ব'ল্লেন, ও-জায়গাটা আর ভাল লাগে না সুরেন, তার চেয়ে এই বাড়ীটাই আমার বেশী ভাল লাগে। যদি মারা যাই—প্রভাসের বেদীর পাশে তোমরা আমার শেষ শয্যা রচনা ক'রে দিও।

সুরেনবাবু বাধা দিয়ে উঠ্লেন, কি যা তা ব'ল্ছো, শরৎ ?

শরৎচন্দ্র মৃদু হাস্লেন। ব'ল্লেন—সব কিছুরই মধ্যে একটা বৈরাগ্য দেখা দিয়েছে—বেশ স্পষ্ট বুঝ্তে পার্ছি শেষের দিন আর বেশী দূরে নেই। তোমরা আমায় ভালোবাস—তাই এ কথাটা সহ্য ক'র্তে পরো না, কিন্তু এটাই হ'বে সবচেয়ে বড় সত্য!

* * * *

সুরেনবাবু তাঁকে একরূপ জোর ক'রেই ক'লকাতার বাসায় টেনে নিয়ে এলেন। চ'ল্তে লাগ্লো চিকিৎসার ব্যবস্থা।

শরৎচন্দ্র ক্লান্তি বোধ ক'র্লেও মাঝে মাঝে ছোটবেলার গল্প লেখার জন্ত কালি-কলম নিয়ে ব'স্তে লাগ্লেন। সুরেনবাবু বাধা দিলেন, নেই বা হ'ল এখন শরৎ ?

শরৎচন্দ্র ছোট ছেলের মত হেসে উঠ্লেন। ব'ল্লেন, এত দিনের অভ্যাস সহসা কি ছাড়া যায় ? তা ছাড়া, বহুদিনের ভুলও একটা ভেঙে গেছে। কথাটা তোমাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হ'লেও সেটাই হ'ল বর্ণে বর্ণে সত্য! বহুদিন বহুবার ব'লেছি, মদ না খেলে ভাল লেখা যায় না অথচ এখন বুঝ্ছি, যদি না খেতাম তা' হ'লে বোধ করি দেশবাসীকে আমি আরও অনেক ভাল জিনিষ দিয়ে যেতে পার্তাম। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'ল্লেন, মরণকালে হরিনামের মত এ বিলাপ আজ বৃথা। সময় আমার ফুরিয়ে এসেছে, এখন ভাল-মন্দের তুলনায় শুধু ব্যথা ছাড়া কোন সোয়াস্তি নেই। তবুও বলি, যদি আরও কিছুদিন আমায় তোমরা

বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারো—"শেষের পরিচয়টা" অন্ততঃ শেষ ক'রে যেতে পারি! বুঝ্‌লে—একটু টেনে ম্লান হেসে ব'ল্‌লেন—এটাই আমার শেষ কামনা!

সুরেনবাবু আশ্বাস দিলেন, তোমার এমন কি অসুখ হ'য়েছে যে, আর সার্‌বে না? অপারেশন্ ক'র্‌লেই ভাল হ'য়ে যাবে ডাক্তাররা আমায় ব'লেছেন।

শরৎচন্দ্র উত্তরে পুনরায় একটু ম্লান হাসি হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—তোমরা শেষ চেষ্টা ক'রে দেখো, কিন্তু আমার মন কি ব'ল্‌ছে জানো? দিন আমার শেষ হ'য়ে এসেছে!

সুরেনবাবু ধমক্ দিয়ে উঠ্‌লেন—কেন বার বার এক কথা আমাদের তুমি শোনাও, শরৎ? মনে হয়, শরীরটা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ার জন্যে মনটাও তোমার দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছে। কত কঠিন কঠিন রোগ মানুষের সেরে যায়, আর এ তো কি? নিশ্চয় সেরে উঠ্‌বে!

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন না। উত্তরে শুধু মৃদু হাস্‌লেন।

* * * *

সমস্ত জীবনের পুঁজি তাঁর শেষ হ'য়ে এসেছে। প্রকাশকদের কাছ থেকেও টাকা আস্‌ছে না। হাস্‌পাতালে ভর্ত্তি হওয়া ক্রমশঃই দেরী হ'তে লাগ্‌লো। অনেক ছোটাছুটির পর হরিদাসবাবুর কাছ থেকে দু' হাজার টাকা পাওয়া গেল। বিধানবাবু এলেন পরীক্ষা ক'র্‌তে। ব'ল্‌লেন—কিং কিং (Kink)!

এক্সরে করা হ'ল। রোগ ধরা প'ড়্‌লো—যকৃতে ক্যান্‌সার। কিন্তু ডাক্তাররা অপারেশন ক'র্‌তে ভয় পেলেন। সুরেনবাবু জোর দিয়ে ব'ল্‌লেন, লোকটা এমনি কষ্ট পাবে—এ কি কখনও চোখের সাম্‌নে দেখা যায়? তার চেয়ে শেষ চেষ্টা ক'রেই দেখা যাক্।

ডাঃ ম্যাকে ও ডাঃ ডেন্‌হাম হোয়াইট্‌কে দেখানো হ'ল। দু'জনেই

রোগী সম্বন্ধে হতাশা প্রকাশ ক'র্‌লেন। তবে ডাঃ ম্যাকে ভরসা দিলেন, যদি কোন নার্সিং হোমে ভর্ত্তি করানো যায়—অপারেশনের ব্যবস্থা একটা করা যেতে পারে! সেইদিনই য়ুরোপীয় নার্সিং হোমে ভর্ত্তি করা হ'ল। কিন্তু সেখানে আফিং ও তামাক খেতে না দেওয়ায় আত্মীয় ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর পার্ক নার্সিং হোমে চ'লে এলেন।

ডাক্তাররা এবার অপারেশন ক'র্‌তে রাজি হ'লেন। শরৎচন্দ্রও মত দিলেন। সুরেনবাবু তাঁর হ'য়ে দস্তখত ক'র্‌লেন।

অপারেশন্ হ'ল। দেখা গেল লিভারটা পচে গেছে। আপাততঃ পাকস্থলীতে একটা টিউব পরিয়ে দেওয়া হ'ল। আর কিছু না হোক্ ছ'মাস অন্ততঃ বেঁচে থাক্‌তে পার্‌বেন—তাঁর শেষ ইচ্ছাটাও সফল হ'তে পার্‌বে!

ডাক্তাররা আশ্বাস দিলেন, একটু সুস্থ হ'লে বরং সুইজার্‌ল্যাণ্ড পাঠিয়ে লিভার্‌টার একটা সাব্‌ষ্টিটিউটের ব্যবস্থা করা যাবে—তা হ'লে আরও বেশ কিছুদিন শুধু বেঁচে থাক্‌বেন না—কাজও ক'র্‌তে পার্‌বেন স্বচ্ছন্দে!

মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষা হ'ল এক—নিয়তির গতিপথ হ'ল অন্য। একটু সুস্থ বোধ ক'র্‌লেন। বাসায় ফিরে আসার সব ঠিক্‌ঠাক্—সহসা "উকি" সুরু হ'ল। বমিও হ'ল কতকটা। ভিতরের সেলাই গেল কেটে। বেলা দশটায়, ২রা মাঘ, রবিবার, ১৩৪৪ সালে (১৯৩৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী) ইহলোকের মায়া ত্যাগ ক'রে আত্মীয়স্বজন ও গুণমুগ্ধ দেশবাসীকে শোক-সাগরে নিমজ্জিত ক'রে অমরধামে যাত্রা ক'র্‌লেন। সেই সঙ্গে হারালো বঙ্গজননী তাঁর একটি অমূল্য সন্তান—যাঁর ক্ষতি সহজে আর পূরণ হবে কিনা কে জানে!……

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে লিখিত মানপত্র *

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষ শেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি জীবনবিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হোক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত সেবক না ইহার নির্ম্মাণ-কল্প দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্য্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য, তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকাশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয়-চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়েছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি। ইতি—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৮ই অগ্রহায়ণ '৩৮

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

* এই মানপত্রখানি শরৎচন্দ্র রচনা করেন। ইহাতে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রূপে স্বাক্ষর করেন।—(ভারতবর্ষ)

রাজেন্দ্র কলেজে ছাত্র-সভায় বক্তৃতা

"তোমাদের এই বিদ্যামন্দিরে এসে আমার নিজের অধ্যয়ন-জীবনের কথাই আজ বার বার ক'রে মনে প'ড়্ছে। আমারও একদিন তোমাদের মতই উচ্চশিক্ষার আশা নিয়ে এমনি ক'রে ছাত্র-জীবন সুরু হ'য়েছিল, সেদিন মনে মনে ভাবীকালকে স্মরণ ক'রে কত আশার মুকুলই না রচনা, ক'রেছিলাম! কিন্তু স্বপ্ন যত বড় ছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য থেকেও ঠিক ততখানিই বঞ্চিত হ'লাম। বিধাতা যে এমন বঞ্চনা আমার জন্য রেখেছিলেন, ভাবতে পারিনি। বিদ্যামন্দিরের উদ্দেশ্যে দূর থেকে নমস্কার জানিয়েই একদিন ভবঘুরে হ'লাম। এমনি ক'রেই আজ জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় এসে পৌঁছেচি। এ-জীবনে একটা সত্য উপলব্ধি ক'রেছি, সত্য থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে ফাঁকি দিয়ে মানুষের চোখ ঝলসাতে গেলে, সে-ফাঁকি একসময় নিজেকে এসেই বেঁধে। তোমাদের তাই ব'ল্‌বো—অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমাদের সাম্‌নে, তোমাদের দিয়ে দেশ একদিন বড় হবে। তোমরা তাই খাঁটি হও, সত্যাশ্রয়ী হও। চোখে দেখে যা' পরখ ক'র্‌বে না, জীবনে তাকে কখনও সত্য ব'লে প্রচার ক'র্‌বে না, তাতে ঠক্‌তে হয়। তোমরা আমার ভালবাসা নাও।"

[বঙ্গশ্রী, মাঘ ১৩৬০]

ভারতবর্ষের অবিসম্বাদী রাষ্ট্রনায়ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদে বলেন—

"করাচীতে অবতরণ করিবামাত্রই আমি ভারতবর্ষের উপন্যাস সম্রাট শরৎচন্দ্রের স্বর্গারোহণের শোক সংবাদ পাইলাম। জানিতাম, কিছুদিন হইতেই তিনি অসুস্থ। কিন্তু এমন কথা ভাবি নাই, তিনি এত শীঘ্র আমাদের পরিত্যাগ করিবেন। শেষবার যখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই, তখন তাঁহাকে অতিশয় প্রফুল্ল ও প্রাণময় দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার অন্তিমকাল এত নিকটে ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই। শরৎচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের যে আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, দীর্ঘকাল তাহা শূন্য থাকিবে। বাঙ্গালায় এমন কোন পরিবার নাই যেখানকার আবালবৃদ্ধ নর-নারীর নিকট তিনি পরিচিত ও সমাদৃত নহেন।

কিন্তু কেবলমাত্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে হারাইয়াই যে আমরা শোকাভিভূত হইয়াছি তাহা নহে, শোক প্রকাশের অপর কারণ—তিনি

ছিলেন কংগ্রেসের একটি শক্তিস্তম্ভ। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম হইতেই তিনি বাংলার কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান তিনি হাওড়া জিলায় বিতরণ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার অভাব বিশেষ ভাবেই অনুভূত হইবে।

তাঁহার সহিত আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। আমার বেদনা আজ অতি গভীর। তাঁহার মৃত্যুতে আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি যে পরিমাণ হইল, তাহা কোনদিনই পূর্ণ হইবে না।

শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না, রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁহার দান ছিল এবং সেই সুবাদেই ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইলে শরৎচন্দ্র এই আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতায় এই সময়ে যে জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, শরৎচন্দ্র তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সময়ের একদিনের কথা আমার মনে আছে; একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে বলিলেন—"কলম ছাড়িয়া রাজনীতিকের দলে ভিড়িয়া পড়া সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য নহে।" শরৎচন্দ্র তাহাতে হাসিয়া বলেন—"আমি কিন্তু কিছুদিনের জন্য কলম ছাড়িয়া চরকাই ধরিয়াছি।"

শরৎচন্দ্রের এই উক্তির অর্থ ছিল এই যে, দেশমাতা যখন বিপন্না তখন ব্যক্তিগত সমুদয় চিন্তা ও অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার রক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াই সন্তানের কর্ত্তব্য। দেশমাতৃকার প্রতি আন্তরিক প্রীতি তাঁহাতে আমরণ বিদ্যমান ছিল। বহুবৎসর যাবত তিনি নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লাজুক ছিলেন বলিয়া তিনি সভা-সমিতিতে বড় একটা যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট যুবকেরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক প্রেরণা লাভ করিয়াছে। স্বদেশ-প্রেমিক শরৎচন্দ্রের এইদিকটার পরিচয় আজকার তরুণেরা তেমন জানে না। তাঁহার মন ছিল চির সবুজ—তরুণ বাঙ্গালার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন,

সরকার ও পুলিশ তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। তাঁহার "পথের দাবী" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল—তিনি যে কারারুদ্ধ হন নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। কারাবাস-জনিত অভিজ্ঞতা লাভ করিলে সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহার সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হইতে পারিত। সমাজে যাঁহারা বর্জ্জিত ও উপদ্রুত, তাঁহাদের প্রতি সমবেদনাই শরৎ-সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রেরণা। নিজের জীবন তিনি দুঃখ-দৈন্য ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়াই এই প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। জীবনের এই কঠোর পরীক্ষায় যাঁহারা মূহ্যমান হইয়া পড়েন, শরৎচন্দ্র তাঁহাদের দলে ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বিদ্রোহী, তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির যুব-সমাজের নিকটে এই বিদ্রোহের বাণীই তিনি ছড়াইয়াছেন। সত্যের প্রতি অটুট নিষ্ঠা তাঁহার সাহিত্যে সত্য-প্রচারের প্রেরণাই জোগাইয়াছে।

আমাদের দেশে—বিশেষভাবে বাঙ্গালায় হাস্যরসের বড় অভাব। শরৎ-সাহিত্যে এই হাস্যরসের প্রাধান্য দেখা যায়। দুঃখ-দৈন্য তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না বলিয়াই ঘোরতর দুর্দ্দশা বর্ণনাকালেও তিনি হাস্যরসের নির্ঝর বহাইয়াছেন। এতগুলি গুণ একজন মানুষের সচরাচর সম্ভব হয় না—একাধারে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ লেখক, আদর্শ দেশপ্রেমিক ও সর্ব্বোপরি আদর্শ মানব।"

কংগ্রেসের ৫১ তম অধিবেশনে, গুজরাটের হরিপুরায়, নির্ব্বাচিত সভাপতির শোক প্রকাশ:

"সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে ভারতের সাহিত্যগগন হইতে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল। যদিও বহুবর্ষ তাঁহার নাম বাঙলার ঘরে ঘরেই শুধু পরিচিত ছিল, তথাপি তিনি ভারতের সাহিত্য-জগতেও কম পরিচিত ছিলেন না। সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, কিন্তু দেশ-প্রেমিক হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলার কংগ্রেসের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক মর্ম্মবেদনা জানাইতেছি।" [১৯শে ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যায় কংগ্রেসের প্রথম দিনের প্রকাশ্য অধিবেশনে অন্যান্য কয়েকজন রাষ্ট্র-নেতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতেও শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।] (—ভারতবর্ষ)

রচনাবলী

বাল্য-স্মৃতি—সাহিত্য, মাঘ ১৩১৯ ; কাশীনাথ—সাহিত্য, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯ ; (পুস্তকাকারে, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭, ভাদ্র ১৩২৪) বোঝা—যমুনা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩১৯ ; রামের সুমতি—যমুনা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯ ; পথনির্দ্দেশ—যমুনা, বৈশাখ ১৩২০ ; বিন্দুর ছেলে—যমুনা, শ্রাবণ ১৩২০ (পুস্তকাকারে, ৯ জুলাই, ১৯১৪), [ইং অনুবাদ Bindu's Son—অশোক চট্টোপাধ্যায়, মডার্ণ রিভিয়ু, ফেব্রুয়ারী-জুন ১৯২৭] ; নারীর মূল্য—যমুনা, বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন (অনিলাদেবীর ছদ্মনামে), ১৩২০, (পুস্তকাকারে ১২ এপ্রিল ১৯২৩) ; চন্দ্রনাথ—যমুনা, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩২০ (পুস্তকাকারে, ১২ মার্চ্চ, ১৯১৬) ; আলো ও ছায়া—যমুনা, আষাঢ়-ভাদ্র ১৩২০ ; বিরাজ বৌ—ভারতবর্ষ, পৌষ-মাঘ ১৩২০ (পুস্তকাকারে, ২ মে, ১৯১৪) ; অনুপমার প্রেম—সাহিত্য, চৈত্র ১৩২০ ; চরিত্রহীন—যমুনা, কার্ত্তিক-চৈত্র ১৩২০ ও ১৩২১ সালে আংশিকভাবে প্রকাশিত হয় (পুস্তকাকারে, ১১ই নভেম্বর, ১৯১৭) ; পরিণীতা—যমুনা, ফাল্গুন ১৩২০ (পুস্তকাকারে, ১০ই আগষ্ট, ১৯১৪) ; গুরু-শিষ্য সম্বাদ—যমুনা, ফাল্গুন, ১৩২০ ; পণ্ডিতমশাই—ভারতবর্ষ, বৈশাখ ও শ্রাবণ ১৩২১ (পুস্তকাকারে, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৪, বাং ১৩২১) ; মেজদিদি, দর্পচূর্ণ ও আঁধারে আলো—ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক, মাঘ ও ভাদ্র ১৩২১ (পুস্তকাকারে, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯১৫, বাং ১৩২২) ; নিষ্কৃতি—যমুনা, "ঘর-ভাঙ্গা" নামে বৈশাখ ১৩২১, ভারতবর্ষ—ভাদ্র, কার্ত্তিক ও পৌষ ১৩২৩ (পুস্তকাকারে, ১লা জুলাই, ১৯১৭) ; হরিচরণ—সাহিত্য, আষাঢ় ১৩২১ ; পল্লী-সমাজ—ভারতবর্ষ, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২২ (পুস্তকাকারে, ১৫ই

জানুয়ারী, ১৯১৬, বাং ১৩২২) ; শ্রীকান্ত, ১ম পর্ব্ব—ভারতবর্ষ, মাঘ-চৈত্র ১৩২২ ও বৈশাখ-মাঘ ১৩২৩ (পুস্তকাকারে, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭, মাঘ ১৩২৩) ; ইংরাজী অনুবাদ—K. C. Sen ও Theodosia Thompson ১৯২২ ।

রেঙ্গুন ত্যাগ—১১ই এপ্রিল ১৯১৬।

বৈকুণ্ঠের উইল—ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ-শ্রবণ ১৩২৩ (পুস্তকাকারে, ৫ই জুন, ১৯১৬, বাং ১৩২৩) ; গৃহদাহ—ভারতবর্ষ, মাঘ-চৈত্র ১৩২৩ ; বৈশাখ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩২৪ ; পৌষ-চৈত্র ১৩২৫ ; আষাঢ়-অগ্রহায়ণ, পৌষ-মাঘ ১৩২৬ (পুস্তকাকারে, ২০শে মার্চ্চ ১৯২০) ; অরক্ষণীয়া—ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩২৩ (পুস্তকাকারে, ২০শে নভেম্বর, ১৯১৬, বাং ১৩২৩) ; দেবদাস—ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩২৩ ও বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২৪, (পুস্তকাকারে ৩০শে জুন, ১৯১৭, বাং ১৩২৪) ; স্বামী—নারায়ণ, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২৪ ; একাদশী বৈরাগী—ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২৪ (পুস্তকাকারে, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮, বাং ১৩২৪) ; দত্তা—ভারতবর্ষ, পৌষ-চৈত্র ১৩২৪, বৈশাখ-ভাদ্র ১৩২৫ (পুস্তকাকারে, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৮, বাং ১৩২৫); শ্রীকান্ত, ২য় পর্ব্ব—ভারতবর্ষ, আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-চৈত্র ১৩২৪, বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৫ (পুস্তকাকারে, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৮, বাং ১৩২৫) ; বিলাসী—ভারতী, বৈশাখ ১৩২৫ ; মামলার ফল—পার্ব্বনী, আশ্বিন, ১৩২৫ ; ছবি—আগমনী, পূজাবার্ষিকী ১৩২৬ (পুস্তকাকারে, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯২০ বাং ১৩২৬) ; বামুনের মেয়ে—উপন্যাস সিরিজ, ২য় বর্ষ, আশ্বিন ১৩২৭ (পুস্তকাকারে) ; শ্রীকান্ত, ৩য় পর্ব্ব—ভারতবর্ষ, পৌষ-ফাল্গুন ১৩২৭, বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন ও পৌষ ১৩২৮, (পুস্তাকাকারে ১৮ই এপ্রিল, ১৯২৭, চৈত্র ১৩৩৩) ; দেনা-পাওনা—ভারতবর্ষ, আষাঢ়-আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র ১৩২৭ ; জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ-কার্ত্তিক ও চৈত্র ১৩২৮ ; বৈশাখ-শ্রাবণ, আশ্বিন-কার্ত্তিক, মাঘ-চৈত্র ১৩২৯ ; বৈশাখ, আষাঢ় ও শ্রাবণ

১৩৩০ (পুস্তকাকারে, ১৪ই আগষ্ট, ১৯২৩, বাং ১৩৩০) ; মহেশ—বঙ্গবাণী, আশ্বিন ১৩২৯ ; অভাগীর স্বর্গ—বঙ্গবাণী, মাঘ ১৩২৯ ; নববিধান—ভারতবর্ষ, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৩০, বৈশাখ, আষাঢ় ও আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৩১ (পুস্তকাকারে, অক্টোবর, ১৯২৪, বাং ১৩৩১) ; পথের দাবী—বঙ্গবাণী, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৯, বৈশাখ, আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩৩০, জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন-কার্ত্তিক, পৌষ-মাঘ, ১৩৩১, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্ত্তিক-ফাল্গুন ১৩৩২, বৈশাখ ১৩৩৩ (পুস্তকাকারে, ৩১শে আগষ্ট, ১৯২৬, বাং ১৩৩৩) ; হরিলক্ষ্মী—শারদীয়া বসুমতী, ১৩৩২ (পুস্তকাকারে, ১৩ই মার্চ্চ, ১৯২৬) ;ষোড়শী—(নাট্যরূপ—দেনা-পাওনা), ১৩ই আগষ্ট, ১৯২৭ ; রমা—(নাট্যরূপ, পল্লী-সমাজ)—৪ঠা আগষ্ট, ১৯২৮ ; তরুণের বিদ্রোহ—বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীর সভাপতি হিসাবে বক্তৃতা (পুস্তকাকারে, ১৮ই এপ্রিল, ১৯২৯) ; শেষ প্রশ্ন—ভারতবর্ষ, শ্রাবণ-কার্ত্তিক, মাঘ-চৈত্র ১৩৩৪, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, কার্ত্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন ১৩৩৫ ; বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৩৬ ; চৈত্র ১৩৩৭ ও বৈশাখ ১৩৩৮ (পুস্তকাকারে ২রা মে, ১৯৩১, বাং বৈশাখ ১৩৩৮) ; শ্রীকান্ত, ৪র্থ পর্ব্ব—বিচিত্রা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩৮ ; বৈশাখ-মাঘ, ১৩৩৯) ; (পুস্তকাকারে, ১৩ই মার্চ, ১৩৩৩) ।

স্বদেশ ও সাহিত্য—স্বদেশ : আমার কথা—প্রবর্ত্তক, শ্রাবণ ১৩২৯ ; (জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব ত্যাগকালে পঠিত অভিভাষণ) । স্বরাজ্য সাধনায় নারী, নব্যভারত, পৌষ, ১৩২৮ । (শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে পঠিত অভিভাষণ) । শিক্ষার বিরোধ—নারায়ণ, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২৮, (গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যা আয়তনে পঠিত) । স্মৃতিকথা —বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৩২ দেশবন্ধু স্মৃতিসংখ্যা । অভিনন্দন—দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দেশবাসীর পক্ষ থেকে পঠিত অভিনন্দন ।

সাহিত্য—ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ ; বরিশাল বঙ্গীয়

সাহিত্য-পরিষদ্ শাখার অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতার সারাংশ। গুরুশিষ্য সম্বাদ—যমুনা, ফাল্গুন ১৩২০। সাহিত্য ও নীতি—বঙ্গবাণী, পৌষ, ১৩৩১, (আশ্বিন মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ)। সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি—মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৩১ (চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ)। ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত—ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩১। আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ—বঙ্গবাণী, শ্রাবণ ১৩৩০ (আষাঢ় মাসে শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে সাহিত্য সভায় সভাপতির অভিভাষণ)। সাহিত্যের রীতি ও নীতি—বঙ্গবাণী, আশ্বিন ১৩৩৪; অভিভাষণ—কালিকলম, আশ্বিন ১৩৩০ (৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে দেশবাসীর অভিনন্দন পত্রের উত্তর); অভিভাষণ—বাতায়ন, ২৯শে আশ্বিন, ১৩৩৮ (৫৫তম বাৎসরিক জন্মতিথিতে প্রেসিডেন্সী কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতি প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের উত্তর)। যতীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা। শেষ প্রশ্ন—বিজলী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা; রবীন্দ্রনাথ—জয়ন্তী-উৎসর্গ, পৌষ ১৩৩৮ (রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে পঠিত)।

বিপ্রদাস—বিচিত্রা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩৯; বৈশাখ-আষাঢ়, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৪০, বৈশাখ, শ্রাবণ-ভাদ্র, কার্ত্তিক-মাঘ ১৩৪১ (বেণু, ১৩৩৬-৩৮ এ ১০ম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়); বিচিত্রায় পুনঃমুদ্রণ। অনুরাধা-সতী ও পরেশ—ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪০; বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩৪; নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত "শরতের ফুল", ভাদ্র ১৩৩২ (পুস্তকাকারে, ফাল্গুন ১৩৪০, ইং ১৮ই মার্চ, ১৩৩৪)। বিরাজ-বৌ (নাট্যরূপ)—পুস্তকাকারে, ১৮ই আগষ্ট, ১৩৩৪; বিজয়া (নাট্যরূপ, দত্তা), পুস্তকাকারে, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪।

মৃত্যুর পর প্রকাশিত: শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ—পুস্তকাকারে,

চৈত্র ১৩৪৪ ; (১) শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ১৩২৮এর পৌষে পঠিত অংশ। (২) ৫৩তম জন্মদিনে (১৩৩৫) প্রেসিডেন্সী কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতাংশ। (৩) ৫৪তম জন্মদিনে (১৩৩৬) বঙ্কিম-শরৎ সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে প্রেসিডেন্সী কলেজে পঠিত বক্তৃতাংশ। (৪) ৫৫তম জন্মদিনে বঙ্কিম-শরৎ সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে পঠিতাংশ। (৫) আশুতোষ কলেজে, বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের ২য় বার্ষিক উৎসবে মৌখিক বক্তৃতাংশ (ফাল্গুন ১৩৪২)। (৬) ৬২তম জন্মদিনে স্কটিশ চার্চ কলেজে, বাংলা সাহিত্য সমিতির অভিনন্দন পত্রের উত্তরে মৌখিক বক্তৃতাংশ (ভাদ্র ১৩৪৪)। (৭) ৬২তম জন্মদিনে বিদ্যাসাগর কলেজে, অভিনন্দন সভায় মৌখিক বক্তৃতাংশ (ভাদ্র ১৩৪৪) ছোটবেলার গল্প—বৈশাখ, ১৩৪৫ এপ্রিল ১৩৩৮ ; লালু—মৌচাক, চৈত্র ১৩৪৪ ; ছেলেধরা—ছোটদের আহরিকা, সম্পাদনায় ব্রজমোহন দাস ১৩৪২, কোলকাতার নোতুনদা—গল্পের মণিমালা, সম্পাদনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, ১৩৪৪ ; লালু—সোনার কাঠি, সম্পাদনায় নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী ১৩৪৪ ; বছর পঞ্চাশ পূর্ব্বের একটা দিনের কাহিনী—পাঠশালা, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৪৪ ; লালু ও দেওঘরের স্মৃতি—ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৪৪ ; শুভদা—৫ই জুন, ১৩৩৮ ; শেষের পরিচয়—৭ই জুন, ১৩৩৯ ; ১৫ পরিচ্ছেদের "রাখাল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল"—আষাঢ়-আশ্বিন, অগ্রহায়ন, ভারতবর্ষ ১৩৩৯ ; বৈশাখ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ১৩৪০ ; আষাঢ়-শ্রাবণ, কার্ত্তিক, ফাল্গুন ১৩৪১, বৈশাখ ১৩৪২ ; বাকী অংশটুকু রাধারাণী দেবী কর্ত্তৃক সমাপ্ত। বারোয়ারি উপন্যাস—মে ১৯২১ ; রচনা—২১শ-২২শ অধ্যায়। রসচক্র—বৈশাখ ১৩৪৩, ইং ১৯৩৬। রচনা ৩ পৃষ্ঠা থেকে ১৩ পৃষ্ঠার ১৪ পংক্তি পর্য্যন্ত। প্রকাশিত হয় উত্তরায়—অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ ; (প্রবাস-

জ্যোতি, সম্পাদনায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশ্বিন ১৩২৭ ; "বাড়ীর কর্ত্তা" নামে মুদ্রিত) ; ভালোমন্দ—বাতায়ন, ১৫ই আশ্বিন, ১৩৪৪।

গ্রন্থাবলী—১ম খণ্ড, ২০শে অক্টোবর, ১৯১৯ ; দত্তা, পরিণীতা, শ্রীকান্ত ১ম পর্ব্ব, অরক্ষণীয়া, একাদশী বৈরাগী, মেজদিদি, মামলার ফল। ২য় খণ্ড (২০-১-২০)—শ্রীকান্ত ২য় পর্ব্ব, দেবদাস, দর্প-চূর্ণ, পল্লী-সমাজ, বড়দিদি। ৩য় খণ্ড (১৮-৬-২০)—স্বামী, বৈকুণ্ঠের উইল, পণ্ডিতমশাই, আঁধারে আলো, চন্দ্রনাথ, নিষ্কৃতি। ৪র্থ খণ্ড (২৫-৯-২০)—চরিত্রহীন, ছবি, বিলাস। ৫ম খণ্ড (২১-২-২৩)—গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, মহেশ। ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৫-৯-৩৪)—শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব্ব, নববিধান, ষোড়শী, হরিলক্ষ্মী, অভাগীর স্বর্গ। ৭ম খণ্ড (১৭-৯-৩৫)—শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্ব, দেনা-পাওনা, রমা, নারীর মূল্য।

—গ্রন্থ-পঞ্জী—

"শরৎ-পরিচয়" ... ... শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

"শরৎ-পরিচয়" ... ... শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র"... ... শ্রীযুত নরেন দেব

"জয়ন্তী-উৎসর্গ" ... ... রবীন্দ্র-পরিচয় সভা

"শরৎ-বন্দনা" ... ... শরৎ-বন্দনা সমিতি

"বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন-প্রশ্ন" ... শ্রীশৈলেন বিশী

"শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন" ... শ্রীযুত শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়।

"ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" ... ... ৺গিরীন্দ্রনাথ সরকার

"রবীন্দ্র-জীবনী" ... .. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

"বাতায়ণ" ... .. সাপ্তাহিক পত্রিকা

"প্রবাসী" (আষাঢ়, ১৩২৩) .. মাসিক পত্রিকা

"বিচিত্রা" (অগ্রহায়ণ '৪৩) ... "

ভ্রম সংশোধন—সৌরীন্দ্রনাথ—"সৌরীন্দ্রমোহন" রূপে প'ড়্‌তে হবে।

গান

(রাগিনী—বেহাগ, তাল—কাওয়ালী)

(১)

এ-সুখ বসন্তে সই, কেনলো এমন আপন-হারা—বিবশা আহা মরি !
কুন্তল আলু-থালু এলায়ে কপোলো-পরি !
হাসে চন্দ্র ঘুমন্ত জ্যোছনা-হাসি, ঢালে মল্লিকা সুরভি রাশিরে—
বোলে পাপিয়া পিউ পিউ, কুজে কোয়েলা—
কুহু কুহু রবে কুঞ্জে কুঞ্জে।
যদি হাসে চাঁদ মধুর হাসিরে,
মলিন হেরি ও মুখশশীলো—
যদি গায় পাখী তবে কেন সখি, নীরবে রহিবি হায় !
আয় কুঞ্জে ফুটন্ত মালতী তুলি',
গাঁথি মল্লিকা দু'জনে মিলিয়ে, গানে গানে পোহাইব রজনী সজনীরে।

(২)

দু'দিন আসিনি দু'দিন দেখিনি
অমনি মুদিলি আঁখি,
সুদিন হ'ল না ব'লে কি ললনে—
মনে মনে বুঝি দিলি ফাঁকি !

[প্রথমটি—অশ্রুমতী নাটকের গান, দ্বিতীয়টি অসম্পূর্ণ]

শুধু ব্যক্তিগত অভিমত নয়, বাংলার বি
দৈনিকগুলির অভিমতে শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় পুস্তক—

শাখ-প্রশাখা—(১ম ও ২য় খণ্ড) ভাবী ও বর্তমান প্রেমিক ও মা
জীবনের প্রকৃত রূপ—মূল্য ২॥৹ ও ৩॥৹

কথা কও—জীবন—কি স্ত্রী, কি পুরুষের ভেঙে তচ্‌নচ্‌ হ'য়ে
কেন? মূল্য—৩৲

খোলা চিঠি—সৈনিক জীবনের একটি সত্য রোমাঞ্চকর কাহিনী
কাশ্মীর রণাঙ্গণের সজীব চিত্র—মূল্য ১॥৹

পুরাণো দশ বছরের ডায়েরী—সন্তানই জীবনের রূপ। তার
দায়ী সন্তান নয়—মাতাপিতা। প্রতিটি মাতাপি
অবশ্য পাঠিতব্য পুস্তক—মূল্য ১॥৹

অভিজ্ঞান—দেশমুক্তির সজীব চিত্র—মূল্য ৩৲

অন্তরালে—সামাজিক জীবনকে সুষ্ঠু রূপ দেওয়া যায় কোন প
সুস্থ ও সবল জীবন যাপনের পাথেয়
সামাজিক জীবনে মূল্য কার কত বেশী? নারী
পুরুষের? মূল্য ২৲